ভারতের দেব-দেউল

ভারতের দেব-দেউল

'দক্ষিণ-ভারত পথে', 'স্মৃতিকণা' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৪১

শ্রদ্ধেয়

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

এম.এ., বি.এল., ডি. লিট., ব্যারিস্টার-য়্যাট-ল.,

এম.এল.এ.

মহাশয়ের করকমলে—

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

ভূমিকা

আমার অনেকদিনের বন্ধু জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'ভারতের দেব-দেউল' বইখানি উল্টে পাল্টে দেখে বড়ই আশা হল—এই বইয়ে সারা ভারতের মন্দির ও মূর্ত্তির এবং নানা প্রাচীন স্থানের ছোট একটি ইতিহাস মনোরম আকারে আমরা পাবো। এই রকম বই বাংলায় দুই-এক-খানি ছাড়া নেই বল্লেও চলে।

ছবিগুলি একটু একটু আভাসমাত্র দেবে, কিন্তু বন্ধুবর এবং আমি আশা করি এই বই পড়ে পাঠকেরা স্বচক্ষে স্থান ও মন্দিরাদি দেখ্‌তে উৎসাহিত হবেন। ইতি—

যোড়াশাঁকো,
২৫ বৈশাখ, ১৩৪৮

শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

নিবেদন

হিমালয় হইতে কুমারিকা, মণিপুর হইতে তক্ষশিলা এই বিস্তৃত ভারতের অপূর্ব্ব শিল্পৈশ্বর্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, সেই আনন্দ-রসের কণামাত্র বাঙ্গলার নর-নারীর মধ্যে পরিবেশন করিবার মানসে এই পুস্তকখানি প্রণীত হইল।

শিল্পই জাতীয় সাধনা ও কৃষ্টিকে জীবন্ত ও মূর্ত্ত করে। অতীতের গৌরব আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য নহে, তাহার অনুপ্রেরণায় ভবিষ্যতের শিল্পসৃষ্টির পথ প্রসারিত করিবার আশায় পুরাণ কথা বলা হইল। জীবন্ত জাতি অতীতের সাধনার বলেই ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। আশা করি বাঙ্গলার ছাত্র ও ছাত্রীরা এইরূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভারতের অজেয় অমর শিল্পীদের সৃষ্টির সহিত পরিচিত হইবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির বিকাশ হইবে। ভাষায় শিল্পীদের মহিমা-কীর্ত্তন সম্যক্‌ভাবে হয় না, ছবিতেও শিল্পীর মনের কথা প্রকাশ পায় না, তাঁহাদের নৈপুণ্যের পরিচয় তাঁহাদের সৃষ্টি না দেখিলে উপলব্ধ হয় না।

গ্রন্থটি রচনা করিতে বহু মনীষী ও বিশেষজ্ঞের মত অবলম্বিত ও বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের নাম ও গ্রন্থতালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। আমি তাঁহাদের সকলেরই নিকট কৃতজ্ঞ। 'ভুবনেশ্বর' ও 'কোনারক' সম্বন্ধে লিখিবার সময়ে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয়ের 'মন্দির

কথা' হইতে অনেক মত ও বাক্য উদ্ধৃত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার জন্য সরকার মহাশয়ের নিকট আমি ঋণী রহিলাম। অনেক মত ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মূল পুস্তকে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহার জন্য বিশেষ ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প-সমালোচক ও ভারতীয় চারুকলার দরদী বন্ধু শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় প্রথম হইতেই বিষয়-নির্ব্বাচনে. চিত্র-সংযোজনে, নানা তথ্যসংগ্রহে অকুণ্ঠিত-ভাবে সাহায্য করিয়া এবং কয়েকটি অধ্যায় সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সুপণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া সাঁচী ও বুদ্ধগয়া-সম্বন্ধে লিখিত অধ্যায় দুইটির প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ষোড়শীকুমার সরস্বতী মহাশয় ভেড়াঘাটের, বৃন্দাবনের এবং কোনারকের বর্ত্তমান সময়ের আলোক-চিত্র (ফটো) প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই.সি.এস. মহাশয় মথুরাপুরের দেউলের চিত্রখানি প্রদান করিয়াছেন। কৈলাশ-মন্দিরের চিত্রখানি শিল্পী ষোড়শীকুমার রায় রেখাচিত্রে (পেন এণ্ড ইঙ্ক) অঙ্কন করিয়া দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

এই পুস্তকে মুদ্রিত কয়েকটি অধ্যায় পূর্ব্বে 'যুগান্তর', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'প্রবর্ত্তক' ও 'শিবম্' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের কথা 'দক্ষিণ-ভারত পথে'

পুস্তক হইতে কিছু কিছু লওয়া হইলেও অধিকাংশ স্থলেই নব নব তথ্য সংযোজিত করা হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ জানান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ পুস্তকখানির মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করাতে আমি পরম উপকৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবং রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নিবেদন ইতি—

৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড,
কলিকাতা।
বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৪৮।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
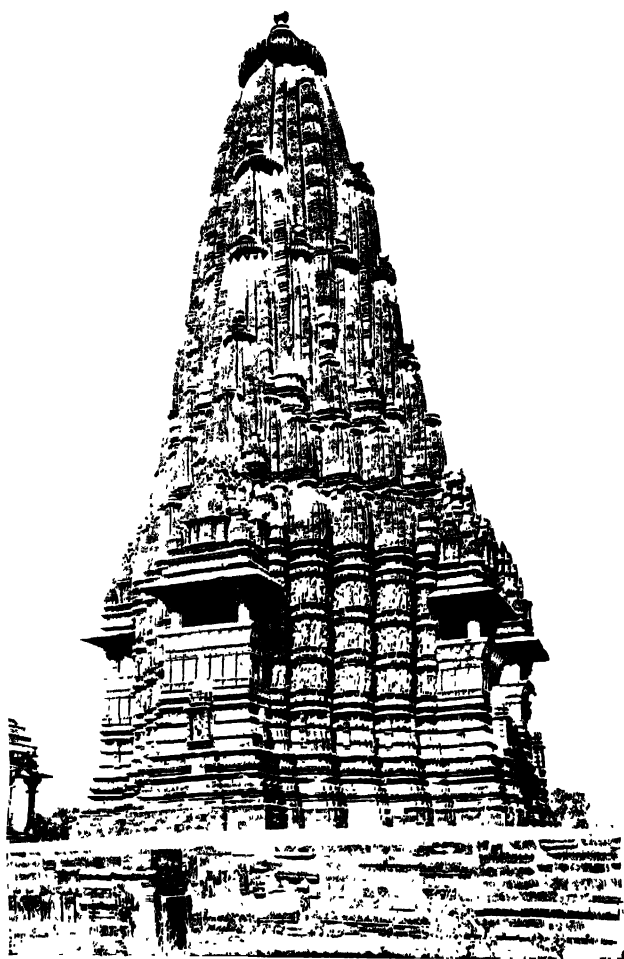
খাজুরাহোর মহাদেবের মন্দির

ভারতের দেব-দেউল

ভারতের সংস্কৃতির, ধর্ম্মের, সাধনার ও শিল্পের বিকাশ হইয়া উঠিয়াছিল দেব-দেউলকে কেন্দ্র করিয়া। হিন্দুর মন্দিরে, বৌদ্ধের স্তূপে, জৈনের বস্তিতে, মুসলমানের মসজিদে, খৃষ্টানের গির্জ্জায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুরা প্রথম যুগে দেব-দেউল-নির্ম্মাণে মনোযোগ প্রদান না করিলেও, বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের প্রাচুর্য্য দর্শন করিয়া তাহাদের মন্দির-নির্ম্মাণের আগ্রহ বর্দ্ধিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব দেব-স্থানকে মহীয়ান্ ও গরীয়ান্ করিবার জন্য ধনী ও ভক্তের চিত্ত যেমন আগ্রহে পূর্ণ হইত, তেমনি বিত্তব্যয়ে কোনরূপ কুণ্ঠা থাকিত না। শিল্পীরা বহু সাধনায়, তাঁহাদের প্রাণান্ত-পরিশ্রমে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, আকাঙ্ক্ষাশূন্য চিত্তে এই সব দেব-দেউলকে সুসজ্জিত, সুশ্রী ও সুমহান্ করিতেন। তাঁহাদের শিল্পনৈপুণ্য, স্থাপত্যের জ্ঞান, সৌন্দর্য্যবোধ ও সৃষ্টিশক্তি আধুনিক যুগের শিল্পী ও স্থপতিদের বিস্মিত করিয়া দিতেছে। এই ত্যাগী সাধকশ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের বাটালির আঁচড়ে এক একটি দেব-দেউল হইয়া উঠিয়াছিল শিল্পের সংগ্রহালয়, শিক্ষার কেন্দ্র, ধর্ম্মের প্রতীক, সভ্যতার নিদর্শন।

কালের ও মানবের নির্ম্মম পীড়নে এই সব অমূল্য রত্ন ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলেও এখনও সেই ধ্বংসাবশিষ্টের ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে হয়। যুগে যুগে এই

সব শিল্প ও স্থাপত্যের ঐশ্বর্য্য দেশ-বিদেশের সুধী ও শিল্পানুরাগিগণকে আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছে।

যেসব প্রাচীন মন্দির, স্তূপ, বিহার, চৈত্য ও মসজিদ প্রকৃতির ও মানুষের পীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কৃপায় সংরক্ষিত হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে, তাহার শিল্পকৌশল ও ভাস্কর্য্য পরিদর্শন করিলে, অতীতের বহু গৌরবকাহিনী জ্ঞাত হওয়া যায়, ভারতের যুগযুগের প্রাচীন সমাজ ও ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাসের নব নব তথ্য লাভ করা যায়। প্রাচীন শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য দর্শন করিলে অতীত সমাজের ও ইতিহাসের বহু তথ্য অনায়াসে আয়ত্ত হয়।

বাঙ্গালী যুবক ও ছাত্র-ছাত্রীগণের ভারতের গৌরব ও বৈশিষ্ট্যের সহিত পরিচয় লাভ করিবার আগ্রহ তেমন দেখা যায় না। হিন্দুরা তীর্থে যায় বয়সকালে, যখন তাহাদের না থাকে উৎসাহ, না থাকে শিখিবার উদ্যম, না থাকে শরীরে সামর্থ্য— যাহাতে তাহারা ভারতের ঐশ্বর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে। হিন্দুর দেব-দেউলগুলি প্রায় সমস্তই প্রকৃতির মনোরম স্থানে অবস্থিত। যৌবনে এই সব স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া শিল্প ও স্থাপত্যের পরিচয় পাইলে চিত্ত যেমন প্রফুল্ল হয়, জ্ঞানও তেমনই অর্জ্জন করা যায়, সৃষ্টিশক্তিও বিকাশ লাভ করে।

বিদ্যোৎসাহী লর্ড কার্জ্জন মহোদয় রাজ-প্রতিনিধি থাকিবার কালে ভারতের পুরাতত্ত্ব-বিভাগের প্রসার করিয়া এবং ভূগর্ভ-নিহিত বহু স্তূপ, বিহার, মন্দির ও মসজিদের উদ্ধার ও সংস্কার করিয়া জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই সব স্থাপত্য ও শিল্পসম্ভার আমাদিগকে অতীতের অনেক কথা শিখাইতেছে।

ভারতবাসী লর্ড কার্জ্জনের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। মহেঞ্জো-দারো, সারনাথ, সাঁচী, ইলোরা, অজন্তা, বাগ, কোণারক, বিজয়-নগর, ভীলসা, পাহাড়পুর, তক্ষশীলা, হারাপ্পা, খাজুরাহো, উদয়গিরি, হাম্পী, মহাবলিপুরম্ প্রভৃতি স্থানের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের উদ্ধার ভারতকে গরীয়ান্ ও মহীয়ান্ করিয়াছে। তাহাদের বর্ণনা ইংরাজিতে অনেক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বাংলায় তাহাদের পরিচয় অতি বিরল। বাঙ্গালী সেই সব স্থান দর্শন করিতে যায় অত্যন্ত কম। এই সব স্থানগুলি কিঞ্চিৎ দুর্গম স্থানে অবস্থিত থাকায় এবং চলিত তীর্থস্থানে না থাকায় বাঙ্গালীর চক্ষু এড়াইয়া যায়। বাঙ্গালীর এই শিল্পানুরাগের ও অনুসন্ধান প্রিয়তার অভাব বাঙ্গালীকে দীন করিয়া রাখিয়াছে। "ভারতের দেব-দেউল"এর বর্ণনায় ভারতের গৌরব ও বিশ্বের পরম ঐশ্বর্য্যের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছি।

যেখানেই ভগবানের আরাধনার জন্য গৃহ নির্ম্মিত হয়—মন্দির, মসজিদ, স্তূপ, বিহার, গির্জ্জা যাহাই হউক না কেন—সেই হর্ম্ম্যই "দেব-দেউল"। সেই জন্য এই পুস্তকে সকল ধর্ম্মের দেবস্থানের পরিচয় প্রদান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দেব-দেউলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের পরিচয়ের সহিত সেই স্থানের ও পথেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

সাধারণ নর-নারীর, বিশেষতঃ ছাত্র ও ছাত্রীগণের, চিত্তে যাহাতে এই সব স্থান ও শিল্প-সম্পদ্ দেখিবার আগ্রহ জন্মায় তাহার জন্যই এই পুস্তক রচিত হইল। সুধীজনের আকাঙ্ক্ষা এই পুস্তক-পাঠে হয় ত মিটিবে না।

প্রাচীন বৈদিক যুগে হিন্দুর সাধনা ও সংস্কৃতি নিবদ্ধ থাকিত

তাহার জপ, তপ ও মন্ত্রে; হিন্দুরা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া গিয়াছিল কেবল শ্রুতি ও স্মৃতি; ছিল না তখন কোন পুঁথি, কোন শিলালিপি, কোন প্রস্তর-ফলক; পাওয়া যায় নাই কোন স্থাপত্য-কৌশলের বা দেব-দেউলের সন্ধান। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বাদ দিলেও পৌরাণিক বা ব্রাহ্মণ্য-যুগেও হিন্দুরা প্রকৃতির মধ্যে নিজ সাধনাকে আবদ্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকিত। তপোবন, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহ ও গুরুশিষ্য-সম্বন্ধই ছিল সে যুগের সাধন-সম্পত্তি, সাধনার ধারা। জ্ঞানের গরিমা উদ্ভাসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে, সাহিত্যে, শাস্ত্রে সেই সাধনার চরম উৎকর্ষ প্রতিফলিত হইল। সরল সহজ ধারায় জীবনযাপন এবং গভীর চিন্তাশক্তির সাধনাই (Plain living and high thinking) ছিল হিন্দুর সংস্কৃতির মূল মন্ত্র।

ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেও হিন্দুর দেব-দেউলের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে দেবপূজার স্থান ছিল 'বেদি', সকল ধর্ম্মেই বিশেষতঃ খৃষ্ট ধর্ম্মে এই 'বেদি'র (Altar) সম্মান পরিলক্ষিত হয়। চারিসহস্র বৎসরের পুরাতন সভ্যতার আকর মহেঞ্জোদারো বা হারাপ্পার ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত নানা শিল্প-সম্ভার হিন্দুর দেব-দেউলের সন্ধান দেয় না। যদিও ভারতের অপূর্ব্ব শিল্প-চাতুর্য্যের অনেক প্রমাণ মহেঞ্জো-দারোর ভূগর্ভ খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছে, তথাপি প্রাচীনতম দেবমন্দির বা পূজার স্থানের নিদর্শন পাওয়া যায় বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী কাল হইতে।

বৌদ্ধেরা যেমন দেশবিদেশে, সুদূর চীন ও গ্রীসে বুদ্ধদেবের জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির ধ্বজা

উড্ডীয়মান করিয়াছিল, তেমনি তাহারা অমল বুদ্ধ-চরিত ও বুদ্ধের উপদেশ শতসহস্র গুহাতে, বিহারে, স্তম্ভে ও প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত করিয়া চিরস্থায়ী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। সেইজন্য মানুষ আজিও বুদ্ধের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে; "আজিও অর্দ্ধজগত জুড়িয়া ভক্তিপ্রণত চরণে তাঁর"।

সেই বৌদ্ধদেরই অনুকরণে ও প্রেরণাতে হিন্দুরা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শিল্প-জ্ঞানের সাধনা করিয়াছিল। যেমন ঋষি ও সাধকেরা তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের আলোক কাব্যে, সাহিত্যে ও গাথায় বিকীর্ণ করিয়াছিলেন; তেমনি হিন্দু শিল্পীরাও ঐকান্তিক আগ্রহে নিজেদের সমস্ত দুঃখ, দৈন্য, শোক ও তাপ অগ্রাহ্য করিয়া, হৃদয়ের স্বার্থপরতা, দ্বেষ, হিংসা ও লোভ ত্যাগ-পূর্ব্বক পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ও শিষ্য-পরম্পরায় কঠোর তপস্যায়, ঐকান্তিক সাধনায় ধ্যানলব্ধ ধনকে পাষাণে রূপান্তরিত করিয়া ধন্য হইয়াছে।

গুপ্ত, পাল, সেন, চালুক্য, চোল, পল্লব, নায়ক, গঙ্গা আদি রাজবংশের উৎসাহে মধ্যভারতে, উড়িষ্যায় ও বাংলায় শিল্পিগণ আপ্রাণ চেষ্টায় ও কৌশলে যে-সব শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল তাহা যেমন সজীব তেমনি সৌন্দর্য্যময়। দেশ-বিদেশের শত শত দর্শককে এখনও সেই সব শিল্প অপার আনন্দ প্রদান করে। সেই সব শিল্প-নিপুণতার নিদর্শন আজও বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। কোণারকের সূর্য্যমন্দির, পুরীর জগন্নাথের ও ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দির-সমূহ, খাজুরাহোর কন্দর্য্য মহাদেবের মন্দির, ভীলসার উদয়গিরির গুহা, অজন্তার চৈত্য, ইলোরার কৈলাস-মন্দির, জব্বলপুরের

হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তিসম্ভার, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর, মাদুরার মীনাক্ষী-দেবীর ও মহাবলিপুরমের রথাকৃতি পঞ্চ মন্দির, সহস্রস্তম্ভ-যুক্ত রামেশ্বর শিবের দেউল এবং কাশী, কাঞ্চী, নাসিক, দ্বারকা, পুরী, গয়া, অযোধ্যা, কামাখ্যা, হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থের মন্দির-সমুদয় এখনও হিন্দু শিল্পী ও স্থপতির গৌরব প্রকাশ করিতেছে।

মানব-জাতির সভ্যতা ও জ্ঞানের পরিচয় যেমন তার দর্শনে, কাব্যে ও সাহিত্যে প্রস্ফুটিত হয়, তেমনই শিল্পীর নিপুণতায়, তাহার জীবনব্যাপী সাধনার ফলে জাতির স্বরূপ প্রকাশ পায় মন্দিরগাত্রে, স্তম্ভে ও মূর্ত্তি-গঠনে। শত সহস্র হিন্দু শিল্পীর সাধনা ও দক্ষতার মহিমা, এখনও যাহা কালের প্রভাব ও মানবের নির্ম্মম পীড়নের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বিলুপ্ত হয় নাই, বিশ্ববাসীকে বিস্মিত ও পুলকিত করে। উত্তর ভারতের বহু শিল্পীর সাধনা মুসলমানদের নির্ম্মম ও নিদারুণ আঘাতে বিধ্বস্ত হওয়াতে আজ বিশ্ববাসী কত অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে! এই সব শিল্প-ঐশ্বর্য্যের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে শিল্পানুরাগী মাত্রেই চিত্তে নিদারুণ ব্যথা পায়।

মুসলমান বাদশা ও বীরেরা হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে সব সুন্দর মূল্যবান্ মন্দির, বিহার, চৈত্য ও স্তূপ ছিল তাহা সমস্তই ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল ধ্বংস করিয়া নিরস্ত হন নাই, সেই ধ্বংসের উপরই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে ইসলামের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া হিন্দুগরিমা ম্লান করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা আদি তীর্থস্থানের সুমহান্ মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া তাহার উপর

সেই মন্দিরের মাল-মসলা লইয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুর বিশাল উদারতায় ও গভীর সাধনার বলে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

একদিন কাশীধামের জ্ঞানবাপীর পার্শ্বস্থিত বিশ্বনাথের পুরাণ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বে বসিয়া যখন মনে মনে দুঃখ অনুভব করিতেছিলাম তখন অলক্ষ্যে এক সাধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুজী, ক্যায়া শোচ্‌তা হ্যায়?" আমি ঔরংজেবের বর্ব্বরতা ও ভক্তের প্রতি বিশ্বনাথজীর উদাসীনতার কথা বলিলাম। সাধু তখন আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ইহাতে দুঃখের হেতুই বা কি আছে? লজ্জারই বা কি কারণ? কিসেরই বা দৈন্য? বাদশা এমন কি অন্যায় করিয়াছেন? এক দেব-দেউল ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরের আর একটি আরাধনা ও উপাসনারই স্থান করিয়াছেন। কোন নাচঘর বানাইবার সাহস তাঁহার ত হয় নাই। দেবস্থানে মসজিদ বা ঈশ্বরোপাসনার স্থানই করিয়াছেন।" হিন্দুদের উদার মনোবৃত্তির ইহা প্রকৃষ্ট পরিচয়। ইহা পরাধীন হিন্দুর দাসত্বোচিত মনোবৃত্তির পরিচয় নহে। মন্দির, মসজিদ, বিহার, চৈত্য, গির্জ্জা —সবই দেবোপাসনার স্থান, সবই দেব-দেউল।

ভারতের বিশ্বখ্যাত শিল্প-সম্ভার, সাধনা ও ঐশ্বর্য্য যাহা যুগে যুগে বিশ্ববাসীর প্রাণে অপূর্ব্ব প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে, সেই প্রকার কয়েকটি দেউলের ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও শিল্পৈশ্বর্য্য এখানে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

———
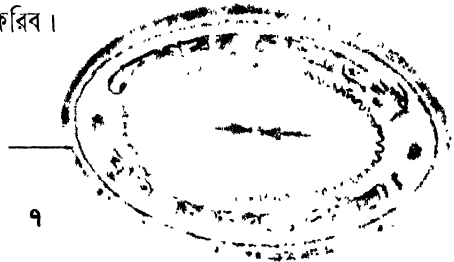
ইলোরার কৈলাস-মন্দির

ইলোরার গুহার শিল্পৈশ্বর্য্য ও স্থাপত্য-কৌশল বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়া থাকে। এই ইলোরার গুহাগুলিতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শিল্পীর ও স্থপতির দক্ষতার জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও বৌদ্ধ গুহাগুলির সংখ্যা ও আয়তন ইলোরার গুহা-সমষ্টির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তথাপি হিন্দুর কৈলাস-মন্দিরই ইলোরার শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্পদ্। কৈলাস-মন্দিরটি ঠিক একটি গুহা না হইলেও একটি উচ্চ পর্ব্বত ক্ষোদিত করিয়া ইহার মূল মন্দির, তোরণ, দীপস্তম্ভ, প্রাঙ্গণ এবং দ্বিতল দালান নির্ম্মিত হইয়াছে। মূল মন্দিরটি যদিও একই পর্ব্বত হইতে কাটিয়া-ছাঁটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে তথাপি ইহা যেন চতুষ্পার্শ্বস্থিত পাহাড়গুলি হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক্ দেখায়। মন্দিরের বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগের সমস্ত গাত্রে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও পৌরাণিক চিত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। কৈলাস-মন্দিরটি ভারতের, এমন কি বিশ্বের শিল্প-সম্পদের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই মন্দিরের আয়তন যেমন বিপুল, পরিকল্পনা তেমনই জটিল; ইহার কারুকার্য্য যেমন প্রচুর, ইহার শিল্পসৃষ্টিও তেমনই সুশ্রী। একজন ইংরাজ শিল্প-সমালোচক লিখিয়াছেন—
"Colossal in size, intricate in plan, extravagant in decoration, enriched with roofs, caves, pillars, figures, 'Bas relief', entirely beautiful, it is hewn vertically out of the heart of the rock.
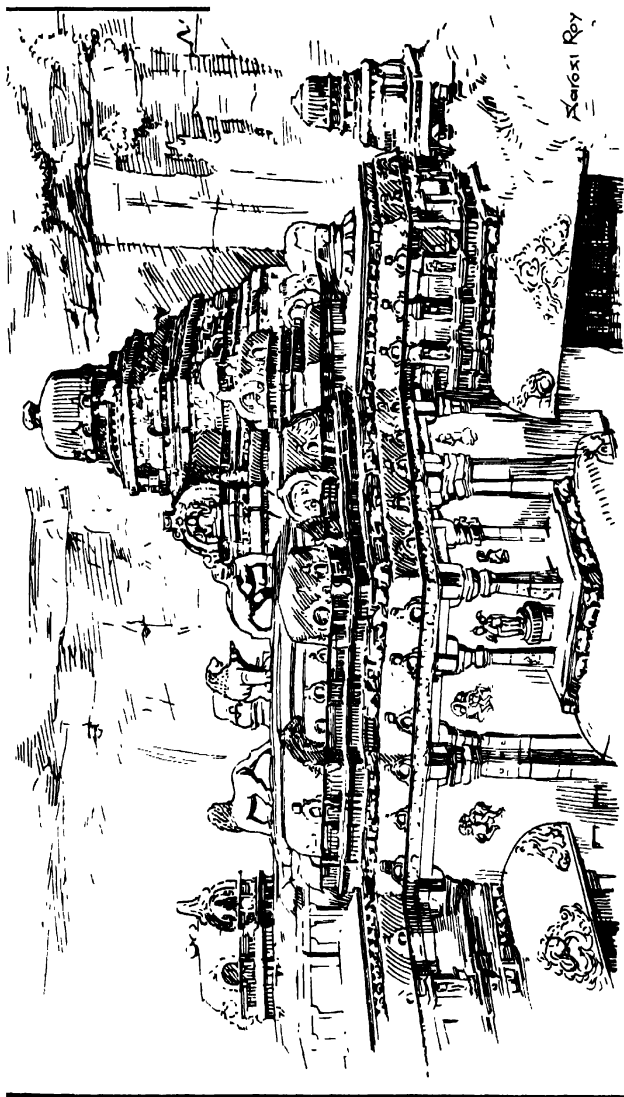
কৈলাস-মন্দির—ইলোরার গুহা

A vast carved monolith." ফার্গুসান সাহেব বলেন—"One of the most wonderful and interesting monuments of Architectural Art in India, and it possesses a marvellous wealth of sculpture." তিনি আরও বলেন—"Independently, however, of its historical or ethnographical value, the Kailas is itself one of the most singular and interesting monuments of architectural art in India. Its beauty and singularity always excited the astonishment of travellers." ('History of Indian and Eastern Architecture', Vol I, p. 342).

কৈলাসের পরিকল্পনা সম্পূর্ণই হিন্দু আদর্শে। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীতে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। ফার্গুসান সাহেব কৈলাস-মন্দিরের নির্ম্মাণ-সময়ের একপ্রকার সঠিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। চালুক্য-রাজ্যের পশ্চিম বিভাগের রাজা পুলকেশীর বংশধর, দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মা, মালকাহডের রাষ্ট্রকূট-বংশীয় দন্তিবর্ম্মদ্বারা ৭৫৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে পরাজিত হইয়াছিলেন। তাহার পরই তাঁহার খুল্লতাত রাজা কৃষ্ণের দ্বারা তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। রাজা কৃষ্ণ (প্রথম) ৭৫৩ হইতে ৭৮৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি এই ইলাপুরায় (বর্ত্তমান ইলোরায়) কৈলাস-মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 'Indian Antiquary', Vol. XII, ২২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"Thirty years ago, on the remains of painting in the roof of the small porch, was a fragment of an inscription in which the name of 'Kannara', *i.e.*, Krishna, was still legible in old characters."

ইনিই সেই রাজা কৃষ্ণ যিনি কৈলাস-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গঠন-কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে বোধ হয় কয়েক শতাব্দী সময় লাগিয়াছে, কারণ প্রায় ত্রিশ লক্ষ কিউবিক ফুট পর্ব্বতখণ্ড কাটিয়া-ছাঁটিয়া কৈলাস-মন্দিরটি গঠিত হইয়াছে। মন্দির ও প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া প্রায় তিনশত ফুট উচ্চ পর্ব্বতের প্রাচীর দণ্ডায়মান। দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের বেস্টনী ভেদ করিয়া প্রধান তোরণটি ক্ষোদিত হইয়াছে। চতুষ্পার্শ্বের পর্ব্বততল-গাত্র ক্ষোদিত করিয়া ইহার প্রাঙ্গণের চারিদিকে দ্বিতল, স্থানে
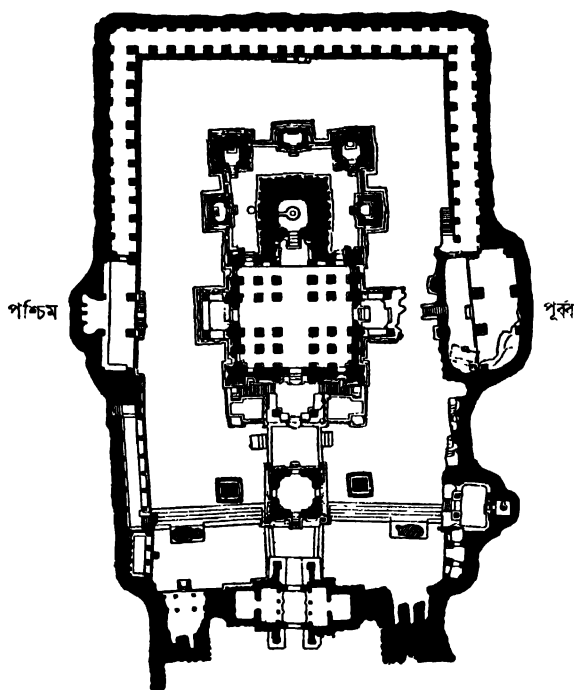
কৈলাস-মন্দিরের নক্সা। মাপ—১ ইঞ্চিতে ১০০ ফুট।

স্থানে ত্রিতল বারাণ্ডা পর্ব্বতের অভ্যন্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাই কৈলাস-মন্দিরের গুহার অপূর্ব্ব কৌশল। এই স্থানের স্তম্ভশ্রেণী ও প্রাচীর অত্যুচ্চ গিরিবপু ধারণ করিয়া রহিয়াছে। প্রধান তোরণ হইতে অবতরণ করিয়া প্রাঙ্গণ-মধ্যে কয়েক পদ অগ্রসর হইলে সম্মুখে বিশাল 'কৈলাস শিবে'র মূল মন্দির। এই প্রকাণ্ড দেউলের তলদেশের আয়তন পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২৮৭ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ১৬০ ফুট।

মহাবলিপুরমের পঞ্চ পাণ্ডবের 'রথ'গুলিও এক একটি পাহাড় কাটিয়া-ছাঁটিয়া খোদাই করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। এগুলি শিল্পজগতের অতুল সম্পদ্। কৈলাস-মন্দিরটি একটি পাহাড়ের বপুর ১০৬ ফুট গর্ত্ত কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। চতুর্ভুজাকৃতি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলেই মন্দির। ইহার বিমান ৯৬ ফুট উচ্চ; সম্মুখে একটি চতুষ্কোণ চাঁদনী —তাহার ছাদ ষোলটি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত; এখান হইতে আর একটি অসংলগ্ন চাঁদনী, যাহার নাম 'নন্দী-মণ্ডপ', তাহা একটি সেতু-দ্বারা সংযুক্ত। তাহারই সম্মুখে তোরণ, তাহাও নন্দী-মণ্ডপের সহিত সেতু-দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। এই হর্ম্ম্যগুলি একই পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত নন্দী-মণ্ডপের মধ্যে শিব-বাহন বৃষ বিরাজিত। মণ্ডপটির দুই পার্শ্বে ধ্বজস্তম্ভ। তাহারই দুই পার্শ্বে দুইটি প্রমাণ আকারের হস্তী। প্রাঙ্গণের চারিধারে স্তম্ভবেষ্টিত দালান, উপর ও পার্শ্ব পর্ব্বত-দ্বারা আচ্ছাদিত, প্রদক্ষিণ-পথের সংযুক্ত মঠ ও কক্ষগুলি সমস্তই খাড়া উচ্চ পর্ব্বতের কুক্ষিমধ্য হইতে ক্ষোদিত করিয়া গঠিত। ইহার উপর দ্বিতল বৃহৎ প্রকোষ্ঠ, একখানি পাহাড় হইতে মন্দির, চাঁদনী, নন্দী-মণ্ডপ,

ধ্বজস্তম্ভদ্বয়, সেতু, দ্বিতল প্রদক্ষিণ-পথ, মণ্ডপ ও তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। এইগুলির দ্বারা এক অপূর্ব্ব স্থাপত্য-নিদর্শন সৃষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য ফার্গুসান সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন—"......which give to the whole a complexity, and at the same time a completeness, which never fail to strike the beholder with astonishment and awe."

বিমানের চারিদিকের পাঁচটি ক্ষুদ্র কক্ষ ও সম্মুখের চাঁদনী এবং নন্দী-মণ্ডপ মিলিত হইয়া মূল শিবালয় গঠিত। ইহার জানালার সম্মুখের বারান্দার উপর দিয়া শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিবার পথ। এই পাঁচটি কক্ষ এখন শূন্য, কিন্তু 'কেভ্ টেম্পল অব্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের ৪২৮, ৪৩৪ ও ৪৫৩ পৃষ্ঠায় এই কক্ষগুলিতে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পরিচয় আছে। মূল মন্দির হইতে বাহির হইয়া প্রদক্ষিণ-পথের দক্ষিণ ভাগে অগ্রসর হইলে সপ্ত-মাতৃকার মন্দির। তাহার পশ্চাতের দেওয়ালের গাত্রে শিবমূর্ত্তি ক্ষোদিত; পার্শ্বে ভৃঙ্গ-সহ গণেশের মূর্ত্তিও বিরাজ করিতেছে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে চণ্ড, পূর্ব্বে পার্ব্বতী; উত্তর-পূর্ব্ব কোণের কক্ষটি রুদ্র ভৈরব এবং উত্তরের মন্দির গণেশের জন্য ব্যবহৃত হইত।

দক্ষিণ প্রান্তেই মন্দিরে উঠিবার প্রধান সোপানশ্রেণী অবস্থিত। সিঁড়ির ঘরের দক্ষিণ দিকের বাহির গাত্রে রামায়ণের লীলার ছবি এবং উত্তর দেয়ালে মহাভারতের নানা দৃশ্যাবলী অতি দক্ষতার ও সূক্ষ্মতার সহিত উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেকটি মূর্ত্তির ভাব, গঠন, প্রকাশ-শক্তি, ভঙ্গিমা এমনই সুস্পষ্ট হইয়াছে যেন সেগুলি এক একটি জীবন্ত চিত্র।
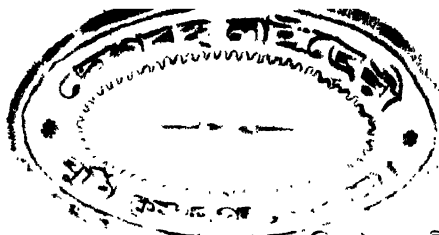
পর্ব্বতাভ্যন্তরে গুহায় (বারাণ্ডাগুলির) প্রাচীরে ক্ষোদিত প্রমাণ আকারের মূর্ত্তিগুলি শিল্পীর দক্ষতা, সাধনা ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় প্রদান করে। শিল্পীর ভঙ্গিতে এবং অঙ্গুলি-চালনায় এই দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি এক একটি ভাবের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন মূর্ত্তি, রামায়ণ-মহাভারতের লীলা-ক্ষোদিত প্রাচীর-চিত্র হিন্দুর নানা পৌরাণিক ঘটনার পরিচয় প্রদান করে। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম এই দৃশ্যাবলী-দর্শনে যেমন সহজে জানা যায় বহু শাস্ত্র ও পুস্তক অধ্যয়ন করিলেও তেমন সহজে জানা যায় না। কৈলাস-মন্দিরের ভাস্কর্য্য ও মূর্ত্তি-কারুকার্য্যই যে শুধু ইহার পরম ঐশ্বর্য্য তাহা নয়, ইহার ছাদের ভিতর দিকের এবং মন্দিরের ভিতরের দেয়ালের ফ্রেস্কো (প্রাচীর-চিত্র) অতি মনোরম-ভাবব্যঞ্জক ও রং ফলাইবার দক্ষতার পরিচায়ক। অজন্তার চিত্রাবলীর ন্যায় ইহা প্রচুর না হইলেও প্রাচীনতায় এবং অঙ্কন-পদ্ধতিতে ইলোরার ফ্রেস্কো অজন্তার ফ্রেস্কোর সমান, এমন কি উৎকৃষ্ট। বিধর্ম্মীদের অত্যাচারে ইহা নষ্ট হইয়া গেলেও চিত্রগুলির যে অংশ অধুনা সংস্কৃত হইয়াছে তাহা প্রত্যেক শিল্পানুরাগীর চিত্তে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। এই আংশিক প্রাচীর-চিত্রে অতীত কালের রূপ-দক্ষদের নিপুণতা এবং রংএর উজ্জ্বলতা ও স্থায়িত্ব বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদেরও বিস্মিত করিয়া দেয়।

মন্দিরে হস্তী, শার্দ্দূল এবং নানা পৌরাণিক জীব-জন্তুর মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। পশুগুলি পাশব শক্তির বিকাশক ; কেহ-বা লড়াই করিবার ভঙ্গিমায়, কেহ-বা অন্য জীবকে ছিন্ন-ভিন্ন

করিবার অবস্থায় রহিয়াছে, কাহারও তেজঃপূর্ণ অভিব্যক্তি ক্ষোদিত হইয়াছে। সকল মূর্ত্তির মধ্য হইতে এক মহাশক্তির ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। মূল মন্দির একদল মত্তহস্তীর উপর যেন ন্যস্ত। হস্তীগুলির গঠন ও ভাব অতি নিখুঁত এবং মনোহর।

মন্দিরের তলভাগে যে-সমস্ত রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্যাবলী দেখা যায় তাহা এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পোস্তার সর্ব্বনিম্ন স্তরে রাবণের মূর্ত্তি যেমন তেজঃপূর্ণ তেমনই মহান্। অন্যদিকে পোস্তায় দুর্গার মহিষাসুর-বধের মূর্ত্তি দেখিলে মহাশক্তিরই উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয়। প্রবেশ-দ্বারের উত্তর দিকের মণ্ডপের সম্মুখে চতুর্ভুজ শিবের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রাচীর-গাত্রে ক্ষোদিত, এই সংহার-মূর্ত্তি-দর্শনে পার্ব্বতী দেবী ভীতচিত্তে নতজানু হইয়া তাঁহাকে স্তব-স্তুতি করিতেছেন।

গুহার ভিতরের পশ্চাতের দেয়ালে কতকগুলি সাত-আট ফুট উচ্চ প্রমাণ আয়তনের দেবদেবীর মূর্ত্তি যেমনই ভাবব্যঞ্জক তেমনই শিল্পচাতুর্য্যমণ্ডিত। (১) পূর্ব্ব দিকের অন্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত হস্তে বিষ্ণুমূর্ত্তি, দুই পার্শ্বে লক্ষ্মীমূর্ত্তি পদ্মহস্তে দণ্ডায়মান। অপূর্ব্ব এই মোহনমূর্ত্তি শিল্পীর সাধনায় ক্ষোদিত। (২) পিছন দিকের দেয়ালে বিপুলায়তন বরাহ-মূর্ত্তি পৃথিবীকে দন্তে উত্তোলন করিয়া বিষ্ণু-অবতারের বিশাল শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। (৩) পার্ব্বতীর তাপস মূর্ত্তি দেখিলে শ্রদ্ধায় চক্ষু আনত হয়। তিনি দক্ষিণ হস্তে শিবলিঙ্গ ও বামহস্তে গণপতিকে ধারণ করিয়া পতি ও পুত্রের প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত করিতেছেন। (৪) মধ্যের কুঠরিতে ত্রিশূল, সর্প, ডমরু

ও ধুতুরা পুষ্প হস্তে সদাশিবের মূর্ত্তি মহাপ্রাণের পরিচয় প্রদান করে। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বিশালকায় নন্দী ও বাম পার্শ্বে ভৃঙ্গি অনুচর জোড়-করে দণ্ডায়মান। (৫) বিশাল নরসিংহ-দেবের জানূপরি রক্ষা করিয়া হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদীর্ণ করার মূর্ত্তি দেখিলে বিষ্ণু-অবতারের মাহাত্ম্যের উপলব্ধি হয়। ইঁহার পদতলে গরুড় পাখী যুক্তকরে বসিয়া প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করিতেছে। (৬) দক্ষিণ দিকের শৈলগুহাস্থিত গণপতির লম্বোদর ও লোলুপ গণ্ডস্থল দর্শন করিলে সিদ্ধির আশা না থাকিলেও আনন্দ পাওয়া যায়।

এই প্রকার লক্ষ্মী, কালিয়দমন, বামন অবতার, বলিবর্দ্ধন, পঞ্চভূত-সহিত অনন্তশয্যাশায়ী নারায়ণ, ব্রহ্মা-সহ শিবলিঙ্গ, অর্দ্ধনারীশ্বর, ষণ্ড-সহিত মহাদেব, চণ্ড-মহাচণ্ড, বিশাল ভস্মাসুর ভৈরব, বীরভদ্র, কালভৈরব, পত্নী-সহ অষ্ট ভৈরবমূর্ত্তি, হংস(বাহন)-সহ ব্রহ্মা, গরুড়-সহ বিষ্ণু, ষণ্ড-সহ মহেশ্বর, বৃষ- ও গরুড়-সহ হরিহর, গঙ্গাধর, ঘণ্টা-হস্তে শিব, হর-পার্ব্বতী যুগল, ত্রিপুরাসুর-বধরত শিব, গয়াসুর, রত্নাসুর, মায়াসুর-বধরত শিব, পাণিগ্রহণকালীন হর-পার্ব্বতী, মার্কণ্ডেয়, ভক্তবৎসল শিবলিঙ্গ, অক্ষ-ক্রীড়ারত হর-পার্ব্বতী. শিবারাধনা-রত ছিন্নদশ-মুণ্ড রাবণ—এই সব মূর্ত্তি শিল্পীর সাধনায় এমনই সজীব হইয়াছে যে, তাহা দর্শনে পাষাণহৃদয়ও ভগবৎপ্রেমে বিগলিত হয়।

প্যান্থিয়ন (Pantheon), পার্থিনন (Parthenon) St. Peters', St. Paul's ও Fonthill Abbey নামক অত্যাশ্চর্য্য স্থাপত্য পাশ্চাত্ত্য শিল্পীর শক্তির পরিচায়ক। তবে সেগুলি সমস্ত বৈজ্ঞানিক কৌশলের সাহায্যে নির্ম্মিত, কিন্তু

ভারতের শিল্পীরা কেমন করিয়া এই অদ্ভুত ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য *সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা এখনও সকল দেশের সুধীগণের* বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। একজন পাশ্চাত্য পর্য্যটক লিখিয়া গিয়াছেন—"It baffles adequate description in cold print to conceive for a moment a body of men, however numerous, with a spirit, however invincible, and resources, however great, attack a solid mountain rock, in most part 100 feet high, and excavating by the slow process of chisel a temple like one (Kailas), with its galleries, its vast area and indescribable mass of sculpture and carving in endless profusion, the work appears beyond belief and the mind is bewildered in amazement." (I. S. R., Vol. IX, p. 476).

প্রধান মন্দিরের সম্মুখে চত্বরের উপর উভয়পার্শ্বে দুইটি অতিকায় হস্তী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় হস্তিদ্বয় অতি নির্দ্দয়ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই দীপস্তম্ভদ্বয়ের শিরে শিবের ত্রিশূল ছিল, এখন তাহা ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। চত্বরের বামে ও দক্ষিণে ৪ ফুট উচ্চ পোস্তার উপর, ৬ ফুট মোটা, ৪৯ ফুট উচ্চ চতুষ্কোণ প্রস্তরস্তম্ভ। একই মূল পর্ব্বত হইতে মন্দির, দালান, তোরণ ও নাটমন্দির গুহাগুলি হইতে পৃথক্ পৃথক করিয়া ক্ষোদিত হইয়াছে। স্তম্ভদ্বয়কে 'দীপস্তম্ভ' বা 'জয়স্তম্ভ' বলে, গাত্রের কারুকার্য্য অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষোদিত, মন্দিরে উঠিবার সেতুর দুইটি পার্শ্বে শিবের অপূর্ব্ব বিপুল মূর্ত্তি দর্শকের চিত্ত বিস্ময়ে পূর্ণ করে। একটির চক্ষু যেমন ভীতিপ্রদ ও তেজোদীপ্ত, অপরটির নয়নদ্বয়

তেমনই কমনীয়, ভগবৎ-প্রেমপূর্ণ স্নেহশীল ধ্যানী বুদ্ধের ন্যায় সৌম্য। *দাক্ষিণাত্যের ন্যায় এখানেও শিবের তাণ্ডবনৃত্য-ভঙ্গিমায়* নটরাজ-মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। নৃত্য আনন্দের রূপ। তাই শিবের নৃত্যের নিদর্শন সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল যে দক্ষিণ-ভারতেই আছে তাহা নহে।

দ্বিতলের বারাণ্ডায় যে ফ্রেস্কোর অংশ দেখা যায় তাহাই ইলোরার প্রাচীর-চিত্রের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হস্তীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা যেমন ভাবপ্রকাশক তেমনই রং-ফলানর কৃতিত্বের পরিচায়ক।

মন্দিরদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি ভীমকায় দ্বারপালের ভৈরব-মূর্ত্তি পাপীর চিত্তে ভীতি উৎপাদন করে। নাটমন্দিরটির ছাদ ১৬টি ২০ ফুট উচ্চ ৪´×৪´ চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর ন্যস্ত; ছাদটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাদেব, নন্দী, পার্ব্বতী প্রভৃতি শিব-পরিবারের মূর্ত্তিদ্বারা শোভিত। মধ্যে বিকশিত কমল-দলের উপর প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ স্থাপিত। দ্বিতলের উপর পঞ্চ শিবমন্দির উচ্চচূড়া-সম্বলিত হইয়া ক্ষোদিত। মধ্যে মূল মন্দিরের সম্মুখে একতলায় নাটমন্দিরের উপর বৃষমূর্ত্তি শয়ান অবস্থায় রহিয়াছে। তৎপরে তৃতীয়তলে চারিদিক্ উন্মুক্ত—সাধনার প্রকৃষ্ট স্থান। মনে হয় না যে, এই সব একই পর্ব্বত হইতে কাটিয়া-ছাঁটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার কৌশল না দেখিলে উপলব্ধ হয় না, ইহার মহিমা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে বুঝা যায় না।

প্রাঙ্গণের উত্তরাংশের পশ্চিম কোণে এক দেবালয় পাহাড়ের অভ্যন্তর কাটিয়া নির্ম্মিত রহিয়াছে। ইহা গঙ্গাবতরণ-মণ্ডপ নামে খ্যাত। ইহার দুই পার্শ্বে বহির্দেশে প্রকাণ্ড

3—1304 B.

দুইটি দ্বারপাল ভৈরবমূর্ত্তি ক্ষোদিত। কক্ষের সম্মুখে দুইটি পূর্ণ এবং দুইটি অর্দ্ধ স্তম্ভ দেখা যায়। ইহাদের গঠন-পদ্ধতি বিভিন্ন। অভ্যন্তরের প্রাচীর-গাত্রে অপূর্ব্ব সুন্দর ভঙ্গিমায় গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত। বামদিক্ হইতে প্রথম মূর্ত্তিটি প্রস্ফুটিত কমলের উপর দণ্ডায়মানা সরস্বতীর, পশ্চাতে নানা পক্ষী ও পত্রপল্লবাদি অঙ্কিত রহিয়াছে। মধ্যে মকরবাহিনী গঙ্গা ও ডান দিকে কূর্ম্মবাহিনী যমুনামূর্ত্তি ক্ষোদিত। প্রত্যেক মূর্ত্তি পর্ব্বত-গাত্র হইতে উত্থিতভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে। কৈলাস-মন্দিরের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে এই মূর্ত্তি প্রাচীনতম, ইহা পঞ্চম শতাব্দীতে ক্ষোদিত। এই কক্ষটি ২৩½ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট প্রস্থে এবং ১১ ফুট উচ্চ। ইহার উড়াপট্টি ৭টি প্যানেলে বিভক্ত। ইহাতে নদীর উর্ব্বরাশক্তির প্রতীক কতক-গুলি মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, তাহার মধ্যের কলসীর সারি ও ঐরাবতশ্রেণী বারিপাতের সুলক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। হ্যাভেল সাহেব বলিয়াছেন বিভিন্ন সময়ে কৈলাস-মন্দির ক্ষোদিত হইলেও ইহা একই পরিকল্পনার অন্তর্গত—

"......part of skilfully co-ordinate traditional plan which the original designers had in view, if they did not actually lay it out. In fact we have in Kailasa a complete reproduction, so far as different technical conditions allowed, of one of the great structural temples of the epoch, including the surrounding wall, accessory chapels and monastic buildings"—Havell's 'Ancient and Mediæval Architecture of India', p. 200.

ইলোরা

ভারতের অতীত গৌরবের প্রকৃত মহিমা জ্ঞাত হইতে হইলে ইলোরার 'কৈলাস' অবশ্য দর্শনীয়।

ইলোরা একটি তীর্থস্থান। ইলোরার পর্ব্বতাবলী অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে থাকায় ইহা ঠিক যেন শিব-ভালে শশিকলার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই প্রকার কবিজন-মনোরঞ্জক রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সুরম্য স্থানে শিবজটা ভেদ করিয়া গঙ্গার অবতরণের ন্যায় এক মনোরম জলপ্রপাত নির্গত হইয়া এই স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছে। হ্যাভেল সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—

"The amenities of the place which made it sacred to religious devotees of every sect were likewise Siva's moon crest, the bend of rushing torrent overhung by a rocky hill, and a waterfall. Ajanta was a university, Ellora a *tīrtha*, or place of pilgrimage."

কৈলাস-মন্দিরের নাম শিবের আবাস হিমালয় বা কৈলাস হইতে গৃহীত হইয়াছে। খুব উচ্চ চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরই শিব-মন্দির হয়, এবং হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গের অনুকরণে ইহার শিখর সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণের পলস্তারা-মণ্ডিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিষ্ণুর মন্দির প্রায়ই বহুশিখরমণ্ডিত হয়, সেইজন্য বিষ্ণুমন্দিরকে সুমেরু বা মেরুপর্ব্বত বলা হইয়া থাকে। হ্যাভেল সাহেব শিবের কৈলাস পাহাড় সম্বন্ধে বলেন—"The distinction between the two symbols was—the Siva's mountain was the rugged, white snow-capped peak soaring above the cloud, where

nature was quiescent and as if wrapped in meditation.''—যোগী যেন নির্ব্বিকার, প্রশান্ত মূর্ত্তিতে নিরালায় পৃথিবীর কোলাহলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আর বিষ্ণুর সুমেরু পর্ব্বত—'Vishnu's symbol was the fruitful mountain, whose rounded summit was crowned with Deodar or Cedar, and the tree- and flower-clad hill glad with the song of birds and teeming with joy like a lotus flower with turned down petals offering its nectar to the bees.''—Havell's 'Ancient and Mediæval Architecture of India', p. 194.

হ্যাভেল সাহেবের মতে হিন্দুরাই ইলোরায় প্রথম প্রতিপত্তি লাভ করেন। কারণ কৈলাস-মন্দিরটি মধ্যভাগে এবং জল-প্রপাতের সন্নিকটে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থিত। ব্রাহ্মণেরা জলপ্রপাতকে শিব-জটার মধ্য হইতে বহির্গত গঙ্গাধারার ন্যায়ই পবিত্রজ্ঞানে এখানে তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার পর বৌদ্ধেরা উত্তর প্রান্তে এবং জৈনেরা দক্ষিণ প্রান্তে তাঁহাদের বিহারাদির পত্তন করিয়াছিলেন।

কৈলাস-মন্দিরের বর্ণনা করিতে যাইয়া একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—"It is a veritable monument of human patience, a labour and skill combined. * * * a mighty fabric rock, surpassed by no relic of antiquity in the known world.'' তিনি লিখিয়াছেন—এই বিশাল আয়তনের মন্দিরের অভূতপূর্ব্ব অবর্ণনীয় মূর্ত্তিগুলির কারুকার্য্যের সূক্ষ্মতা ও প্রাচুর্য্য দেখিলে কেমন

করিয়া ইহা একটি পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে চিত্ত পূর্ণ হইয়া যায়। ইলোরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও সাধনার ক্ষেত্র; তিনটি বিশিষ্ট ধারায় উৎকৃষ্ট স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও শিল্পৈশ্বর্য্যের নিদর্শন ইলোরার গুহার মধ্যে দেখা যায়।

ইলোরার গুহাবলী

কৈলাস-মন্দিরের পার্শ্বের ২নং গুহা, 'রাবণ-কি-কাই' (Ravana-ki-kai) গুহাটি অতি মনোরম। ইহার দক্ষিণ প্রাচীরের গাত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিস্ময়কর দৃশ্য ক্ষোদিত রহিয়াছে—মহিষাসুর-বধের বীরোচিত দৃশ্য; একটি চত্বরে ছক্ পাতিয়া হর পার্ব্বতীর সহিত দশ-পঁচিশ ক্রীড়ায় রত রহিয়াছেন, পশ্চাতে গণেশ ও নন্দী দণ্ডায়মান; পার্ব্বতী রাবণের ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া ভীত চিত্তে হরের গলদেশ বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন; পৃথিবী ধ্বংস করিয়া শিব তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন; রাবণ তাহার বিশাল বপু লইয়া কৈলাসকে মস্তকোপরি রাখিয়া যেন লঙ্কায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। একটি মূর্ত্তিতে ভৈরব একটি স্থূলকায় বামনের মস্তকে একপদ স্থাপন করিয়া এবং অপরটি তাহারই পার্শ্বে রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহারই পশ্চাতে গণপতি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সেই ভৈরব দুই হস্তে হস্তিচর্ম্ম, যাহার দ্বারা তিনি নিজদেহ আবৃত করিয়া থাকেন, তাহা উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন; অপর দুই হস্তে তাঁহার বিষম শত্রু রত্নাসুরকে

রাবণ-কি-কাই গুহা

বিদ্ধ করিবার জন্য সুতীক্ষ্ণ বর্ষা উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন; পঞ্চম পাণিতে তরবারি ধরিয়াছেন, এবং ষষ্ঠ হস্তে শত্রুরক্ত ধরিবার জন্য পাত্র ধরিয়া আছেন।

উত্তরের প্রাচীরগাত্রে নিম্নলিখিত দৃশ্যগুলি আছে—চতুর্ভুজা দুর্গাদেবী ব্যাঘ্রোপরি পদদ্বয় স্থাপন করিয়া দক্ষিণের উপরহস্তে ভয়ঙ্কর ত্রিশূল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; পদ্মের উপর লক্ষ্মী বসিয়া আছেন; বরাহ-অবতার শেষনাগের মস্তকোপরি পদ রাখিয়া অবস্থিত; চতুর্ভুজ নারায়ণ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-সহ একই আসনে পরমসুখে বসিয়া আছেন, কারুকার্য্যখচিত একটি খিলান লক্ষ্মীনারায়ণের উপর গঠিত।

এই গুহার সম্মুখভাগ নানা কারুকার্য্যে মণ্ডিত। ১২টি ৩′×৩′ পরিধির ১৫′ উচ্চ স্তম্ভ গুহার ছাদকে ধারণ করিয়া আছে।

দশ অবতার গুহা

তাহার পর আমরা ৩ নং 'দশ অবতার' গুহার মধ্যে গমন করিতে পারি। সমস্ত গুহাটি একটি পাহাড় কাটিয়া-ছাঁটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, সম্মুখে একটি কারুকার্য্য-মণ্ডিত দেয়াল পর্দ্দার ন্যায় যেন অন্দর মহলের আবরু রক্ষা করিতেছে। মধ্যে একটি দালান, তাহার ঠিক মাঝখানে কতকগুলি ছোট ছোট মন্দির এবং একটি জলাধার অবস্থিত। চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতগুলি যেন প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সম্মুখের একসারি স্তম্ভ নানা-কারুকার্য্যমণ্ডিত হইলেও অপর সমস্ত সারির থামগুলি সাদাসিধা চতুষ্কোণ। এই থামগুলির মাতলা অপূর্ব্ব বৌদ্ধ-স্থাপত্য-ধারায় ক্ষোদিত, কিন্তু নিম্নভাগের কারুকার্য্য সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য-ভাস্কর্য্যের রীতি ও পদ্ধতিতে গঠিত। এক স্থানে

প্রাচীরচিত্রে গণপতি, পার্ব্বতী ও সূর্য্যমূর্ত্তি ক্ষোদিত। প্রত্যেকের হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং দুই পার্শ্বে দুইটি অনুচর। অন্য প্রাচীর-চিত্রগুলিতে শিব ও পার্ব্বতী; মহিষাসুর; অর্দ্ধনারী; চতুর্ভুজা ভবানী ব্যাঘ্রোপরি বসিয়া আছেন, হস্তে ত্রিশূল ও ডমরু শোভা পাইতেছে। সুদৃশ্য গণপতি, কালীমূর্ত্তি ও যজ্ঞ-কুণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নির সম্মুখে তপস্যায় রতা জলপাত্র-হস্তে তপস্বিনী উমার মুখমণ্ডল ক্ষোদিত করিয়া সেই সময়ের শিল্পিগণ অপূর্ব্ব শিল্পপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই গুহার অনেক স্তম্ভের গাত্রে নানা পত্র ও পুষ্প ক্ষোদিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। সেই যুগের শিল্পীদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান যে কত উচ্চাঙ্গের ছিল তাহা এই গুহার কারুকার্য্য প্রতিপন্ন করিতেছে। যম-ভয়ভীত মার্কণ্ডেয় শিবলিঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, সেই শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া শিবমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া আশ্রিতকে অভয় প্রদান করিতেছে, অদূরে যমরাজ সন্ত্রস্ত হইয়া দণ্ডায়মান—এই চিত্রটি অতি সুনিপুণ ও সুন্দররূপে একখানি পাহাড় হইতে ক্ষোদিত হইয়া অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহা উক্ত পৌরাণিক কাহিনীটিকে যেমন চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া দেয়, তেমনই শিবের মহিমায় দর্শকের মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

রামেশ্বর গুহা

এই গুহাটির পার্শ্বেই ৯ নং 'রামেশ্বর' গুহা। এই গুহাটি সম্পূর্ণই শৈব মন্দির। একটি পাহাড় কাটিয়া তাহারই অভ্যন্তরে গুহাটি নির্ম্মিত। মাঝখানে প্রকাণ্ড হল বা দালান। দালানের অভ্যন্তরে এক কোণে কালী, গণেশ, হর ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি অতি সুস্পষ্টরূপে

ক্ষোদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-ধারায় নির্ম্মিত অবশিষ্ট গুহা-গুলির মধ্যে "সীতার বিবাহ" নামে অভিহিত গুহাটিও অতি মনোরম। গুহাটির প্রাচীরগাত্রে নানা পৌরাণিক চিত্র পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে ক্ষোদিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। দুইটি বৃহদায়তন পশুরাজ থাবা উত্তোলন করিয়া হলের প্রবেশপথের সিঁড়ির ধাপের উপর বসিয়া পাপী ও তাপীদের চিত্তে পবিত্র মন্দিরে প্রবেশের সময়ে ভয় ও ভক্তি উৎপাদন করিতেছে। এই সুবিস্তৃত হলটি কলিকাতার সিনেট হল অপেক্ষা বৃহত্তর, সমস্তটাই একই পাহাড়ের অভ্যন্তর কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। হলটি খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতীক 'ক্রশ'-এর আকারে নির্ম্মিত। ত্রিশটি বিপুলায়তন স্তম্ভ-দ্বারা ইহার ছাদ সুরক্ষিত। ছাদের তলা (সিলিং) সমতল এবং কারুকার্য্য-মণ্ডিত। ছাদের উপরটা একখানা পর্ব্বতশৃঙ্গ। এখানেও রাবণের কৈলাস-পর্ব্বতকে নাড়াইতে প্রয়াস পাইবার চিত্র ক্ষোদিত। এই সমস্ত গুহার মূর্ত্তিগুলির মুখভঙ্গিমা যেমনই সুশ্রী তেমনই ভাবোদ্দীপক।

ব্রাহ্মণ্য-ধারায় নির্ম্মিত গুহাগুলির উত্তরে প্রায় অর্দ্ধ মাইল অন্তরে জৈন স্থাপত্য-ধারায় নির্ম্মিত পাঁচটি অতি উচ্চাঙ্গের শিল্প-নিদর্শনপূর্ণ গুহা এখনও অটুট রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে 'ইন্দ্রসভা'-নামক গুহাটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর। ইহার ছাদের তলার চিত্রগুলির অঙ্কন ও বর্ণবিন্যাস বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়া দেয়। এই ফ্রেস্কোগুলি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াও তাহাদের উজ্জ্বলতা এবং সৌন্দর্য্যে দর্শকমাত্রকেই পরম প্রীতি প্রদান করে। এই

ইন্দ্রসভা—জৈন গুহা

ইন্দ্রসভার আর একটি বিশিষ্টতা ইহার প্রবেশদ্বারের সম্মুখের অলিন্দের দুইটি স্তম্ভ। তাহার গাত্রে মুষ্ট্যাঘাত করিলেই সুমধুর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। একই পর্ব্বত হইতে ক্ষোদিত হইয়া নিরেট প্রস্তর-স্তম্ভদ্বয় কেমন করিয়া এমন সুমধুর ধ্বনি করে বৈজ্ঞানিক এবং পাশ্চাত্ত্য পূর্ত্তবিদ্‌গণ সে সমস্যা সমাধান করিতে পারেন নাই। এই ইন্দ্রসভার মধ্যে সিংহাসনোপরি মহাবীর উপবিষ্ট এবং উভয় পার্শ্বে কয়েকটি ধ্যানস্তিমিতলোচন দিগম্বর জৈন তীর্থাঙ্কুরের মূর্ত্তি ক্ষোদিত

ঐরাবতের পৃষ্ঠে ইন্দ্র

রহিয়াছে। মস্তকোপরি বাদক ও নর্ত্তকদল ভিড় করিয়া রহিয়াছে। পশ্চাতের প্রাচীর-গাত্রে ঐরাবতের উপর উপবিষ্ট

4—1304 B.

ইন্দ্র, দক্ষিণে ইন্দ্রাণী বসিয়া আছেন। দুই পার্শ্বে দুইটি অনুচর দেখা যায়। গুহার ভিতরের একটি হলে দ্বাদশটি সুন্দর কারুকার্য্য-মণ্ডিত স্তম্ভ বিরাজিত, এই স্তম্ভগুলি পঞ্চবিধ পরিকল্পনায় ও পদ্ধতিতে ক্ষোদিত। বারাণ্ডার প্রত্যেক প্রান্তে বৃহদাকার মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। পশ্চিমপ্রান্তে পুরুষ- ও পূর্ব্বপ্রান্তে স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখা যায়; সাধারণতঃ এই দুইটি ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। হস্তীর উপর উপবিষ্ট মূর্ত্তিটি ইন্দ্রের এবং সিংহোপরি উপবিষ্ট স্ত্রীমূর্ত্তিটি ইন্দ্রাণীর। প্রত্যেক মূর্ত্তির পশ্চাতেই একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেন তাপসদের তাপ নিবারণ করিবার জন্যই রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বেই কয়েকটি অনুচরের মূর্ত্তিও ক্ষোদিত রহিয়াছে। এখানকার স্ত্রীমূর্ত্তিটি অপূর্ব্ব-সুষমামণ্ডিত। এই গুহার শিল্পী প্রাণের আবেগে দ্রাবিড়-ধারায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া অমর হইয়া আছেন। এই সব শিল্পীর সাধনার মূল-মন্ত্র জানিবার ও ঐশ্বর্য্য দেখিবার শক্তি কোথায়?

ইলোরার গুহাগুলির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এক বিদেশীয় পর্য্যটক ঠিকই মন্তব্য করিয়াছেন -"If there can be grandeur in simplicity, the group of Ellora caves ought to count among the foremost." ফার্গুসান সাহেব বলেন—'বিশ্বকর্ম্মা' চৈত্য ৬০০ খৃষ্টাব্দের এবং 'দুনথাল' ও 'তিনথাল' বিহারগুলি ৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।"

ইলোরার পার্ব্বত্য গুহাগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দেড় মাইল লম্বা উচ্চ পাহাড়ী স্থান কাটিয়া-ছাঁটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এই স্থানে মোট

৩৪টি গুহা আছে। তাহার মধ্যে ১৭টি ব্রাহ্মণ্য, ১২টি বৌদ্ধ, এবং ৫টি জৈন স্থাপত্য-ধারায় পাহাড় কাটিয়া তাহার অভ্যন্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতমালার মধ্যাংশে ব্রাহ্মণ্য ধারায় গঠিত গুহাগুলি অবস্থিত, তাহাদের উত্তর-পার্শ্বে জৈন গুহা এবং দক্ষিণাংশে বৌদ্ধদের গুহাগুলি রহিয়াছে।

বৌদ্ধ পদ্ধতিতে নির্ম্মিত গুহাবলীর মধ্যে প্রথম গুহাটি বৌদ্ধ বিহার, তাহার চারিপার্শ্বে শ্রমণ ও ভিক্ষুদের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ। বৌদ্ধ ধারায় দ্বিতীয় গুহাটি অতি বৃহৎ। কয়েকটি উঁচু উঁচু সোপানের ধাপ বাহিয়া উপরে উঠিলেই প্রকাণ্ড সুদৃশ্য হলের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। দুই পার্শ্বের গ্যালারীতে বিভিন্ন পরিকল্পনার চারিটি করিয়া স্তম্ভ আছে। সম্মুখের স্তম্ভশ্রেণীগুলিতে অতি সূক্ষ্ম এবং মনোরম কারুকার্য্যমণ্ডিত, মাঝে মাঝে গীতবাদ্যরত নানা মানবমূর্ত্তিও ক্ষোদিত রহিয়াছে। পার্শ্বের গ্যালারীর অনেক মূর্ত্তিই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। মন্দিরের ভিতরের কক্ষে সিংহাসনোপরি ধর্ম্মপ্রচাররত ভঙ্গিমায় অতিকায় বুদ্ধমূর্ত্তি বসিয়া আছেন।

বৌদ্ধ গুহা

তৃতীয় গুহাটি একটি বৌদ্ধ বিহার (monastery)। ইহার ছাদটি দ্বাদশটি স্তম্ভের দ্বারা রক্ষিত। ইহার উত্তরাংশে একটি মন্দিরের কক্ষে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় বুদ্ধদেব একটি প্রকাণ্ড পদ্মের আসনের উপর বসিয়া আছেন। সিংহাসন-তলে কয়েকটি মূর্ত্তি রহিয়াছে। মস্তকোপরি বাসুকি ফণা বিস্তার করিয়া আছে। বুদ্ধদেবের দক্ষিণ- ও বাম-পার্শ্বে দুইটি চামর-ব্যজনকারী দণ্ডায়মান। নভোমণ্ডলে কতকগুলি গন্ধর্ব্বমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

চতুর্থ গুহাটি ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় রহিয়াছে। এখানেও বুদ্ধ একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম-পুষ্পের উপর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন। মন্দিরদ্বারের পশ্চিমে বুদ্ধদেবের পার্শ্বচর পদ্মপাণি বুদ্ধের ন্যায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত।

পঞ্চম গুহাটির নাম 'মহার্দ্বা' (Mahardwa) বিহার। এইটি বৃহদায়তনের বিহার, ১১০ ফুট দৈর্ঘ্যে ও ৫৮ ফুট প্রস্থে এবং দুই পার্শ্বে দালান পর্ব্বতের অভ্যন্তরে ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ছাদ ২৪টি চতুষ্কোণ অতিকায় স্তম্ভের উপর অবস্থিত। দালানের চারিপার্শ্বে শ্রমণদের ২০টি থাকিবার কক্ষ এবং অভ্যন্তরে মস্ত-বড় ঠাকুর-দালান। মধ্যে প্রকাণ্ড এক বুদ্ধমূর্ত্তি, তাহার চারিপার্শ্বে শিষ্যমণ্ডলী বসিয়া আছে। এই বিশাল আয়তনের গুহাটিও পর্ব্বত কাটিয়া অভ্যন্তরে গিয়াছে।

মহার্দ্বা-গুহা

ষষ্ঠ গুহার ভিতরের কক্ষটি অতি মনোরম। তাহার ভিতরে বুদ্ধদেব সমাসীন, তাঁহার দুই পার্শ্বে অনুচরগণ দণ্ডায়মান। এই গুহার প্রাচীরগাত্রের সরস্বতীমূর্ত্তিটি অতি অপরূপ। বাগ্‌দেবীর পার্শ্বে এক ময়ূর ও নীচে এক পণ্ডিতের মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। বীণাপাণির মুখমণ্ডলে কি সৌম্যভাব!

সপ্তম, অষ্টম, ও নবম গুহা কেবল বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষু-দিগের বাসের জন্য নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে কোন ভাস্কর্য্য নাই।

দশম গুহাটি এতদঞ্চলের অধিবাসীদের পরম প্রিয়। এই গুহাটি 'বিশ্বকর্ম্মা'-গুহা নামে খ্যাত। এই প্রদেশের সূত্রধরেরা প্রায়ই এই গুহাতে আসিয়া ইহার মধ্যস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তিকে 'বিশ্বকর্ম্মা'র মূর্ত্তিজ্ঞানে

বিশ্বকর্ম্মা-গুহা

বিশ্বকর্ম্মা-গুহার অভ্যন্তর—ইলোরা

স্বস্বকার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করিবার মানসে পূজা ও মানত করিয়া থাকে। বুদ্ধ এখানে উচ্চ 'ডাঘোবা'য় পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। এই গুহাটির পাথরের উপর অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ বাটালির কাজ ইংরাজদের বিস্ময় উৎপাদন করায় তাঁহারা ইহার নাম 'Carpenter's Hut' দিয়া থাকেন। এই গুহাটি একটা গোটা পর্ব্বতকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া এমন সূক্ষ্ম ও সুশ্রী-কারুকার্য্যমণ্ডিত এক সুবৃহৎ দালানে পরিণত করা হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে এক ইংরাজ পরিব্রাজক এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন—"This is a splendid specimen of the art of carving the living rock into a spacious chamber with a vaulted roof."

এই গুহার সম্মুখভাগে একটি দ্বিতল তোরণ অবস্থিত। ইহার দ্বিতলে উঠিবার জন্য পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রবেশ-স্থানের অভ্যন্তরের গ্যালারী তিন অংশে তিনটি কক্ষে বিভক্ত, এবং প্রত্যেকটি ঘর নানা মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। বাহির অংশের বারাণ্ডার প্রান্তে দুইটি কক্ষ ও দুইটি দেউল আছে। দেউল-মধ্যে এখানকার স্থাপত্যরীতি অনুসারে বুদ্ধ-মূর্ত্তি বিরাজিত। এই চৈত্য-হলটি প্রকাণ্ড আয়তনের, লম্বায় ৮৫'।১০", প্রস্থে ৪৩', চৈত্যের ভিতরের উচ্চতা ৩৪'। শেষ প্রান্তে বিশাল 'ডাঘোবা'-মধ্যে বেদীর উপর পা ঝুলাইয়া বুদ্ধ বা বিশ্বকর্ম্মা বসিয়া আছেন। এই খানে মহাযান বৌদ্ধদের উপাস্য নানা মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। ফার্গুসান সাহেব বলিয়াছেন—"This cave is remarkable for its huge DAGHOBA with its immense seated figures of Buddha and

his assistants. The DAGHOBA may perhaps best be described as a cylindrical structure supporting a sphere or globe while the dome in turn supports a square capital." এই গুহাটি ইহার প্রকাণ্ড 'ডাঘোবা'র জন্য বিখ্যাত। 'ডাঘোবা' নিম্নভাগ হইতে গোলাকৃতি হইয়া ঊর্দ্ধদিকে ঈষৎ সরু হইয়া গিয়াছে। উপরিভাগ অর্দ্ধগোলাকার, তাহার শিরে চতুষ্কোণ স্তম্ভ বিরাজিত। এই স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে প্রভু বুদ্ধের অস্থি বা দেহাংশ রক্ষিত আছে বলিয়া কিংবদন্তী। ইহার কোন ঐতিহাসিক বা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। 'ডাঘোবা' সকল সময়েই বিহারের শেষ প্রান্তের কক্ষে স্থাপিত হয়। এই গুহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ছাদটি অর্দ্ধগোলাকৃতি এবং বহু পাথরের কড়ি পাহাড় হইতে ক্ষোদিত হইয়া এমনই পর পর অবস্থিত রহিয়াছে যে সেগুলি পাঁজরের মত দেখায়, এই কড়িগুলি যোগাসনে বসিয়া থাকা পুরুষ- বা স্ত্রী-মূর্ত্তির মস্তক হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহার সম্মুখের পরিকল্পনাও অভিনব। হ্যাভেল সাহেবের মতে—"It is chiefly interesting for the novelty of the design of the facade." এইরূপ পরিকল্পনার 'ডাঘোবা' অজন্তার গুহাবলীর মধ্যে দুইটি আছে।

দুনথাল-গুহা

একাদশ গুহাটি দ্বিতল। ইহার নাম 'দুনথাল' অর্থাৎ দুই-তলা গুহা। ইহার সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, ১০২ ফুট প্রস্থে ও ৪৫ ফুট গভীর পর্ব্বত কাটিয়া প্রস্তুত। এই প্রাঙ্গণের তিন পার্শ্বে পাহাড় কাটিয়া প্রাচীর প্রস্তুত হইয়াছে। গুহার মধ্যে দেবতার কক্ষে দক্ষিণ দিকে অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট এবং তাহার
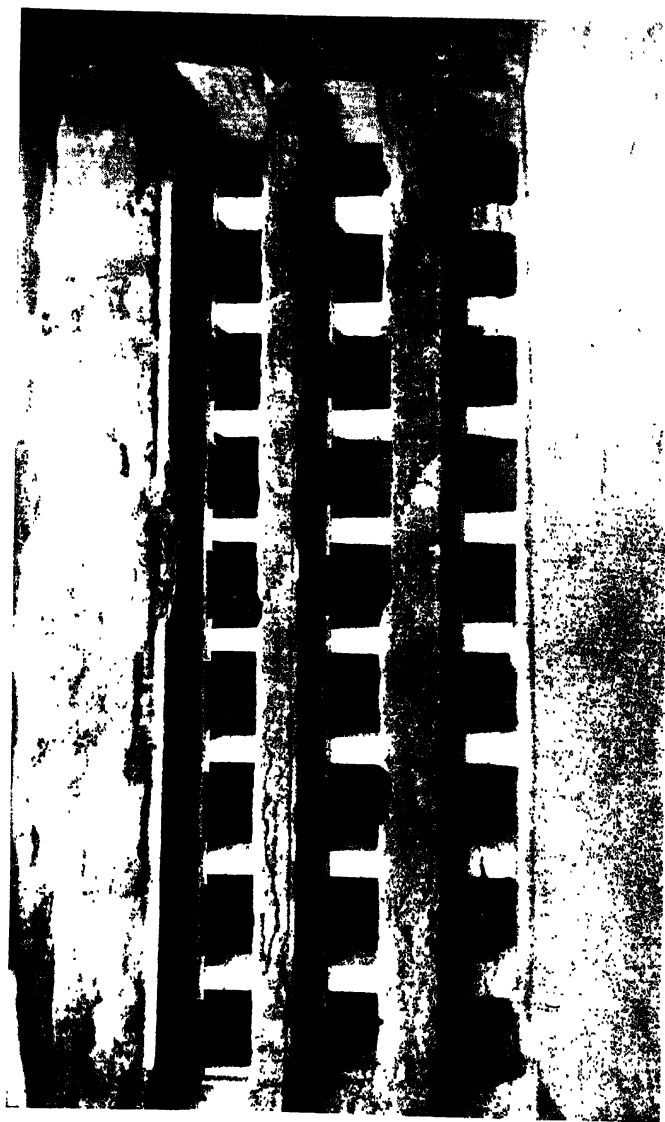
ত্রিতল (তিনথাল) বিহার - ইলোরার গুহা

দুই পার্শ্বে যোগাসনে দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি বিরাজিত; বামপার্শ্বে চারিহস্তযুক্ত সুন্দরী দেবীমূর্ত্তি। অন্য কক্ষে (shrines) অতিকায় বুদ্ধ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন।

দ্বাদশ গুহাটি যেন একখানি ত্রিতল প্রাসাদ, এই বিহারটির নাম 'তিনথাল' অর্থাৎ তিন তলা। সম্মুখ হইতে ত্রিতল বাটীর মত দেখায়। অভ্যন্তরে বড় বড় অলিন্দা, হল ও বহু স্তম্ভ রহিয়াছে। কতকগুলি দেবীমূর্ত্তির কারুকার্য্য উল্লেখযোগ্য; ইহাদের গঠন ও স্থাপত্য এমনই অপূর্ব্ব যে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ স্থপতিগণও ইহা ভাবিয়া স্তম্ভিত হন যে,—পাহাড় কাটিয়া তাহার গহ্বরমধ্যে প্রকাণ্ড তিনতলা এক সৌধের হল, বারাণ্ডা, দালান, কক্ষ ও সিঁড়ি কিরূপে নির্ম্মিত হইল! ধন্য সেই স্থপতি, ধন্য সেই শিল্পীদের সাধনা! ফার্গুসান বলিয়াছেন—"Of its class, this cave is one of the most important and interesting in India; nowhere else do we find a three-storeyed cave temple, adapted for worship rather than as a monastery, executed with the same consistency of design and the like magnificence so that there is a grandeur and propriety in its conception that it would be difficult to surpass in cave architecture." (H.I.E.A., Vol. I, p. 204).

ইলোরার গুহার প্রাচীর-চিত্রের (Fresco painting) খ্যাতিও দেশ-বিদেশে বিকীর্ণ। অজন্তার মত প্রাচীর-চিত্রের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও অল্পসংখ্যক যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। চিত্র- ও

ভাস্কর্য্য-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ একজন বিদেশী পণ্ডিতের মত এইরূপ অভিমতকে সমর্থন করিবে :—

"These brilliant paintings were not in the least meant for momentary pleasures, which is easily conceivable from the circumstances and the mode of painting adopted, but had a higher aim and were developed and ran side by side with religion. The artists who intended to hand down to posterity a suitable gallery of Art, had excavated and hollowed an entire range of hills, prepared gigantic halls within, tall and admirably decorated pillars, long corridors, remarkably well-ornamented ceilings, and were men of no ordinary talents." (I.S.R.M., Vol. V, p. 851)

ইলোরা গ্রামের সন্নিকটে উচ্চ পর্ব্বত-ভূমির উপর এই গুহাগুলি অবস্থিত। ইহার পথের পরিচয় দিতে হইলে তাহার

পথ

চতুষ্পার্শ্বের নগর ও পল্লীর উল্লেখ করা দরকার। নিজাম-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে ইলোরা গ্রাম। পূর্ব্বে ইলোরা একটি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সাধকদের প্রকৃষ্ট সাধন-স্থান এই ইলোরার সেই পূর্ব্ব-গৌরবের মধ্যে কেবল আছে গুহাগুলির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য। জি. আই. পি. রেলের মানমদ ষ্টেশন হইতে নিজাম ষ্টেট রেল লাইনের ৭২ মাইল গমন করিলে আউরঙ্গাবাদ ষ্টেশন। আউরঙ্গাবাদ ষ্টেশন হইতে .৬ মাইল মোটরে যাইয়া ইলোরার পর্ব্বতমালার পাদদেশে উপনীত হইতে হয়। পথে দৌলতাবাদের দুর্গম দুর্গ এবং রেওজা-পল্লীতে

মোগল-সম্রাট্ আউরঙ্গজেবের নিরাভরণ সৌধ-বিহীন তৃণাচ্ছাদিত সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত। আউরঙ্গাবাদের পর্ব্বতেও কতকগুলি গুহা আছে, সেগুলি পর্ব্বতবক্ষে কপোত-নীড়ের ন্যায় দেখায়। এই গুহাগুলির স্থাপত্য ও কারুকার্য্য ইলোরার গুহার ন্যায়ই সুদৃশ্য। আউরঙ্গাবাদেতে 'বিবি-কা মাকবারা' নামে যে স্মৃতি-সৌধ আছে, তাহা আউরঙ্গজেব বাদসার পত্নীর সমাধি। ইহা তাজের অনুকরণে নির্ম্মিত ও অতি মনোরম।

ইলোরায় যাতায়াতে ও অবস্থানে কোন কষ্ট নাই। কলিকাতা হইতে ৩২৲ রেল-ভাড়া, ৫৲ মোটর-ভাড়া ও ১৩৲ আহারাদির জন্য ব্যয় করিলেই ভারতের এই শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার ও কৃষ্টির সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হওয়া যায়। আরও দশ টাকা ব্যয় করিলে অজন্তা, নাসিক বোম্বাই ও পুণা দেখিয়া আসা যায়।

১০ম পৃষ্ঠার নক্সার পার্শ্বে লিখিত 'পশ্চিম' ও 'পূর্ব্ব' স্থানে যথাক্রমে 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' পড়িতে হইবে।

5—1804 B.

খাজুরাহোর দেউল

অজন্তা, ইলোরা, কোণারক, তাজ, ভুবনেশ্বর, মাদুরা, আবু, মহাবলিপুরম্, বাঘ ও তাঞ্জোর প্রভৃতির কারুকার্য্যের ও শিল্পের মহিমার সহিত খাজুরাহোর গরিমাও উল্লেখযোগ্য। মধ্যভারতের অন্তর্গত ছত্তরপুর ষ্টেটে এক অতি দুর্গম প্রদেশে খাজুরাহো অবস্থিত। দূর বনচ্ছায়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ইহা যেন এক প্রকার আত্মগোপন করিয়া আছে। খাজুরাহোর শিল্পৈশ্বর্য্য কিন্তু বিশ্বের শিল্পরসজ্ঞ সুধীগণের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। একবার যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন; এই কালজয়ী মনোহর পাষাণের উপরের কারুকার্য্য-দর্শনে দর্শকমাত্রেই বিস্মিত ও পুলকিত, তাহাদের প্রশংসায় সারা বিশ্ব মুখরিত হইয়াছে, সে উচ্ছ্বসিত স্তুতিগানে ভারতীয় কলার প্রত্যেক ভক্ত ও পূজারীর চিত্ত গৌরবে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়।

ভারতীয় শিল্পীরা পাষাণে যন্ত্রের আঁচড় দিয়া এবং তূলির রেখাপাত করিয়া ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র ও সমাজনীতির মর্ম্মকথা জনসাধারণের, বিশেষতঃ নিরক্ষরদের চিত্তমধ্যে এমন সহজ ও সরল ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন যে, শত-সহস্র বাক্য বা রচনার দ্বারা তাহা তেমন সহজে প্রকাশ করা যায় না। সেই জন্যই ফার্গুসান সাহেব ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবার সময়ে বলিয়াছেন যে পর্ব্বত- ও মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত লিপি ও ভাস্কর্য্যই

ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান ও সঠিক প্রামাণিক উপকরণ; সেই যুগের, সেই দেশের যে ছবি আমরা পাথরের উপর ক্ষোদিত দেখিতে পাই তাহা যেমন সত্য তেমনই অবিকৃত—

"My authorities, on the contrary, have been mainly the imperishable records in the rocks, or on sculptures and carvings, which necessarily represented at the time the faith and feelings of those who executed them, and which retain their original impress to this day. In such a country as India, the chisel of her sculptors are, so far as I can judge, immeasurably more to be trusted than the pens of her authors." (H.I.E.A., Preface, p. x).

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে যখন মধ্যভারতে চান্দেলা-বংশীয় ক্ষত্রিয়-রাজগণ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন, তখন খাজুরাহোতে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চান্দেলা-রাজ্য সেই সময়ে উত্তরে যমুনা নদী হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ধঙ্গ রাজার রাজত্বকালে খাজুরাহোর শৈব, বৈষ্ণব ও জৈন মন্দিরগুলির শিল্প-সৌন্দর্য্য চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-ভাব সে যুগে ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ—শৈব, বৈষ্ণব ও জৈন মন্দিরগুলি একই ধারায় গঠিত এবং এক জাতীয় শিল্পীই এই সমস্ত দেউল নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি ৯৫০ হইতে ১০৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ফার্গুসান সাহেব পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের ১৪১ পৃষ্ঠায় এবং কানিংহাম সাহেব তাঁহার পুস্তকের ৪১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কয়েকটি শিলালিপি হইতে মন্দির-নির্ম্মাণসময় ৯৫৪ হইতে ১০০২ খৃস্টাব্দ ঠিক করা যায়। খাজুরাহোতে এখন প্রধান প্রধান ত্রিশটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ জৈন-, এক-তৃতীয়াংশ বৈষ্ণব- এবং বাকীগুলি সমস্তই শৈব-মন্দির। শৈব-মন্দিরগুলির মধ্যে কন্দর্য্য-মহাদেবের, বিষ্ণু-দেউলের মধ্যে চতুর্ভুজ বা রামচন্দ্রের এবং জৈন-মন্দিরগুলির মধ্যে পার্শ্বনাথের মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। মন্দিরগুলির মধ্যেই প্রদক্ষিণ-পথ। মন্দিরগুলি নিশ্চয়ই এক সমদর্শী রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। চৌষট্টি যোগিনী ও 'ঘণ্টাই'-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খাজুরাহোর প্রাচীনতম যুগের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন।

১০২১ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ চান্দেলা-রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার তদানীন্তন রাজধানী কলিঞ্জর-নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহার দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঐতিহাসিক আবু রোহাণ আসিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন যে, খাজুরাহো জিজোতীয় রাজপুতগণের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সে দিন মামুদের প্রলয়ঙ্কর ধ্বংস- ও তাণ্ডব-লীলায় খাজুরাহো বিনষ্ট হয় নাই। সেই নিমিত্তই এই হাজার বৎসরের পুরাতন শিল্প-সম্ভার অটুট রহিয়াছে। খাজুরাহো দুর্গম স্থানে অবস্থিত বলিয়াই বিধর্ম্মীদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাহার পরেও যখন ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ চান্দেলা-রাজ্য বিধ্বস্ত করেন, তখনও খাজুরাহোর স্থাপত্য-কীর্ত্তি সেই ধ্বংসলীলার হাত হইতে রক্ষা পায়।

১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঙ্গিয়ারের পরিব্রাজক ইবেন বাটুট খাজুরাহোর শিল্পচাতুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার অজস্র প্রশংসা করেন। তখনও খাজুরাহো এক সুসমৃদ্ধ নগর ছিল। খাজুরাহোতে এক সময়ে বিখ্যাত বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ ছিল; ভ্রমণকারী সুপণ্ডিত হিউয়েন সাঙ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-কাহিনীতে এই স্থানের বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের ঐশ্বর্য্য শতমুখে বর্ণনা ও প্রশংসা করিয়াছেন—"He commented highly upon monasteries and temples in the country of Ch-ki-to, which has been identified as Jijhotia, of which Khajraho was the capital, and there are a number of huge edifices." B. H. S. তখন এই স্থানের রাজা জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মে বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি নানা দেশ হইতে পণ্ডিত এবং বিদ্যার্থী সংগ্রহ করিয়া এক বিরাট্ শিক্ষাকেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ঘণ্টাই-মন্দির

পূর্ব্ব-মণ্ডলের ঘণ্টাই-মন্দির ও উত্তর-মণ্ডলের চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির বৌদ্ধ-স্থাপত্যের নিদর্শন বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা। কিন্তু এই স্থানের প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলি হইতে কানিংহাম ও ফার্গুসান ইহা জৈন-মন্দিরের অংশ হইতে পারে, এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঘণ্টাই-মন্দিরের প্রান্তে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জেনারেল কানিংহাম ঘণ্টাই-মন্দির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়াছেন। এইখানে বুদ্ধদেবের একটি বিশাল মূর্ত্তি পাইয়াছেন, তাহার গাত্রে কয়েকটি হরফ ক্ষোদিত ছিল। তাহা দর্শনে কানিংহাম প্রথমে ইহা বৌদ্ধ-মন্দির বলিয়া ঘোষণা করেন।

মন্দিরের যে সামান্য অংশ এখন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার গঠন-পদ্ধতি এবং ভাস্কর্য্য অতুলনীয়। ফার্গুসান বলিয়াছেন, "It is as remarkable for its extreme elegance, even at Khajraho, as the other is for its rudeness."

এই দেউলের সম্মুখস্থ চাঁদনীর ছাদ কারুকার্য্যখচিত আটটি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত।

স্তম্ভগুলির সমুদয় গাত্রে শিকল-সহ বহু ঘণ্টা ক্ষোদিত হইয়াছে। সেইজন্য জনসাধারণ ইহার 'ঘণ্টাই-মন্দির' নামকরণ করিয়াছে। ঘণ্টাই-মন্দিরের শিল্পচাতুর্য্য কানিংহাম সাহেবকে মুগ্ধ করিয়াছিল।—"So dignified, so elegant with its slender bell-sculptured columns, that even at Khajraho, the temple builder's elysium, this structure known as GANTHAI occupies a *niche apart.*" থামগুলি ১৪'।৬" উচ্চ, এবং ১৫ ফুট অন্তর অবস্থিত, স্তম্ভের উপর ন্যস্ত সর্দ্দালে গরুড়ের উপর চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, এবং তাহার দুই পার্শ্বে উলঙ্গ দুইটি মানবমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। এরূপ মূর্ত্তি ও ভাস্কর্য্য জৈনদের হইতে পারে না।

চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির

চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ একটি উচ্চ টিলার উপর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। চৌষট্টিটি ছোট ছোট দেউলের মধ্যে চৌষট্টি যোগিনীর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যস্থলে ১০২ ফুট উচ্চ একটি বড় দেউল ছিল। এই দেউলে চণ্ডীদেবীর আবির্ভাব হইত। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরের সমাবেশ এক

পার্শ্বনাথ-মন্দির—জৈন-মন্দির—খাজুরাহো
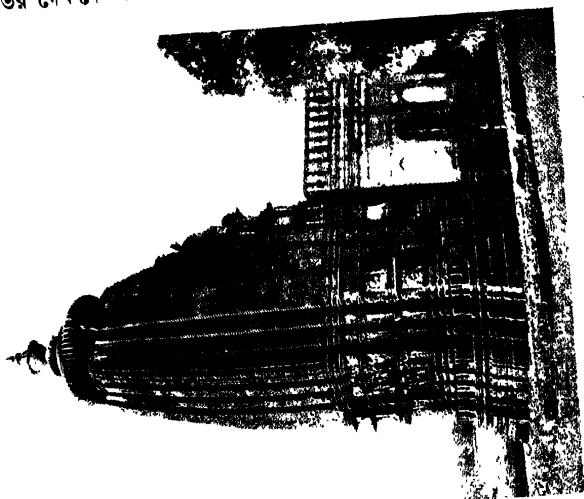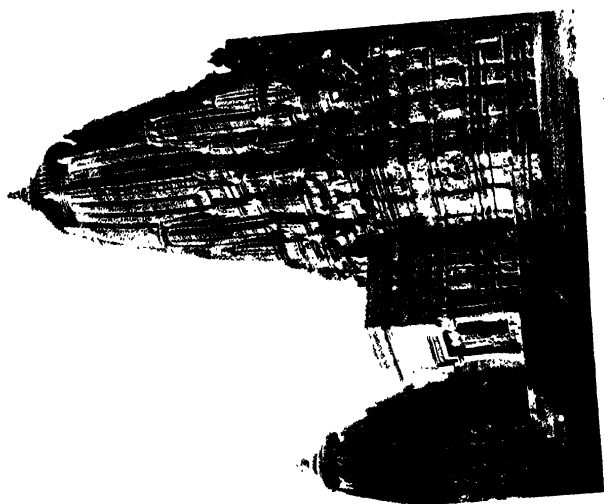
নেমিনাথের মন্দির—জৈন মন্দির—খাজুরাহো

অদ্ভুত পরিকল্পনা। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরের সন্ধান আরও তিন স্থানে পাওয়া গিয়াছে—পাটনা ষ্টেটে রাণীপুর ঝারিয়ালে, জব্বলপুরে ভেড়াঘাটে, ও কাশীতে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরের চিহ্ন আছে। রাণীপুর ঝরিয়ালে ও ভেড়াঘাটে—যোগিনী মন্দিরের বৃত্তাকার প্রাঙ্গণের যে প্রাচীর আছে তাহার মধ্যে ছোট ছোট ৬৪টি কুঠরী ছিল। তাহাদের অভ্যন্তরে যোগিনীদের বাহনসমেত মূর্ত্তিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত। এখানকার সম-চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চারি ধারে যোগিনীদের পৃথক পৃথক্ চৌষট্টিটি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি সংগ্রহালয়ে সুরক্ষিত আছে। তাহাদের গঠন-ভঙ্গিমা, বস্ত্র ও অলঙ্কারের ভাঁজ শিল্পীর দক্ষতা প্রমাণ করে। এই মন্দিরই খাজুরাহোর দেউল-মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্ব-প্রাচীন।

পার্শ্বনাথ-মন্দির

জৈন মন্দিরগুলির মধ্যে পার্শ্বনাথের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও বৃহৎ। ইহার পোস্তা লম্বায় ৬২ ফুট এবং প্রস্থে ৩১ ফুট। সম্মুখে দুইটি চারকোণা স্তম্ভের উপর একটি চাঁদনী রহিয়াছে। মণ্ডপের মধ্যের আয়তন ২২′×১৭′, চারি পার্শ্বে চারিটি থামের উপর স্তরে স্তরে ক্রমে ক্রমে সরু হইয়া উঠিয়াছে। দালানের পর দেউলের মূল প্রকোষ্ঠ, চারিদিকে প্রদক্ষিণ-পথ। এই প্রদক্ষিণ-পথটি দেবস্থানকে শীতল করিয়া রাখে। বাহিরের গাত্রে কারুকার্য্য প্রচুর, গড়নও যথেষ্ট, তিন সারি মূর্ত্তি। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জৈনগণ মন্দিরের আমূল সংস্কার করিয়া ইহা পুনরায় দখল করিয়াছে। এই মন্দির সম্ভবতঃ ৯৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কারণ মন্দিরের চৌকাঠের বাজুতে [illegible]
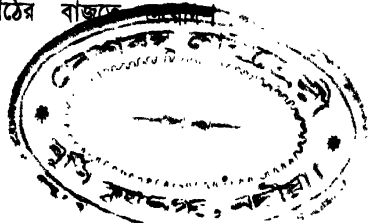
শতাব্দীর উৎকীর্ণ এক লিখন হইতে জানা যায় যে, ৯৫৫ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির-সংশ্লিষ্ট এক দান হইয়াছিল। তাহাতে বুঝা যায়, এই মন্দিরটি ৯৫৫ খৃষ্টাব্দেও ছিল. কিন্তু কাউজেন সাহেব (Mr. Cousen) এই চৌকাঠের শিলিতে গরুড়-পৃষ্ঠে বিষ্ণু-মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া এই চৌকাঠ কোন হিন্দু-মন্দির হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন।

আদিনাথের মন্দিরটিও জৈন-স্থাপত্যের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। ইহার সুষ্ঠু কারুকার্য্য, পোস্তায় তিন স্তরের অপূর্ব্ব খোদাই-কার্য্য দর্শককে বিস্মিত করে; ঠিক যেন এক একখানা পাথরের পাতার উপর চিকণের কর্ম্ম।

নেমিনাথের মন্দিরটি বৃহদায়তনের, এক চান্দেলা রাজার শিলালিপিতে ইহার নির্ম্মাণ-সময় ৯৫৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যের অতিকায় দ্বাদশহস্ত উচ্চ উলঙ্গ জিন নেমিনাথের মূর্ত্তি দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের পরম পূজ্য। স্যর জন মার্শেল বলিয়াছেন,— "With its graceful pillars and profusion of sculpture, this Jain cathedral is one of the most illuminating architectural documents to be found throughout the length and breadth of India." (I.S.R.M.)

খাজুরাহোর মন্দিরমধ্যে কন্দর্য্য-মহাদেবের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর। দূর হইতে মহাদেবের আবাস কৈলাস-শিখরের

কন্দর্য্য-মহাদেবের মন্দির

ন্যায়ই মনে হয়। মন্দিরের প্রধান চূড়াটি বেষ্টন করিয়া স্তরে স্তরে পর্ব্বত-শিখরের মত বহু মন্দিরাকৃতি চূড়া সজ্জিত রহিয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ বৃহৎ বৃহৎ

কন্দর্য্য-মহাদেবের মন্দিরের কারুকার্য্য

কন্দর্য্য-মহাদেবের মন্দির—খাজুরাহো
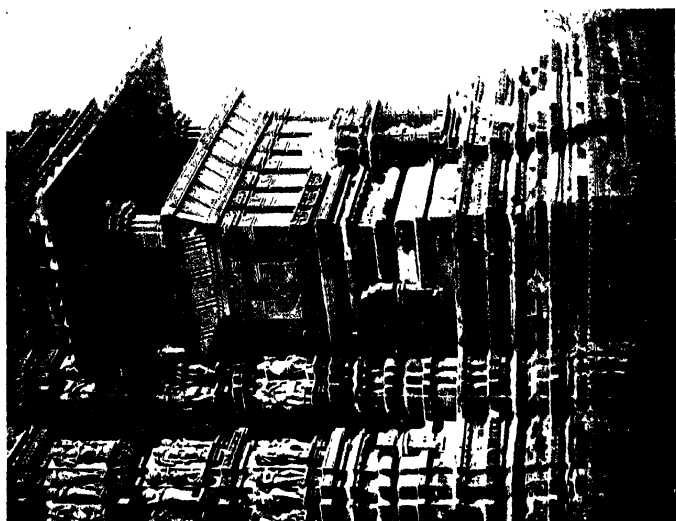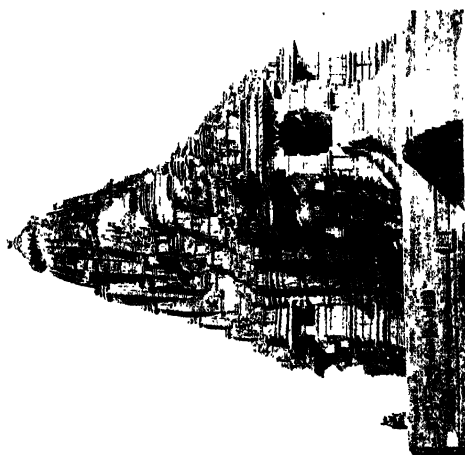
কারুকার্য্যমণ্ডিত এক এক খণ্ড প্রস্তর একটার উপর একটা অতি কৌশলে সুবিন্যস্ত হইয়াছে, কোন প্রকার চূণ বা অন্য মসলা ব্যবহৃত হয় নাই। সহস্র বৎসরের জলবায়ুর ও কালের পীড়নেও বিরাট্ পর্ব্বত-সদৃশ সু-উচ্চ মন্দির অম্লান ও অটুট রহিয়াছে। জগতের অন্যান্য শিল্প-সাধনা ও নিপুণতার মধ্যে কন্দর্য্য-মহাদেবের মন্দিরের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন—"Nothing could surpass the skill with which details of bewildering complexity are co-ordinated together in masses so as to form a perfectly balanced architectonic unity." (A.M.A., p. 207.)

প্রধান শিখরের শিরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত থালার উপর 'আমলক', তার উপর কলস স্থাপিত। মনে হয় যেন পর্ব্বত পরম আরাধ্য দেবের বারিপূর্ণ কলসী শীর্ষোপরি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। ভূমি হইতে শিখরটি ১১৬ ফুট এবং পোস্তা হইতে মন্দির ৮৮ ফুট উঁচু। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১০৯ ফুট ও প্রস্থে ৬০ ফুট। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির আকারের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। মিথুন-মূর্ত্তির প্রাচুর্য্য এই খানের মন্দিরেও পরিলক্ষিত হয়। প্রধান বিমানের গাত্র বেষ্টন করিয়া তারই আকৃতির অনুকরণে ছোট ছোট মন্দিরের চূড়া সজ্জিত রহিয়াছে। এমনই কমনীয়ভাবে, নানা পরিকল্পনায় এবং আলো- ও ছায়া-পাতের সুন্দর ব্যবস্থায় নির্ম্মিত, যে তাহার তুলনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য ফার্গুসান সাহেব বলিয়াছেন,—"Here it is managed with singular grace, giving great variety and play of light and shade, without unnecessarily breaking up the outline." (H.I.E.A., Vol. II, p. 143.)

6—1304B.

অর্দ্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ ও গর্ভমণ্ডপের সম্মুখের চাঁদনীর ছাদ অবশ্য নানা প্রকারের চূড়াবিশিষ্ট। ইহাদের গঠনও সুন্দর, ধাপে ধাপে পর পর তিনটি চূড়া উঠিয়াছে, যেন পর্ব্বতমালার সমাবেশ। প্রত্যেকটির শিরে আমলকী-ফল-সদৃশ কলস শোভিত। গোয়ালিয়ারের 'শাশবাহু' (পদ্মনাভ) ও 'তেলীকা মন্দির' ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পরিকল্পনায় নির্ম্মিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। খাজুরাহোর মন্দিরগুলি উড়িষ্যার মন্দিরের ছাঁচের হইলেও ইহার গঠন-পদ্ধতি ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নূতন ও নিজস্ব। ফার্গুসান সাহেব দেখাইয়াছেন—" * * * style though originated in the great temple at Bhuvaneswar, but it exhibits a complete development of that style of decoration which resulted in continued repetition of itself on a smaller scale to make up a complete whole." (H.I.E.A., p. 143).

মন্দিরের গাত্রের প্রতি ইঞ্চি স্থান কারুকার্য্যময়। কাগজ বা কাঠে এত সূক্ষ্ম ও ভাবব্যঞ্জক কারুকার্য্য সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মূর্ত্তিগুলির বিশেষতঃ নারীমূর্ত্তিগুলির নয়নের ভঙ্গিমা এমনই ভাব-প্রকাশক ও দেহের গঠন এমন সুঠাম যে তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকা যায় না।

যে সব মিথুন- ও নগ্ন-মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে তাহা শিল্প-জগতের এক অপূর্ব্ব এবং পরম চিত্তবিনোদক সৃষ্টি। কোণারক, ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দিরের গাত্রের মিথুনমূর্ত্তিগুলির ন্যায় এই মূর্ত্তিগুলি কামভাবযুক্ত নহে। প্রত্যেকটি মূর্ত্তির লীলায়িত ভঙ্গিমা, নানা ছাঁদের অঙ্গবিন্যাস, মনোরম ভাব, চক্ষুর ভাব-ব্যঞ্জনা, মুখের আকৃতি ও দেহের গঠন এমনই সুস্পষ্ট, সুশ্রী ও সুন্দর

যে ইহা দেখিলেই চিত্তে অপার আনন্দের উদয় হয়। কোন প্রকার কামভাবের বা লাস্যের গতি মনে উদিত হয় না।

খাজুরাহোর দেব-দেউল-গাত্রের আলঙ্কারিক মিথুন ও নগ্ন-স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া হ্যাভেল সাহেব বলিয়াছেন যে, ইহা দর্শনে চিত্তে কোন প্রকার কামভাবের উদয় ত হয়ই না, বরং ইহা এক অপূর্ব্ব শিল্প-সৃষ্টি বলিয়া দর্শনে মন পুলকে ভরিয়া উঠে। তিনি তাঁহার 'Ancient and Medieval Architecture' গ্রন্থের ২১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"The decorative sculpture on the temples at Khajuraho and elsewhere is sometimes grossly obscene, a fact which might mislead Europeans into forming a wrong judgment of the ethics of Hindu religion. * * * A *Vishnu* temple was a symbol of the active or dynamic principle of nature, and most of the external sculpture was popular art interpreting vulgur notions of the philosophic concept, not necessarily implying any moral depravity. The indecency was generally introduced on account of popular belief that it was a protection against the evil eye. There was never any obscenity in the sculpture of the sacred images worshipped within the *sunctum* and elsewhere. The imagers being often Bramhans, were much more highly cultured than the ordinary craftsmen and their art was the authorised interpretation of the esoteric philosophy of Hinduism."

খাজুরাহোর স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি অবলোকন করিয়া স্বর্গীয় রায় দীনেশ-চন্দ্র সেন বাহাদুর ১৯৩৪ সালের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায়

লিখিয়াছেন—এই সব মিথুন- ও নগ্ন-মূর্ত্তি দেখিলে মনে কোন প্রকার কুরুচি বা কামভাবের উদ্রেক হয় না, বরং মধুর-হাস্য-প্রদীপ্ত আনন্দ-হিল্লোল-মাতোয়ারা দম্পতীর মুখভাব দেখিলে পরম-প্রীতিলাভ হয়। মূর্ত্তিগুলি স্বর্গীয় ভাবের ও অপার সুষমার প্রতিরূপ বলিয়াই মনে হয়। শত শত মূর্ত্তি এমনই দক্ষতার সহিত নানা মনোহর ভঙ্গিমায় ক্ষোদিত হইয়াছে যে, শিল্পানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই এই সদানন্দ মনোরম শিল্পরাজ্যে বৎসরের পর বৎসর যাপন করিয়া মূর্ত্তিগুলির গঠন পরিদর্শন এবং ভাব উপলব্ধি করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিবেন না। "The smiling and jubilant faces of men and women enjoying themselves, have a grace and innocence which seem to verge on spiritual symbolism. Men and women are represented in hundreds of poses, so graceful and loving, that a scholar would be tempted to pass years in the fascinating field of study." (Cal. Rev., 1934.)

মুকুরহস্তে এক রমণী-মূর্ত্তির চক্ষুর অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা ও কটাক্ষ দর্শকের চিত্তে নির্ম্মল আনন্দ প্রদান করে। রমণী দর্পণে নিজের ঢল ঢল যৌবনের সুঠাম গঠন এবং কুচযুগল দেখিয়া নিজে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণদিকের আনত নয়নে তাহার সৌন্দর্য্যের গৌরব প্রকাশিত এবং বাম চক্ষুর রেখায় ও ভঙ্গিমায় সে দর্শককে তাহার মন-মাতান অপরূপ রূপ দেখিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। পাষাণের উপর যন্ত্রের আঁচড়ে শিল্পীর কি অপূর্ব্ব মনোভাব-প্রকাশের শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে! এই মূর্ত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে সত্যই হৃদয় কোন

এক অপার্থিব সুন্দর আনন্দময় রাজ্যে লীন হইয়া সেই অনন্ত লীলাময়ের চরণতলে উপনীত হয়। নারীর দেহের কমনীয়তা, সৌন্দর্য্য, সুঠাম গঠন. নানা ভঙ্গিমা, নৃত্যের তাল ও ছন্দের ভাবপ্রকাশের এমন বহুল দৃষ্টান্ত কাব্যেও বিরল। পাষাণময়ী মূর্ত্তি যন্ত্রের প্রতি আঁচড় ও রেখায় অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ করিতেছে। এক এক প্রস্তর-মূর্ত্তি জীবন্ত নারীর মত, পাথরের চক্ষু হইতে যেন ইঙ্গিতের দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে।

জেনারেল কানিংহাম সাহেব মন্দিরের যে অপূর্ব্ব বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে ৮৭২টি মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। প্রত্যেকটি মূর্ত্তি ২½ হইতে · (তিন) ফুট মাপের। কানিংহাম সাহেব মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে বলেন—"They are mixed up with a profusion of veritable forms and conventional details which defy description." (A. S. R., Vol. II, p. 431). প্রত্যেক মূর্ত্তির ভঙ্গিমা, গঠন-প্রণালী ও ভাব-ব্যঞ্জনার বৈশিষ্ট্য দেখিলে দর্শকমাত্রেরই মন মুগ্ধ হয়। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, সূর্য্য, দশভুজা, নরসিংহ, দশ অবতার (মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, হলধর, বুদ্ধ ও কল্কী) আদি প্রত্যেক মূর্ত্তিতেই দেবভাব ও দৈবশক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গর্ভগৃহ পরিবেষ্টন করিয়া অষ্টদিক্‌পাল ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋ´তি, বায়ু, কুবের ও ঈশান বিরাজিত। প্রসারিত-দশভুজ বিশাল চামুণ্ডা-মূর্ত্তি, ইন্দ্রাণী, মহেশ্বরী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তির প্রদীপ্ত নয়ন-ভঙ্গিমায় দেবী-শক্তির সজীব প্রভা দর্শকের দেহ ও মনে যুগপৎ সংক্রামিত হইয়া তাহাকে ভক্তি-

রসাপ্লুত করিয়া থাকে। ইহাই শিল্পীর সৃষ্টি-শক্তির ও সাধনার পরিচায়ক। সেইজন্যই ভারতের শিল্পীদের একাধারে স্রষ্টা ও ধর্ম্মপ্রচারক বলা হইয়া থাকে।

কেবল দেব, যক্ষ ও মানবমূর্ত্তি-সৃষ্টিতেই যে শিল্পীরা কৃতী ছিলেন তাহা নয়, পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু ও পত্র-পুষ্প-ক্ষোদনেও তাঁহারা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কার্নিসে, দরজায়, চৌকাঠে, ভিত্তি-তলে ও পোস্তায়—হস্তীর দল, উষ্ট্রের সারি, বৃষের পাল, অশ্বারোহি-বাহিনী বা বকের সারির খোদাই যেমন সুস্পষ্ট তেমনই সজীব। এইগুলি শিল্পীর প্রাণিতত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে। ইহাতে সে যুগের সম্পদ্-ও ঐশ্বর্য্য-প্রিয়তাও প্রকাশ পায়।

মন্দিরের দ্বারের চৌকাঠের উপর দুই ইঞ্চি পরিমাণের অসংখ্য যোদ্ধার মূর্ত্তি এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত নারায়ণ-মূর্ত্তিগুলি যেমন সূক্ষ্ম তেমনই ভাবোদ্দীপক। এইগুলি শিল্পীর অধ্যবসায় ও অঙ্গুলী-সঞ্চালনের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করে।

মন্দিরের প্রথম প্রবেশ-দ্বারটি মকর-তোরণ। তাহার গঠন-পদ্ধতি, স্থাপত্য, কারুকার্য্য অতি সূক্ষ্ম, নিপুণ ও মনোরম। মণ্ডপ তিনটির ছাদের তলার সজ্জা ও কারুকার্য্য এমনই মনোহর যে, স্বচক্ষে না দেখিলে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধ হয় না। পদ্মপত্রের ন্যায় পাথর কাটিয়-ছাঁটিয়া থাকে থাকে পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ স্তরে কারুকার্য্য-মণ্ডিত করিয়া ছাদের তলা (সিলিং) ক্ষোদিত হইয়াছে। পাথরের slab বা টুকরা কাটিয়া যে কাজ করা হইয়াছে তাহা ঠিক যেন পীচ্‌বোর্ড বা তক্তা কাটিয়া কাজ করার মত। যেন এক একটি জাপানী কাগজের

ফুলের তোড়া। কি অপূর্ব্ব কৌশল, কি অপার ধৈর্য্য, কি বিরাট্ সাধনা, সেই যুগের শিল্পীদের ছিল! ইহা বর্ত্তমান যুগের যন্ত্র-শিল্পীদের বিস্মিত করিয়া দেয়।

ছাদের ভিতর মধ্যস্থলে যে পদ্মপুষ্পগুচ্ছ-সদৃশ ক্ষোদিত পাথরের দূল বিলম্বিত, তাহার মাঝখান হইতে এক অপ্সরা স্বর্গ হইতে অবতরণের ভঙ্গিমায় উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মহামণ্ডপের ছাদ চারিটি অষ্টপলযুক্ত মোটা স্তম্ভের উপর বিন্যস্ত। স্তম্ভের শিরোদেশে নানা পুষ্পগুচ্ছ ও কিম্ভূতাকার কীর্ত্তিকেয়-মুখদ্বারা শোভিত। তাহার স্কন্ধ উপরে স্থাপিত, আটটি পরীর মূর্ত্তি ছাদের চারিটি পাড় মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আবার চারি কোণে চারিটি উড্ডীয়মান অপ্সরা ছাদের অবলম্বনস্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে শিল্পীর সুষ্ঠু পরিকল্পনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই নারীশক্তির মহিমা বিকাশ পায়। এই সকল মূর্ত্তি সকল যুগের, সকল জাতির শিল্পীকে নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করে। খাজুরাহোর ভারতীয়-শিল্পীদের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-শক্তির মহিমা এবং খোদাই-কার্য্য-প্রতিভার জয়গান মনীষী ও শিল্প-বিশেষজ্ঞ স্যর জন মার্শাল এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—
"Khajraho temples are the most delightful architectural demonstration lesson in the world."

শৈবমন্দির-মধ্যে কন্দর্য্য-মহাদেবের মন্দির যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব-মন্দির মধ্যে তেমনই রামচন্দ্রের মন্দিরটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই মন্দির-গাত্রে ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখণ্ড শিলালিপি প্রোথিত রহিয়াছে। শিলালিপিটি মন্দিরের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। বৈষ্ণব-ধারায়

রামচন্দ্র-মন্দির

নির্ম্মিত মন্দিরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ খাজুরাহোতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরা যেমন ললাটে সরল রেখা টানিয়া তিলক ধারণ করে, তেমন রামচন্দ্র-মন্দিরের চূড়া সরল রেখার মত একটির পর একটি উঠিয়াছে। সমস্তটা যেন সুমেরু পর্ব্বতের অনুকরণে নির্ম্মিত। শিখরগুলির বাহিরে যেমন কারুকার্য্য ভিতরের কার্যেও তেমনই শিল্পীর দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। শিখরগুলি যেমন দক্ষতার সহিত কর্ত্তিত ও ক্ষোদিত হইয়াছে তেমনই আশ্চর্য্যভাবে বিনা মসলায় বসান রহিয়াছে। শিখরগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহার উপর খিলানের চাবির ন্যায় আমলকী-ফল-সদৃশ শিরাযুক্ত একটি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ইহা শিখরগুলিকে একত্র করিয়া রাখিবার শক্তি ধরে এবং মন্দিরের কলস-স্বরূপ দেখায়।

চতুর্ভুজ মন্দিরটি অতি উচ্চ, প্রায় দ্বাদশ ফুট উচ্চ পোস্তার উপর বিস্তৃত চত্বরের মধ্যে নির্ম্মিত। ইহার চারিকোণে চারিটি ছোট ছোট মন্দির নির্ম্মিত রহিয়াছে। শিল্পী এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছে, বিষ্ণুর পঞ্চরত্ন-কণ্ঠহারের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম বা চুনী, পান্না, নীলা, হীরা, মুক্তা) ন্যায় পঞ্চচূড়ার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে।

খাজুরাহোর সৌভাগ্যরবি যখন প্রখর ছিল তখন তাহার নগর-তোরণের উভয়পার্শ্বে দুইটি সুবর্ণ-খর্জ্জুর-বৃক্ষ শোভা পাইত। বাংলাদেশে যেমন প্রত্যেক শুভকার্য্যে মাঙ্গলিক-চিহ্নস্বরূপ কলাগাছ রোপিত হয়, তেমনই খাজুরাহোতে উর্ব্বরা জমির নিদর্শন খেজুর-গাছ প্রত্যেক মাঙ্গলিক কার্য্যে গৃহদ্বারে প্রোথিত হইত। দশম শতাব্দীর চারণ চাঁদ-কবি খাজুরাহোর চারি পার্শ্বের পল্লীতে খেজুরগাছের প্রাচুর্য্য দেখিয়া এই মহানগরীর

উর্ব্বরাশক্তি এবং ঐশ্বর্য্যের জয়গান করিয়া গিয়াছেন। চাঁদ-কবি ভ্রমণকারীর চির উপকারী বন্ধু খেজুরবৃক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া স্থানটিকে 'খাজুরাপুরা' বা 'খার্জ্জিণপুরা' নাম দিয়া গান রচনা করিয়াছিলেন। শিব উর্ব্বরতার প্রতীক, সেই জন্যই কন্দর্য্য-মহাদেবের এত সম্মান। পাষাণের সুদৃঢ় বপু কাটিয়া-ছাঁটিয়া নানা পৌরাণিক মাঙ্গলিক দেবদেবীর মূর্ত্তি মহাদেবের মন্দিরের বহিরঙ্গেই খোদাই করা রহিয়াছে।

একাদশ শতাব্দীতে খাজুরাহোর কয়েকটি মন্দিরে নাট-মণ্ডপ সংযোজিত হইয়াছিল। এইখানে সে যুগের সমাজে প্রচলিত নৃত্য, গীত ও অভিনয় হইত। রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতায় এইখানে তদানীন্তন সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যের বিকাশ হইয়াছিল। মন্দির ও মঠগুলি কেন্দ্র করিয়া তখনকার দিনের বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিত। কীর্ত্তিবর্ম্মার সময়ে মন্দিরগুলি নীতি ও ধর্ম্মচর্য্যার বিদ্যালয়-রূপে ব্যবহৃত হইত, বেদাধ্যয়ন তাহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। শত শত শিক্ষক ও ছাত্র এই সমস্ত মণ্ডপে সমবেত হইয়া ইহাদিগকে পাঠাভ্যাসে মুখরিত করিয়া তুলিত।

একটি বৃহদাকার বরাহ-মূর্ত্তি এক খণ্ড পাথর হইতে ক্ষোদিত হইয়া চারিটি স্তম্ভযুক্ত চাঁদনীর মধ্যে অবস্থিত আছে। তাঞ্জোরের বৃষ অপেক্ষা বরাহটি ছোট কিন্তু ইহার গঠনভঙ্গিমা বেশ চিত্তাকর্ষক। বরাহের সমস্ত গাত্রে ২" চতুষ্কোণ বিটের মধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হস্তে নারায়ণ-মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। মুখ, চোখ, হস্ত, পদ এমন কি অঙ্গুলীগুলিও অতি সূক্ষ্ম ও সুস্পষ্ট। ইহার সমস্ত অঙ্গের কারুকার্য্য বড়ই অদ্ভুত।

বরাহমূর্ত্তি
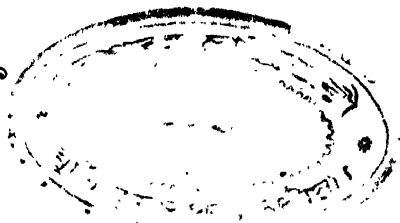
খাজুরাহোর ত্রিশটি মন্দিরই হিন্দু ও জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন। বৌদ্ধ বিহার বা মঠের কোন নিদর্শন নাই। হিউয়েন-সাঙ খাজুরাহোর যে দশটি বিহার বা মঠের বর্ণনা করিয়াছেন তাহারই ভাস্কর্য্যের নিদর্শন-স্বরূপ কেবল একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়। কারণ এই মূর্ত্তির গঠনভঙ্গিমা সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর মতন এবং প্রস্তরের বয়স হইতেও ইহা অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বের বলিয়া মনে হয়। খাজুরাহোর সন্নিকটে যে উচ্চ টিলা দেখা যায় তাহাই সেই বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ এইরূপই অনুমান হয়।

জি. আই. পি. রেলপথের ঝাঁসী-মাণিকপুর শাখার উপর হরপালপুর অথবা মহাব্বা ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া ছত্তরপুর গমন করিতে হয়। হরপালপুর হইতে নওগাঁ বার মাইল। নওগাঁ অতি মনোরম ক্ষুদ্র নগর, ইহা বুন্দেলখণ্ড এলেকার এজেণ্ট সাহেবের প্রধান বাসস্থান ও দপ্তরখানা। হরপালপুর হইতে মোটরবাস-যোগে নওগাঁ হইয়া চব্বিশ মাইল গেলে ছত্তরপুরে উপনীত হওয়া যায়। হরপালপুর ও নওগাঁর মধ্যের রাজপথ পরিচ্ছন্ন ও সুশ্রী। নওগাঁয়ে ফৌজদারদের সামরিক কৌশল শিক্ষাদানের বিখ্যাত 'কিচনার কলেজ'। ছত্তরপুরে ডাক-বাঙ্গলায় রাত্রিযাপন করিয়া. পরদিন পান্না যাইবার বাস সার্ভিসে একুশ মাইল আসিয়া, 'বোমভীটা' তহসীলে বাস পরিবর্ত্তন করিয়া, রাজনগরগামী মোটর গাড়ীতে সাত মাইল গমন করিলে খাজুরাহোতে পৌঁছান যায়। রেল ষ্টেশন হইতে মোট ৬৪ মাইল রাস্তা আসিতে তিনবার মোটরবাস বদলী করিতে হয় এবং সময়-মত বাস-চলাচলের

পথ

ব্যবস্থা না থাকায় দুই দিন লাগিয়া যায়। খাজুরাহোতে ছত্তরপুরের রাজার অতিথি-আবাস আছে।

ছত্তরপুরে অবস্থানকালে রাজপ্রাসাদ, রাজা ও রাণীদের মকবারা বা স্মৃতিমন্দির, কলেজ, হাসপাতাল, বড় বড় সরোবর এবং ঘাটের চাতালের উপর অবস্থিত প্রস্তর ফলকে ক্ষোদিত নবগ্রহ-মণ্ডল দর্শনীয়।

ভেড়াঘাট—হরপার্ব্বতী মন্দির

জব্বলপুর সহর হইতে ১৩ মাইল দূরে পুণ্যতোয়া স্বচ্ছসলিলা নর্ম্মদার সহিত আর একটি জলধারা (সরস্বতী নামে অভিহিত) মিলিত হইয়াছে। এই দুইটি নদীর সঙ্গমে ভেড়াঘাট অবস্থিত। হিন্দুদের নিকট প্রত্যেক সঙ্গমস্থলই পবিত্র। ভেড়াঘাট পর্ব্বতের একদিকে শ্বেতমর্ম্মর-পাহাড়ের মধ্য দিয়া খরস্রোতা নর্ম্মদা প্রবাহিত, এবং অপরদিকে নর্ম্মদা-প্রপাতের গর্জ্জনে স্থানটি মুখরিত, চারি দিকে দিগন্ত ব্যাপিয়া পাহাড়ের ঢেউ চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য্যের ক্রোড়ে, মনোরম নিরালা স্থানে হরপার্ব্বতী-মন্দিরটি অবস্থিত। নর্ম্মদার কূলে সেই চিরখ্যাত 'মার্বেল রকে'র (মর্ম্মর-পাহাড়ের) বপু ভেদ করিয়া একশত আটাশটি শ্বেত-প্রস্তর-সোপান নদীকূল হইতে পাহাড়ের উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে আর একশত সিঁড়ি উত্তীর্ণ হইলে পর্ব্বতের শিরোদেশে উপনীত হওয়া যায়। এইখানেই সুরম্য শুভ্র সুদৃশ্য হরপার্ব্বতীর মন্দির অবস্থিত।

স্থানটি যেমন মনোরম, মন্দিরটির স্থাপত্য-কৌশল তেমনি অপূর্ব্ব, পরিকল্পনা নূতন এবং গঠনও সুদৃশ্য। বর্ত্তমান মন্দিরটি বেশী দিনের না হইলেও অতি-প্রাচীন যুগের স্মৃতি ও শিল্প-ধারা বক্ষে লইয়া দণ্ডায়মান আছে। অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে গুপ্তযুগে এই স্থানে যে একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল, তাহা বর্ত্তমান

মন্দিরের ভিত্তি ও পোস্তা এবং অভ্যন্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি পরিদর্শন করিলে উপলব্ধি করা যায়। এই মন্দিরটির পরিকল্পনা নানা বিশিষ্টতায় পূর্ণ। মন্দিরটির সম্মুখে একটি নাটমন্দির অবস্থিত। গর্ভমন্দিরের মধ্যে প্রমাণ-আকারের প্রস্তরের বৃষোপরি সুমনোহর হরের ক্রোড়ে সুন্দরী পার্ব্বতী বিরাজিত। মূর্ত্তিটির গঠন ও মুখভঙ্গিমা এমনই সুদৃশ্য যে তদ্দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন। এই মূর্ত্তিটির বামে মহাদেবের ও দক্ষিণে এক দেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। তাহাদের ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা হইতে মূর্ত্তিগুলির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।

মূল মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করিয়া বৃত্তাকারে চুরাশিটি ফোকরযুক্ত স্তম্ভদ্বারা বিভক্ত বিহারের ন্যায় দালান অবস্থিত। এই দালানই হর-পার্ব্বতী-মন্দিরের পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। বৃত্তাকার দালানটির ভিতরের প্রাঙ্গণের ব্যাস ১১৬′ ২″ এবং বহির্ভাগের দেওয়ালের ব্যাস ১৩০′ ৯″, অর্থাৎ দালানের প্রাচীর ও মেঝের পরিমাণ ১৪′ ৭″ ÷ ২ = ৭′ ৩½″। এই বৃত্তাকার দালানটি চুরাশিটি ফোকর বা কুঠরিতে (cell) বিভক্ত। প্রত্যেকটি ফোকর ঠিক গুহারই মতন, পশ্চাতে রুদ্ধ প্রাচীর এবং পার্শ্বে চতুষ্কোণ এক একটি স্তম্ভদ্বারা বিভক্ত। ফোকরগুলি আয়তনে ৪′ ৯″ প্রশস্ত, ৫′ ৩½″ উচ্চ; মেঝেটি জমি হইতে মাত্র ৮½″ উচ্চে অবস্থিত। পশ্চাতের প্রাচীর ২′ ৭½″ মোটা সুদৃঢ় প্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত। স্তম্ভের উপর ৯″ মোটা প্রস্তরের সর্দ্দাল, তদুপরি কুঠরিগুলির ছাদ নির্ম্মিত। শিল্পীর কৌশলে জল ও বায়ুর পীড়নের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া এগুলি প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী যাবৎ দণ্ডায়মান আছে।

চুরাশিটি ফোকরের মধ্যে তিনটি প্রবেশ-পথরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পশ্চিম দিকে দুইটি প্রবেশ-পথ এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে আর একটি। বাকী একাশিটি মঠে মূর্ত্তি বসাইবার জন্য বেদী বা আসন প্রস্তুত রহিয়াছে। এই বেদীগুলি ৩′ ৫″ লম্বা, ১′ ৮″ চওড়া ও এক ফুট উচ্চ। স্তম্ভগুলির আয়তন ১০½″ সম-চতুষ্কোণ এবং সেগুলি ৩′ ৭¼″ অন্তর অবস্থিত। এই বৃত্তাকার দালানটি নিশ্চয় মূল মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই মূল মন্দিরের আকার জানা না থাকিলেও ইহা যেন তাহারই সভামণ্ডপ বলিয়া মনে হয়।

প্রতি ফোকরে যে সমস্ত মূর্ত্তি স্থাপিত আছে তাহার অধিকাংশ বসা অবস্থায়, কয়েকটি মাত্র দণ্ডায়মান-ভাবে নির্ম্মিত। বসা মূর্ত্তিগুলি ৪′ ২″ উচ্চ এবং ২′ ৬″ চওড়া। সবগুলিই দেবীমূর্ত্তি, অধিকাংশই চতুর্ভুজা, কেবল একটি শিব ও একটি গণেশের মূর্ত্তিই দেবমূর্ত্তি। দেবীমূর্ত্তিগুলির গঠন-ভঙ্গিমা, বিশেষতঃ কটিদেশের ও বক্ষের গঠন, যেমন মনোরম তেমনই সুঠাম। ইহাদের অলঙ্কার ও বসনের খোদাই-কার্য্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম। প্রত্যেক মূর্ত্তির বলয়, কঙ্কণ, কণ্ঠহার, হাঁসুলি, সাতনর, মুক্তাদাম, তাবিজ, অনন্ত, কাণবালা, মেখলা, কোমরপট্টি, চন্দ্রহার, মল, চরণপদ্ম, পাঁজর, সিঁথি, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি সে যুগের নারীর অলঙ্কারপ্রিয়তা ও শিল্পীর দক্ষতা প্রকাশ করিতেছে। প্রত্যেকটি দেবীর মুকুট বা শিরোভূষণের পরিকল্পনা ভিন্ন ভিন্ন রূপ। শিল্পীর বাটালির ঘায়ে বস্ত্রের ভাঁজ ও পাড় অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই যুগের সমাজের, সভ্যতা ও পরিচ্ছদ-পরিধানের রীতি এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়াছে।

চৌষট্টি যোগিনী ও হরপার্ব্বতী-মন্দির—ভেড়াঘাট, জব্বলপুর

দেবী-মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অষ্ট শক্তির আটটি মূর্ত্তি ; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর তিনটি মূর্ত্তি, তাণ্ডব-নৃত্যরতা কালীমূর্ত্তি চারিটি, আর চৌষট্টি যোগিনীর মধ্যে যোগিনীমূর্ত্তি সাতান্নটি দেখিতে পাওয়া যায়। ৭টি যোগিনীমূর্ত্তি বিনষ্ট হওয়াতে তাহাদের কেবল শূন্য আসন পড়িয়া রহিয়াছে।

চৌষট্টি যোগিনী

জেনারেল কানিংহাম সাহেব এই মন্দিরকে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (A.S.I., Vol. IX, p. 63)। যোগিনীরা মহাশক্তি কালী বা দুর্গার অনুচরী। রণোন্মত্ত রাজা বা বীরগণ মহাশক্তির আরাধনা করিয়া জয়যুক্ত হইলে শক্তির মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া তাঁহার অনুচরীদেরও মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করিতেন, কেহ কেহ চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরও স্থাপনা করিতেন। খাজুরাহোতে এই প্রকার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রাণীপুর ঝারিয়ালে ৬৫টি কুঠরিযুক্ত মন্দিরে ৬৪ যোগিনী বিরাজিত রহিয়াছে, বারাণসীতে চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট এখনও প্রসিদ্ধ। 'রাজতরঙ্গিণী'-গ্রন্থে এই যোগিনীগণ নিম্ন-স্তরের দেবীরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহাতে ডাকিনী-যোগিনীদের বীভৎস রূপ এবং ভীতিপ্রদ রক্তপান ও মাংসাহারের বর্ণনা আছে ; 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' গ্রন্থে তাহারা সমরক্ষেত্রে নরমুণ্ডের খুলিকে শোণিত পান করিবার জন্য পানপাত্র-রূপে ব্যবহার করিত বলিয়া লিখিত আছে ; 'রুদ্র-উপনিষদে' বর্ণিত আছে যে, জলন্ধরকে নিধন করিয়া শিব ধ্যানমগ্নচিত্তে যোগিনীদের আহ্বান করিলেন, সেই সময়ে যোগিনীরা আবির্ভূত হইলে শিব তাহাদিগকে সেই বিপুলকায় দৈত্যের রক্তপান করিয়া

মাংস ভক্ষণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন ঋক্ষী, মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও মহেন্দ্রা এই ছয়জন যোগিনী বিকট উল্লাসধ্বনি করিয়া রক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করিতে ধাবিত হয়।

তবে এই মন্দিরে যে সমস্ত যোগিনী-মূর্ত্তি আছে তাহা তেমন ভয়াবহ, বিকট-দর্শনা, আরক্তলোচনা, ডাকিনী-যোগিনী-মূর্ত্তি নহে। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অনেকগুলি অতি সুশ্রী ও সুঠাম, কেবল একটিমাত্র মূর্ত্তি, অতিভীষণা কঙ্কালসারা কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভেড়াঘাটের এই মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশের আসনতলে অতি প্রাচীন দেবনাগরী অক্ষরে নাম ক্ষোদিত আছে। ইহার একটি বিস্তৃত তালিকা কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন, তাহাই এইস্থানে প্রদত্ত হইল। মূর্ত্তির আসনতলে যে সব অক্ষর ক্ষোদিত আছে তাহার পাঠোদ্ধারের সহিত এই তালিকার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। প্রত্যেকটি মূর্ত্তির তলে দেবীর নাম ক্ষোদিত আছে, তাহা পাঠ করিলে মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্ষোদিত লিপির পাঠ	বাহন	প্রকার	মন্তব্য
১। শ্রীগণেশ	ইঁদুর	বসা অবস্থা	দেবমূর্ত্তি
২। শ্রীছত্র সম্বর	হরিণ	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৩। শ্রীঅজিতা	সিংহ	„	„
৪। শ্রীচণ্ডিকা	শিববক্ষঃ	দণ্ডায়মানা কালী	কঙ্কালসারা ভয়ঙ্করা
৫। শ্রীমানন্দা	পদ্ম	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী আনন্দ-দায়িনী

ক্ষোদিত লিপির পাঠ	বাহন	প্রকার	মন্তব্য
৬। শ্রীকামদা	যোনী (দুই ব্যক্তি পূজা করিতেছে)	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী সর্ব্বকাম-সিদ্ধি
৭। শ্রীব্রহ্মাণী	হংস	"	শক্তি
৮। শ্রীমহেশ্বরী	বৃষ	"	"
৯। শ্রীতঙ্করী	ভীষণ সিংহী	দশভুজা, সিংহোপরি দণ্ডায়মানা	দুর্গা—অসি ও কুঠার হস্তে
১০। শ্রীজয়ানী	বিড়াল-জাতীয় (Feline animal)	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
১১। শ্রীপদ্মহংসা	পদ্মপুষ্প	"	"
১২। শ্রীরণজিরা	হস্তী	"	"
১৩। —	নাগিনী	"	"
১৪। শ্রীহংসিনী	মরাল	"	"
১৫। —	—	ষোড়শভুজ দেবমূর্ত্তি	ত্রিনয়ন শিব
১৬। শ্রীঈশ্বরী	বৃষ	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
১৭। শ্রীস্থানী	শৈলশিখর	"	যোগিনী অচল
১৮। শ্রীইন্দ্রজালী	ঐরাবত হস্তী	"	যোগিনী
১৯। (ভগ্ন)	বৃষকঙ্কাল	"	"
২০। —	—	—	"
২১। শ্রীঠাকিনী	উষ্ট্র	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	"
২২। শ্রীধনেত্রী	সাষ্টাঙ্গ-প্রণত মানব	"	"
২৩। —	—	—	—
২৪। শ্রীউত্তলা	মৃগ (antelope)	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী

ক্ষোদিত লিপির পাঠ	বাহন	প্রকার	মন্তব্য
২৫। শ্রীলম্পটা	প্রণত মানব	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
২৬। শ্রীউহা	ময়ূর	"	সরস্বতী নদী
২৭। শ্রীতসমদা (Tasamada)	শূকর	"	যোগিনী
২৮। শ্রীগান্ধারী	ঘোটক	পক্ষযুক্তা স্ত্রীমূর্ত্তি	"
২৯। শ্রীজাহ্নবী	মকর	দ্বিভুজা	গঙ্গানদী
৩০। শ্রীডাকিনী	নরকঙ্কাল	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৩১। শ্রীবন্ধনী	বন্দী মানব	"	"
৩২। শ্রীদর্পহারী	পশুরাজ	সিংহমস্তকোপরি	"
৩৩। শ্রীবৈষ্ণবী	গরুড়	গরুড়োপরি	শক্তি
৩৪। শ্রীভঙ্গিনী	"	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৩৫। শ্রীবিঙ্খিনী	কুম্ভীর	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৩৬। শ্রীশাকিনী	শকুনী	"	"
৩৭। শ্রীঘণ্টালী	ঘণ্টা	"	"
৩৮। শ্রীতত্তারি	হস্তী	হস্তীর মস্তকোপরি	"
৩৯। —	—	নৃত্যরতা	"
৪০। শ্রীগঙ্গিনী	বৃষ	—	"
৪১। শ্রীভীষণী	আরক্তলোচন দানব	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	"
৪২। শ্রীসতানুসম্বর	হরিণ	"	"
৪৩। শ্রীগহনী	ভেড়া	"	"
৪৪। —	—	নর্ত্তকীমূর্ত্তি	কালী
৪৫। শ্রীহহরা	সজ্জিত অশ্ব	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৪৬। শ্রীবরাহী	বরাহ	বরাহ-মস্তকসহ	শক্তি
৪৭। শ্রীনলিনী	বৃষ	গরুড়-মস্তকসহ	যোগিনী

৪৮। এখানে প্রবেশ-দ্বারের ফোকর দক্ষিণ-পূর্ব্ব

ক্ষোদিত লিপির পাঠ	বাহন	প্রকার	মন্তব্য
৪৯। —	—	—	—
৫০। শ্রীনন্দিনী	সিংহ	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৫১। শ্রীইন্দ্রাণী	হস্তী	"	শক্তি
৫২। শ্রীইরুরী	গাভী	গোমস্তকসহ	যোগিনী
৫৩। শ্রীস্বন্দিনী	গাধা	ভগ্নমূর্ত্তি	"
৫৪। শ্রীঅঙ্গিনী	হস্তী	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	"
৫৫। —	শূকর	শূকরের মস্তকসহ	"
৫৬। শ্রীতেরাণ্ডা	মহেশ্বর	বিংশতি-হস্তযুক্তা	"
৫৭। শ্রীপারবী	শায়িত মানব	দশহস্তযুক্তা স্ত্রীমূর্ত্তি	পার্ব্বতী
৫৮। শ্রীরায়ুবেনা	হরিণ (antelope)	ভগ্নমূর্ত্তি	যোগিনী
৫৯। শ্রীউবেবাণী	পক্ষী	"	"
৬০। —	হস্তী	নৃত্যরতা স্ত্রীমূর্ত্তি	"
৬১। শ্রীসর্ব্বতোমুখী	তুইটি ত্রিভূজের মধ্যে পদ্ম	ত্রিমস্তক ও দ্বাদশ-হস্তযুক্তা দেবী	"
৬২। শ্রীমন্দোদরী	যুক্তকরে তুইটি পুরুষ	ভগ্ন	যোগিনী
৬৩। শ্রীক্ষেমুখী	সারস	ভগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি	"
৬৪। শ্রীজম্বাভী	ভল্লুক	"	"
৬৫। শ্রীঔরাগ	নগ্নমানব	"	"
৬৬। (শূন্য)	—	—	"
৬৭। শ্রীথিরচিত্তা	যুক্তকর পুরুষ	বসা মূর্ত্তি	"
৬৮। শ্রীযমুনা	কচ্ছপ	দ্বিহস্তযুক্তা স্ত্রীমূর্ত্তি	যমুনা নদী
৬৯। (শূন্য)	—	—	—
৭০। শ্রীবিভাষা	কঙ্কালসার মানব	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী

ক্ষোদিত লিপির পাঠ	বাহন	প্রকার	মন্তব্য
৭১। শ্রীসিংহ সিংহা	সিংহমস্তকযুক্ত মানব	সিংহমস্তকসহ বসা মূর্ত্তি	শক্তি
৭২। শ্রীনীলদম্বরা	গরুড়	বসা মূর্ত্তি	যোগিনী
৭৩। (ক্ষয়প্রাপ্ত)	অগ্নিশিখা	„	„
৭৪। শ্রীঅন্তকারী	বৃষ	মুখব্যাদান করা	„
৭৫। (নাম নাই)	লম্বা নাসিকা-যুক্ত বৃষ	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	„
৭৬। শ্রীপিঙ্গলা	ময়ূর	„	শক্তি
৭৭। শ্রীঅখলা	যুক্তকরে দুইটি মানব	„	যোগিনী
৭৮। (নাম নাই)	পক্ষী	নৃত্যরতা	„
৭৯। শ্রীক্ষত্রধর্ম্মিণী	শৃঙ্খলযুক্ত বৃষ	মস্তকোপরি নরকপাল	„
৮০। শ্রীবীরেন্দ্রী	ঘোড়ার মূর্ত্তি	ঢাল ও তরবারী হস্তে স্ত্রীমূর্ত্তি	„
৮১। (শূন্য)	—	—	„
৮২। শ্রীঝাঁধালী দেবী	থাবাযুক্ত পশু	বসা স্ত্রীমূর্ত্তি	„
৮৩। পশ্চিম প্রবেশ-দ্বার			
৮৪। (শূন্য)	—	—	—

এই বিশিষ্ট অভিনব ধারার মন্দিরের নির্ম্মাণ-কর্ত্তার কোন সন্ধান বা ইহার নির্ম্মাণের প্রকৃত সময় জানা যায় নাই। আসনতলে ক্ষোদিত অক্ষরের ধারা ও বয়স হইতে এবং মন্দিরের গঠন-পদ্ধতি দেখিয়া এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কাল নবম হইতে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ বলিয়া কানিংহাম সাহেব অনুমান

করেন। তাঁহার পর কোন ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক অন্যরূপ কোন মীমাংসা করেন নাই। কিন্তু লিপির ধারা অনুযায়ী ভবপতি রাজার সমসাময়িক মালোয়ার যুবরাজের পিতা লক্ষ্মণের সময়ে এই মন্দির নির্ম্মিত বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। ৯৫০ হইতে ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ রাজত্ব করেন। উক্ত মতের উপর নির্ভর করিলেও মন্দিরটি হাজার বৎসরের প্রাচীন প্রতিপন্ন হয়। অধ্যাপক হল্ ভেড়াঘাটের মন্দিরের শিলালিপি-পাঠে এই মন্দির ১১০০ খৃষ্টাব্দের বলিয়াছেন। এই স্থানের দেবী-মূর্ত্তিগুলি সত্যই অদ্ভুত।

শ্যামা মায়ের ভক্ত বাংলা দেশের অধিবাসী তান্ত্রিক দেবী-মূর্ত্তি দেখিলে বিশেষ আনন্দিত হয়। মূর্ত্তিগুলির মুখশ্রী ও দেহভঙ্গিমা গুপ্ত-যুগের শিল্পিগণের ঐকান্তিক সাধনায় যেমন সুশ্রী তেমনি ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে। দশভুজা মূর্ত্তি দেখিলে বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয়ে ভক্তি ও পুলকের সঞ্চার হয়। এখনও যে সব মূর্ত্তি অটুট রহিয়াছে তাহা দেশবিদেশের শিল্পানুরাগীর মনে আনন্দ প্রদান করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, বদন, বক্ষঃ, কটি, হস্ত, পদ এবং অঙ্গুলীর ভঙ্গিমা এমনই সুন্দর যেন শরীর-গঠন-শাস্ত্রের (Anatomyর) প্রতি ছত্র প্রতিপালিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি-সংগ্রহালয় দেখিলে আদি মন্দিরের বিশাল আয়তন, অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য এবং মনোরম কারুকার্য্য কল্পনা করা যায়। বাস্তব-ঐশ্বর্য্য বিমুখ ভারতবাসী তাহাদের শ্রেষ্ঠ সাধনা, শক্তি-সামর্থ্য, বিত্ত সবই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদান করে। প্রকৃতিও দেব-দেউলের জন্য শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য এই সব স্থানে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

জি. আই. পি. রেলের সহিত বি. এন. আর. রেলের সঙ্গমস্থলে মধ্যভারতের সুবিখ্যাত নগর জব্বলপুর অবস্থিত।

পথ

জব্বলপুর সহর হইতে ১১ মাইল রেলপথে টঙ্গায় বা মোটরাদি যানে গমন করিয়া ভেড়াঘাটে উপস্থিত হওয়া যায়। এই ঘাট হইতে সরকারের রক্ষিত নৌকায় 'মার্বেল রকে'র মধ্য দিয়া নর্ম্মদা-নদীবক্ষে বিহার করা যায়। স্থলপথে এক মাইল গমন করিলে নর্ম্মদা-জলপ্রপাতে তূলা ধোনার ন্যায় জল-বিচ্ছুরণের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায়।

ভীলসা—বাসুদেবের মন্দির ও গরুড়স্তম্ভ

ভারত, মিশর, রোম ও গ্রীসের মূর্ত্তি-গঠনের সাধনা যুগ-যুগান্তর হইতে শিল্পিগণকে নানা পরিকল্পনায় অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে। ভারতের শিল্পশাস্ত্র মনুষ্যমূর্ত্তি-গঠনের নির্দ্দেশ দেয় নাই। মনুষ্যমূর্ত্তি গঠন করিবার অভ্যাস শিল্পীর অর্থলোভ বৃদ্ধি করিয়া দেয়; মানবের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্যই তার শক্তি নিযুক্ত হয়। দেবমূর্ত্তি গঠন করিবার প্রয়াস থাকিলে শিল্পীর অপূর্ব্ব সাধনার ও সংযমের প্রয়োজন; আরাধ্য দেবতার অনুপ্রেরণায় তাহার সমস্ত কলাশক্তি উদ্বোধিত হয়, শিল্পী নিত্য নূতন পরিকল্পনা করিবার শক্তি অর্জ্জন করে; শিল্পীর স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়; সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। সেই নিমিত্ত ভারতের শিল্প-সম্পদ যুগে যুগে দেশ-দেশান্তর হইতে সৌন্দর্য্যের উপাসক শিল্পানুরাগীকে আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছে। ভারতের শিল্পীদিগের সাধনা দর্শকদিগের মন চিরকাল আনন্দে ভরিয়া দেয়। সাধকগণ ভারতীয় শিল্প-সম্পদের মধ্যে সৎ-চিৎ-আনন্দময়ের সন্ধান পান।

সহরের কোলাহল ও সাংসারিক দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে মানবের চিত্ত স্থির থাকে না, তাই সাধকেরা সাধনার জন্য নির্জ্জন স্থান ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন অন্বেষণ করেন। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ সাধকেরা ভারতে রম্য স্থানেই মন্দির, গুহা বা বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হিন্দুর স্বাধীন যুগের শিল্প-সাধনার কথা অফুরন্ত। গুপ্তযুগের শিল্পীর কৌশল, পরিকল্পনা ও দক্ষতা জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মধ্যভারতে সুরম্য উদয়গিরিতে গুপ্ত-যুগের সাধকেরা ভগবৎ-সাধনার জন্য পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত করিয়া পর্ব্বতের গুহাতে তাঁহাদের আসন পাতিয়াছিলেন। তাঁহারা শিল্পীকে বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন তিনটি সাধনার ফল উদয়গিরির গুহায় নানা মূর্ত্তির ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিল্পী কল্পনা-বলে অমরাবতীর সুষমা ভূমণ্ডলে আনয়ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গুপ্তযুগের শিল্পীরা কেবল স্থপতি নহেন তাঁহারা সাধক ও পূজারী।

গোয়ালিয়র রাজ্যের মধ্যে ভীলসা এক ক্ষুদ্র নগর, বৌদ্ধ-যুগের প্রারম্ভে ভীলসার সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে বিশাল মালোয়া রাজ্যের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী বেশনগর বেতুয়া ও ব্যাস নদীর কূলে বিরাজিত ছিল। রেল ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে বেশ নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। যখন এই স্থানে মালোয়ার রাজধানী ছিল তখন এখানে বাসুদেবের একটি বৃহৎ মন্দির বিরাজিত ছিল। সে আজ দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের কথা।

হিলিয়োডোরাস্ স্তম্ভ

প্রাচীন বাসুদেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে গ্রীক রাজপুত্র হিলিয়োডোরাস্ একটি গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই স্তম্ভটি এখনও হিলিয়োডোরাসের গরুড়স্তম্ভ বা "খাম্বাবা" নামে খ্যাত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

হিলিওডোরাস এই গরুড়স্তম্ভটি খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০ অব্দে মালোয়ার রাজার কুলদেবতা বাসুদেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে নির্ম্মাণ

করিয়াছিলেন। স্তম্ভের গাত্রে ব্রাহ্মী অক্ষরে গ্রীক রাজপুত্র হিলিওডোরাস-কর্তৃক এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হওয়ার কাহিনী, এবং তাঁহার "পরম ভাগবত" নামে খ্যাতির কথা উৎকীর্ণ আছে। গোয়ালিয়ার রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ত্তারা এই লিপির
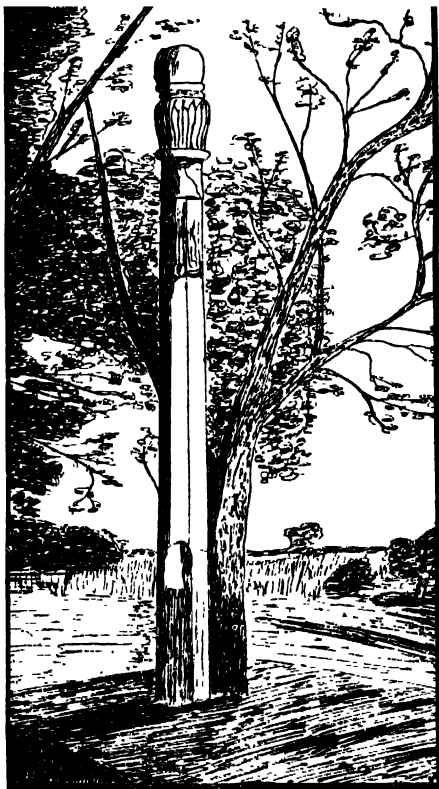
হিলিওডোরাসের গরুড়স্তম্ভ

ইংরাজি অনুবাদ স্তম্ভের পাদদেশে মার্ব্বেল ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। বাসুদেব-মন্দিরের পূজারীর বংশধর

9—1804B.

গোস্বামীরা এখনও এই 'খাম্বাবা'র নিকটেই বাস করিতেছেন। হিন্দু দেব-মন্দিরের প্রামাণিক প্রাচীনতম নিদর্শন এই হিলিওডোরাসের স্তম্ভ।

এই স্তম্ভটির সহিত এক অপূর্ব্ব কাহিনী জড়িত; দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভিন্নদেশীয় দুইটি যুবক-যুবতীর অপূর্ব্ব প্রণয় ও পরিণয়-কাহিনী এই স্তম্ভের সহিত জড়িত রহিয়াছে। ব্যাকৃট্রিয়ান গ্রীক-নরপতি এন্টিসিলিওডিরাস্ খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তক্ষশীলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই সময়ে মালোয়া এক সমৃদ্ধশালী সাম্রাজ্য ছিল, গ্রীক-নরপতি বহিঃশত্রু-দমনের জন্য বিরাট্ হস্তিবাহিনী ও সৈন্যসঙ্ঘ-গঠনের পরিকল্পনা করেন। মালোয়া রাজ্যে তখন হস্তীর অত্যন্ত প্রাচুর্য্য ছিল। হস্তি-সংগ্রহ এবং নিজ রাজ্যকে শক্তিমান্ করিবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন।

তক্ষশীলা সেই সময়ে সৌন্দর্য্যশালী মহানগরী, বিরাট্ শিক্ষাপীঠ ও বিপুল বাণিজ্যকেন্দ্র। মালোয়ার সম্রাট্ও তাঁহার সাম্রাজ্য সুরক্ষিত ও সুশাসিত করিবার জন্য যুবরাজকে তক্ষশীলায় গ্রীক রণ-কৌশল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিখিবার জন্য পাঠাইতে মনস্থ করেন। মালোয়ার রাজপুত্র তক্ষশীলায় আগমন করিলে গ্রীক-নরপতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং রাজ-আত্মীয় ডিয়নের অতিথিরূপে তাঁহাকে সযত্নে রাখিয়া দিলেন। ডিয়নের পুত্র হিলিওডোরাসের সহিত মালোয়ার রাজপুত্রের অতি অল্প-কালের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত হইল। শীতের অবসানে যখন একদিন গ্রীষ্মাধিক্য হয়, তখন রাজপুত্র বিগলিত তুষারের স্বচ্ছ সলিলধারায় অবগাহন করিবার লোভ সংবরণ

করিতে পারিলেন না। ঠাণ্ডা জলে স্নান করাতে তাঁহার সর্দ্দি ও জ্বরবিকার হয় এবং জীবন-সংশয় হইয়া উঠিল। হিলিওডোরাস ও তাঁহার জননীর সেবায় রাজপুত্র আরোগ্য লাভ করিলেন।

গ্রীক-নরপতি হস্তী সংগ্রহ এবং বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করিবার জন্য মালোয়ার রাজধানীতে হিলিওডোরাসকে রাজদূত নিযুক্ত করিলেন। বিদায়কালে মালোয়ার রাজকুমার সম্রাট্‌কে পত্রে হিলিওডোরাসের সদ্‌ব্যবহারের কথা জানাইলেন। তাঁহাদেরই যত্নে যে তাঁহার জীবন-লাভ হইয়াছে সে কথা উল্লেখ করিয়া হিলিওডোরাসকে নিজ-পরিবারভুক্ত করিয়া রাখিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। বিদেশে অবস্থিত পুত্রের বিরহে কাতর মালোয়ার সম্রাট্‌ অপত্যস্নেহে বিগলিত হইয়া হিলিওডোরাসকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং নিজপরিবার-ভুক্ত করিয়া রাখিলেন। মালোয়ার একমাত্র রাজকুমারী হিলিওডোরাসের সুগঠিত, দীর্ঘ ও সুশ্রী রূপে এবং নানা গুণে আকৃষ্ট হইলেন; হিলিওডোরাসও রাজকুমারীর সরল ও লজ্জাবনত ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই যুগে মালোয়ায় বসন্তোৎসব অতি জনপ্রিয় আনন্দোৎসব ছিল, সে সময়ে সকল নরনারী অবাধে একত্র হইয়া পরস্পর নৃত্যগীতাদি উৎসবে মাতিয়া উঠিত। বসন্তোৎসব-দিনে যখন রাজার দুলালী 'মাধবিকা' গাছের ডালে ঝুলান দোলনায় দুলিতে দুলিতে পুষ্পবীথিকায় চরণাঘাত করিতেছিলেন—তখন হিলিওডোরাস তাঁহার আরক্ত চরণের শোভায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—"আমি যদি পুষ্পবীথিকা হইতাম, তাহা হইলে দেবীর চরণস্পর্শে ধন্য হইতাম।" মাধবিকা

পশ্চাতে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিলেন। চারি চক্ষুর মিলনে অনেক অব্যক্ত কথা আত্মপ্রকাশ করিল। দুইটি তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইল এবং পরিণামে তাহা পরিণয়ে পর্য্যবসিত হইল।

যখন মালোয়ার সম্রাট্ এই প্রণয়-কাহিনী শুনিলেন, তিনি হিলিওডোরাসকে অবমানিত করিয়া রাজপ্রাসাদ ও রাজধানী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। সে কালে দূত অবধ্য ছিল। মর্ম্মাহত হিলিওডোরাস যখন তাঁহার প্রণয়িনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন তখন রাজকুমারী আশ্বাস দিলেন, "আমি তোমার বাগ্‌দত্তা রমণী, আমাদের বিচ্ছেদ নাই; হিন্দু-ললনা বাগ্‌দত্তা হইলে অন্য কাহাকেও এ জীবনে গ্রহণ করে না। তুমি একান্তমনে আমাদের কুলদেবতা বাসুদেবের ভজনা করিতে পারিলে আমায় লাভ করিতে পারিবে।"

গ্রীক-রাজপুত্র তাঁহার হিন্দু প্রণয়িনীর কথায় বিশ্বাস করিয়া বাসুদেবের পূজার্চ্চনায় মন ও প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তাঁহার একাগ্র সাধনা ও নিষ্ঠা দেখিয়া মালোয়াবাসী বিস্মিত হইল এবং ক্রমে রাজার কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। অন্যদিকে রাজকুমারী প্রেমাস্পদের লাঞ্ছনায় ও বিরহে মর্ম্মাহত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তিনি উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। মহারাণী কন্যার অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইলেন, তাঁহার মাতৃস্নেহ কোন বাধা মানিল না; সন্তানের প্রাণ-রক্ষার জন্য তিনি মহারাজকে, যবন গ্রীককে কন্যা প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা ও মন্ত্রিমণ্ডলী হিলিওডোরাসের হিন্দুদেব-প্রীতি ও নিষ্ঠার সহিত অর্চ্চনা দেখিয়া কন্যাপ্রদান করিতে সম্মত

হইলেন। হিন্দু রাজকন্যার সহিত যবন গ্রীক-রাজপুত্রের পরিণয় হইয়া গেল। রাজপুরী উৎসবে মাতিয়া উঠিল।

হিলিওডোরাসের দেব-প্রীতি ও একনিষ্ঠ ভক্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহাকে "পরম-ভাগবত" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। এই ইতিবৃত্ত ও কাহিনীর মর্ম্মকথা ব্রাহ্মী অক্ষরে স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। হিলিওডোরাস এই গরুড়-স্তম্ভটি বাসুদেব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ দুইটি ছত্রের পাঠ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন *—

ত্রীনি অমুতপদানি সুঅনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগং দম চাগ অপ্রমাদ।
তিনটি অমৃতপদ সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হ'লে
নিয়ে যায় — দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ॥
— খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের যবন (গ্রীক) বৈষ্ণব
দিওনের পুত্র হেলিওদোরের শিলালিপি হইতে
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

* (লেখকের 'স্মৃতিকণা'—পৃঃ ৭৯)

ভীলসা সহরের পাথরের দুর্গের ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বে বেতোয়া নদী বহিয়া চলিয়াছে। নদীর গর্ভের বাঁধান রাস্তার উপর দিয়া নদী পার হইয়া তিন মাইল মেঠো পথ দিয়া উদয়গিরি যাইতে হয়। দূর হইতে উদয়গিরির দৃশ্য দেখা যায়। গিরিগাত্র ক্ষোদিত করিয়া প্রস্তুত ছোট-বড় আঠারটি গুহার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। একটি গুহার অভ্যন্তরের প্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে গুহাটির নির্ম্মাণ-কাল ৮২ গুপ্ত সংবৎ বা ৪০১-৪০২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া জানা যায়। সমস্ত গুহার গঠন ও শিল্পধারা হইতে গুহাগুলিকে গুপ্তযুগে নির্ম্মিত বলিয়া ধারণা হয়।

উদয়গিরির গুহা

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন—তিনটি সাধনার ফল উদয়গিরির গুহায় নানা মূর্ত্তির ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথম গুহাটি পাহাড়ের তলদেশে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সমস্ত ঘরটি পাহাড়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত। মেঝেটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিশ হাত, সমচতুষ্কোণ। গুহার ছাদ আসল পাহাড়; পর্ব্বত কাটিয়া সমতল ছাদের তলে (সিলিংএ) ক্ষোদিত চতুষ্কোণবিশিষ্ট পাঁচটি প্যানেল ছাদের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রতি প্যানেলের মধ্যে একটি পদ্মফুল ক্ষোদিত রহিয়াছে। ছাদটি সমস্তই গিরিবপু, তাই তাহার সংস্কারের প্রয়োজন নাই, ধ্বংস হইবারও ভয় নাই এবং অভ্যন্তরে জল পড়িবারও আশঙ্কা নাই। গুহার ভিতরের প্রাচীর-গাত্রে দেবনাগরী অক্ষরে কয়েকটি ছত্র উৎকীর্ণ আছে। গুহার দ্বারের সম্মুখে একটি অলিন্দ ছিল। স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ হইতে স্তম্ভের কারুকার্য্যের সূক্ষ্মধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় গুহাটির আয়তন দৈর্ঘ্যে বিশ ফুট এবং প্রস্থেও বিশ ফুট. ইহাও সম্পূর্ণ পাহাড়ের অভ্যন্তরে নির্ম্মিত। একটিমাত্র দ্বার ভিতরে প্রবেশের জন্য রহিয়াছে।

তৃতীয় গুহাটি যদিও ক্ষুদ্র—৮′×৬′ ফুট মাত্র, তথাপি ইহার মধ্যে একটি সুদর্শন চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি দর্শন করিলে দর্শকের হৃদয় ভক্তি ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, বাহ্য জগতের কোন চিন্তা থাকে না। শিল্পী তাঁহার প্রাণের অব্যক্ত ভাবের প্রেরণাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারই সাধনার বলে। মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারাতেই শিল্পী ও সাহিত্যিকের কৃতিত্ব।

চতুর্থ গুহার প্রবেশ-দ্বারের চৌকাঠের কারুকার্য্য এখনও অটুট আছে। গুহার মধ্যে বেদীর উপর ক্ষোদিত ত্রিনয়ন শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। দ্বারের বামে বাহিরে পর্ব্বতগাত্রে ছয় ফুট উচ্চ গণপতির সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজিত—গজেন্দ্রবদন লম্বোদর সুন্দর সিদ্ধিদাতার মূর্ত্তিটি পরম রমণীয়, গ্রাম্য নরনারীরা শুভদিনে আসিয়া সিদ্ধিলাভের আশায় সিদ্ধিদাতার গাত্রে সিন্দূর লেপিয়া যায়।

ধ্বংসোন্মুখ পঞ্চম গুহাটির বহির্গাত্রে এগার ফুট উচ্চ বিরাট্ বরাহমূর্ত্তি এখনও অটুট ও অম্লান রহিয়াছে। শিল্পী তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার বিশাল, বিরাট্ মূর্ত্তির কল্পনা এই বরাহ অবতার মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মুখ-গহ্বরে প্রায় প্রবিষ্ট পঞ্চ রমণীমূর্ত্তি শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিতেছে। মস্তকোপরি অনন্তনাগ ফণা বিস্তার করিয়া বরাহাবতারত্ব প্রকাশ করিতেছে।

বরাহ অবতার গুহা

ষষ্ঠ গুহার প্রবেশদ্বারের উপর বিশাল তরঙ্গে ভাসিয়া শত-শত নর-নারী যেন অসীম অনন্তের অন্বেষণে যাইতেছে। তরঙ্গের উত্তাল নৃত্য তিনটি স্তরে ক্ষোদিত রহিয়াছে। এক এক স্তর যেন নরনারীর ঢেউ। তুইটি স্তরে কুড়িটি করিয়া এবং নিম্ন স্তরে বত্রিশটি নারী-মূর্ত্তি তরঙ্গের ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে। শিল্পী দ্বারের তুই পার্শ্বে পাপীদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিবার জন্যই যেন ভয়ঙ্কর তুই দ্বারপাল-মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াছেন।

সপ্তম গুহাটি বীর সেনা (Ministry of war) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কথা পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অভ্যন্তরের দশভুজার মূর্ত্তি পাপী-তাপীদের অভয় প্রদান করিতেছে। ছাদের তলে ক্ষোদিত প্রস্ফুটিত পদ্ম গুহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। অষ্টম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত পাঁচটি গুহা আয়তনে ছোট; এইগুলি সাধকদের বাসের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই, প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে।

উদয়গিরির গুহার মধ্যে ত্রয়োদশ গুহাটিই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। এই গুহাটি একটি বৃহৎ গুহার ধ্বংসাবশেষ; তিন দিক্ ধ্বসিয়া গিয়াছে, একদিকের পর্ব্বতগাত্রে অনন্তশয্যায় শায়িত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত চতুর্ভুজ বিশাল নারায়ণ-মূর্ত্তি ক্ষোদিত। মূর্ত্তিটি পূর্ণ বার হাত বা আঠার ফুট লম্বা, ইহার বপুর পরিমাণ তিন হাত। নাভি হইতে মৃণালদল উঠিয়াছে, তাহার উপর ধ্যানরত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বসিয়া আছেন। উপরে শিল্পীর কল্পিত নভোমণ্ডলে নানা দেবতা যুক্তকরে নারায়ণের স্তব

অনন্তশয্যায় নারায়ণ গুহা

বরাহ অবতার গুহা—উদয়গিরি, ভীলসা—গোয়ালিয়র

করিতেছেন। নারায়ণের মস্তকের উপরে অনন্ত-নাগ সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া আছে, আর এই নাগের কুণ্ডলীকৃত অবয়বে শ্রীভগবানের অনন্তশয্যা রচিত। পাথরের উপর আঁচড় দিয়া দক্ষ শিল্পী ভগবানের অসীম অনন্ত শক্তি ও মহিমা বিকাশ করিয়াছেন। এই মহিমমণ্ডিত ঐশভাবযুক্ত পরমস্নিগ্ধ নারায়ণ-মূর্ত্তি শিল্পী অপূর্ব্ব ভক্তি ও শক্তি দিয়া পাথরে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভারতের শিল্পীরা বাস্তব আদর্শ (মডেল) সম্মুখে রাখিয়া কোন ক্ষোদনকার্য্য করিতেন না; শিল্পীদের চিত্তে যে অব্যক্ত ভাবের উদয় হইত তাহাকেই তাঁহারা কল্পনা ও সৃষ্টিশক্তির সাহায্যে রূপ প্রদান করিতেন। শিল্পী যেন পাথরে জীবন প্রদান করিয়াছেন।

নিম্নভাগে দুইটি ভক্ত তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ অর্ঘ করযোড়ে সেই বিশাল দেবতার চরণে ঢালিয়া দিতেছেন। আত্মনিবেদনের এমনই ভাব পাথরের মূর্ত্তি দুইটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে তাহা দেখিলেই সেই মঙ্গলময়ের চরণে আত্মনিবেদন করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হয়।

একটি প্রকাণ্ড নির্ম্মম কঠিন পাষাণকে কত সাধ্যসাধনা করিয়া কত যত্নে ও কত কৌশলে তাহার দেহে আঁচড় দিলে তবে তাহা এরূপ করুণার আকার ধারণ করে, এত আনন্দের ছটা ব্যক্ত করে! সুদক্ষ শিল্পী তাহার সংযম ও একাগ্রতার দ্বারাই অপূর্ব্ব মনোরম পরিকল্পনায় শিলার অঙ্গে ফুটাইয়া তোলে আনন্দের মূর্ত্তি, পাষাণে দেয় প্রাণ।

চতুর্দ্দশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত চারিটি গুহার মাত্র ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। অষ্টাদশ গুহাটি পর্ব্বতের উপরে, এক সঙ্কীর্ণ পথে কয়েকটি সোপান দিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া এই গুহাতে প্রবেশ করিতে হয়। গুহার আয়তন লম্বায় ১২ ফুট ও প্রস্থে

10—1804 B

১৬ ফুট। জলনিকাশের পথ, স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ ও ছাদের গঠন স্থপতির কৌশলের পরিচয় প্রদান করে, দর্শকের মন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। গুহাটি জৈন সাধকদের সাধনার স্থান। পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে তাহার নির্ম্মাণ-কাল ও পরিচয় পাওয়া যায়।

উদয়গিরির সংলগ্ন "কাজিয়াপুরা" পাহাড়ের উপরও একটি কারুকার্য্যমণ্ডিত গুহা বর্ত্তমান। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের হইলেও গুপ্তযুগের হিন্দু শিল্পীর নৈপুণ্য গুহার গাত্রের ও স্তম্ভের কারুকার্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আয়তন বৃহৎ, মূল পাহাড় কাটিয়া অভ্যন্তরে নির্ম্মিত, ছাদের উপর বিশাল গিরিবপু। বহির্মণ্ডপের ছাদও আসল পাহাড়ের অংশ, তিন দিক্ উন্মুক্ত, নীচে আটটি চারকোণা সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যমণ্ডিত স্তম্ভ বর্ত্তমান। গঠন-ধারা গুপ্তযুগের শিল্পধারা অনুযায়ী।

ভীলসার উদয়গিরির গুহাগুলি খুব পরিচিত না হইলেও ইহার কারুকার্য্য ও শিল্প-সাধনা উচ্চাঙ্গের। হিন্দু শিল্পীর দক্ষতা গুহার গাত্রের মূর্ত্তিগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকল শ্রেণীর দর্শকই গুহাগুলি দেখিলে আনন্দ ও তৃপ্তি পাইবে।

জি. আই. পি. রেলের কানপুর হইতে যে লাইন ঝাঁসীর মধ্য দিয়া ভূপাল গিয়াছে তাহারই মধ্যে ভীলসা ষ্টেসনে নামিয়া

পথ

একা-যোগে বেতুয়া নদী পার হইয়া পশ্চিমে দুই মাইল গমন করিলে বেশ-নগর যাওয়া যায়। সেখানে "খাম্বাবা" বা হিলিওডোরাসের স্তম্ভ অবস্থিত। ইহার ৪ মাইল দক্ষিণে উদয়গিরি।

সাঁচীর স্তূপ

বৌদ্ধ স্থাপত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা স্তূপ-নির্ম্মাণ। বুদ্ধদেবের বা কোন বৌদ্ধাচার্য্যের নশ্বর দেহাংশ রক্ষা করিবার জন্য স্তূপগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ অতি শ্রদ্ধার সহিত স্তূপ-নির্ম্মাণে বিত্ত দান করিতেন। সমগ্র ভারতে নানা স্থানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। স্তূপের আকার অর্দ্ধগোলাকার, ভিতরে ঘর বা দালান কিছুই থাকে না। শীর্ষোপরি চতুষ্কোণ বাক্সের ন্যায় এক 'টুপী', এবং তাহার উপর প্রস্তরের ছত্র স্থাপিত হয়।

বৌদ্ধ স্তূপের মধ্যে ভূপাল ও গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত সাঁচী ও ভীলসা অঞ্চলেই পাঁচ ছয়টি গ্রামে প্রায় ২৫।৩০টি স্তূপ দেখা যায়। ভীলসা অঞ্চলের স্তূপগুলি ভারতের স্তূপশ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে সাঁচীর স্তূপই বৌদ্ধ-শিল্পীর অভিনব অবদান। অশোকের সময় হইতে গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত এইখানের স্তূপগুলি নির্ম্মিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

বিহারে, দোয়াব অঞ্চলে, বৌদ্ধদের পবিত্র অষ্ট তীর্থে, তক্ষশিলায়, সারনাথে ও অমরাবতীতে যে সব বৃহৎ ও সুদৃঢ় স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দেশ-বিদেশের যাত্রিগণের চিত্ত বিস্ময়ে ও পুলকে ভরিয়া দিত। এখন কেবল তাহাদের

ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে মাত্র; কিন্তু সাঁচীর স্তূপ কয়টি অটুট ও সংস্কার অবস্থায় রহিয়াছে। সেই জন্যই সাঁচীর স্তূপের অভিনব গঠন এবং তোরণ ও বেষ্টনীর বিশিষ্ট পরিকল্পনা বিশ্বের সুধী- ও শিল্পী-সমাজে পরম আদৃত। সাঁচীর স্তূপগুলি মুসলমান ও বৌদ্ধ-দ্বেষীদের গোঁড়ামীর ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। তাই সাঁচীর স্তূপ দেখিলে মনে হয় শিল্পীর মোহন অঙ্গুলী-স্পর্শে অতীত ভারতের সেই মহামানব ও তাঁহার অমিয়া-মাখা বাণী যেন আমাদের কাছে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অতীতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া ভগবান্ বুদ্ধের শ্রীমুখের বাণী শুনি—

> "দুঃখিতের অন্নদান সেবা
> তোমরা লইবে বল কেবা॥"

আবার বৌদ্ধকীর্ত্তির অনাদর দেখিয়া ব্যথিত হই—

> "ব্যথিত নগর 'পরে
> বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
> সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি"

ফা হিয়ান ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতেই আমরা প্রধানতঃ বৌদ্ধ স্থাপত্যের ও শিল্পৈশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া থাকি, কিন্তু তাঁহাদের রচনায় সাঁচীর স্তূপের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল "মহাবংশ"-গ্রন্থে সাঁচীর স্তূপের সর্ব্ব-প্রাচীন পরিচয় অবগত হইতে পারি। অশোক যখন তাঁহার পিতা মৌর্য্য-সম্রাট্ বিন্দুসার-কর্ত্তৃক উজ্জয়িনী-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া উজ্জয়িনীতে গমন করিয়াছিলেন, সে সময়ে

পথিমধ্যে বর্ত্তমান গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বেশ নগরে চৈত্যগিরিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সেই স্থানের অধিপতি ভীল-সর্দ্দারের কন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া অশোক তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাহারই গর্ভে 'উজ্জনীয়া' ও 'মহিন্দা' নামে দুই যমজ-পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁহার 'সঙ্ঘমিত্রা' নামে এক কন্যা হয়। মহিন্দা ও সঙ্ঘমিত্রার নাম বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে ও ইতিহাসে বহু স্থানে উল্লিখিত আছে। এই দুই ভ্রাতা ও ভগ্নী তাঁহাদের জীবন ও শক্তি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেরাও পরম সাধক ও সুদক্ষ ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহাদেরই যত্নে ও চরিত্রবলে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারাই সিংহলের রাজাকে সপরিবারে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করান। এ কাহিনী মহাবংশে বর্ণিত আছে, সেই সঙ্গে সাঁচার স্তূপের উল্লেখও রহিয়াছে।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের পর তাঁহার দেহের অংশ যে আটটি স্থানে রাখিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সাঁচার স্তূপের নাম নাই। সাঁচীর কোন স্তূপেই বুদ্ধদেবের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপিত হয় নাই।

কি উদ্দেশ্যে এবং ঠিক কোন্ সময়ে এই বৃহৎ-স্তূপটি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার সঠিক সংবাদ ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। তবে ফার্গুসান সাহেবের অনুমান অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে ৮৪,০০০ চুরাশী হাজার স্তূপ ও স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সাঁচার স্তূপও সেই সময়ে নির্ম্মিত হয়। সে সময়ে সাঁচী সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, তখন এই স্থানটির নাম "বিদিশা" নামে খ্যাত ছিল।

সাঁচীতে স্তূপ নির্ম্মাণের স্থান নির্ণয় করিবার সম্বন্ধে শিল্পী সুন্দর শর্ম্মা, বি.এ. লিখিয়াছেন যে—স্থানটি এক ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত, ভারতের সর্ব্বদীর্ঘ দ্রাঘিমা (Longitude) ও অক্ষরেখার (Latitude) সংযোগ-বিন্দুতে অশোক সাঁচীর স্তূপটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা প্রায়ই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুমোদিত স্থানেই স্তূপ ও বিহার প্রস্তুত করিত।

স্তূপের পাদমূলে রক্ষিত অশোক-স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিমালা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, এই স্তূপ ও স্তম্ভ ২৬৩-২১১ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্যান্য স্তূপ ও মন্দির-গুলির নির্ম্মাণকাল খৃস্ট-পূর্ব্ব দুইশত শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত। প্রধান স্তূপটির সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন বহুবার হইয়াছে। পূর্ব্বতোরণ ও বেড়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফ্লীট সাহেবের "Early Gupta Inscriptions" পুস্তকের ২৯-৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, পূর্ব্ব তোরণের সন্নিকটের বেড়ার এক অংশে ইহার নির্ম্মাণ-কাল ৪১২ খৃঃ উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

এই স্থানের খনন ও সংস্কার-সময়ে যে সমস্ত মূর্ত্তি, স্তম্ভের অংশ, স্তম্ভশীর্ষ, দ্বারের চৌকাঠ, ব্রাকেট ও মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহা এই টীলার (পাহাড়ের) উপর নির্ম্মিত সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। সাঁচীর পাহাড়টি তিনশত ফুট উচ্চ এবং উপরিভাগ সমতল। এই সংগ্রহের নানা দ্রব্যের উপর উৎকীর্ণ লিপিগুলি পাঠ করিলে প্রকাশ পায় যে, এইখানকার স্তূপগুলি খৃঃ পূঃ ২২৫ অব্দ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে।

সাঁচীর স্তূপের খনন ও সংস্কার-কার্য্য সার জন মার্শালের কর্ত্তৃত্বাধীন এক বাঙ্গালী (মিঃ বি. ঘোষাল) অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোল বৎসর যাবৎ চেষ্টাতেই সংগ্রহালয়টি নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হয়। তাঁহার প্রশংসা সেখানকার পরিদর্শকদের মন্তব্য-পুস্তকে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ, জার্ম্মানীর ক্রাউন প্রিন্স, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড চেমস্‌ফোর্ড, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড আরউইন আদি রাজপ্রতিনিধিগণ, জঙ্গীলাট চেট্‌উড, প্রভৃতি বহু বিদেশী ও দেশী মনীষী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কুশান যুগের (দুইশত খৃষ্টাব্দের) পদ্মাসনে উপবিষ্ট প্রমাণ-আকারের সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি সংগ্রহালয়ের মধ্যে রহিয়াছে। আসনতলে পালি অক্ষরে নিম্নলিখিত তিনটি ছত্র উৎকীর্ণ আছে, তাহা পাঠ করিলে মূর্ত্তিটির নির্ম্মাণের সময় ও নির্ম্মাণকারীর নাম জানা যায়—

স্বা (র্য্যা) য (এ) ই র্য্য (j) যস্বা দেবপুত্রস্য স্য (আ) হী বৈশাখ্যইয়া সা (ম্) ২০৮ হেলদী ৫ আস্যাইয়া পূর্ব্ব (অয়েম) ভাগ্যা (ভ)।

স্যা জাম্বু-ছায়া শৈল গৃ (হা) স্যা ধর্ম্মদেব বিহারী প্রতিস্থাপিত বারেশ্য ধীতোরী মাধুরিকা॥

(অন্যে) ন্যা দীয়া ধর্ম্ম পরি (ত্যাগেন)

ললিতবিস্তরের ইংরাজী অনুবাদ-গ্রন্থে এই ছত্রগুলির নিম্নলিখিত অনুবাদ করা হইয়াছে—Being successful in the 28th year of Maharaja Rajatiraj Devaputra Shahivasiska's reign on the 5th day of the first month of winter, MADHURIKA, daughter of VIRA,

installed an image of Bhagavata (বোধিসত্ত্ব) sitting on the hill under the shade of Jamboo tree in the Dharma-deva Vihara as gift.

দ্বিতীয় স্তূপটি হইতে সংগৃহীত একখণ্ড বেড়ার উপরও তিন লাইনে দাতার নাম, ধাম ও কাল উৎকীর্ণ রহিয়াছে। যথা :—

(১) নাগসেন (দাতার নাম)

(২) অজনাভ অভাসী কাসা দানম (অজনাভ-নিবাসী অভাশিখার দান)

(৩) ভীষাক্ষ রোহানী পদীয়াস্যা দান (রোহিনীপদা-নিবাসী বিশাখার দান)

(৪) ইন্তসা উপশাখা দান (gift of worshipper Idata [150 B.C.])

প্রধান স্তূপের পদতলে যে স্তম্ভটি রহিয়াছে তাহা অশোকের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার গাত্রে নির্ম্মাণকাল ২৫৩-২১১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ব্রাহ্মী অক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে। স্তম্ভটি ৪২ ফুট উচ্চ মসৃণ জমাট মোজাইকের মত উজ্জ্বল পালিশযুক্ত। স্তম্ভের উপর কুঞ্চিত-কেশর-সংকলিত চারিটি সিংহের শির স্থাপিত ছিল, এই স্তম্ভ শিরঃ-স্থানটি সংগ্রহালয়ে রহিয়াছে। ইহার ব্যাস তিন ফুট, সারনাথের অশোক-স্তম্ভের অনুরূপ, সেই চারিটি সিংহশিরোযুক্ত স্তম্ভের মাথলার অনুকরণের ছাঁচ কলিকাতার মিউজিয়মে আছে।

অশোক-স্তম্ভ

অশোকের সময়ের (অশোক ২৭৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন) প্রাচীন কালে একখানি ৪২ ফুট লম্বা উজ্জ্বল-পালিশযুক্ত পাথরের স্তম্ভ দেখিয়া সার জন মার্শাল যেমন

বিস্মিত হইয়াছিলেন তেমনই সে যুগের শিল্পীর অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

স্তম্ভটির গাত্রে নানা ধর্ম্মোপদেশ ও নীতির অনুশাসন ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার মধ্যে এক ছত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অনুশাসন ক্ষোদিত আছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হইতে তাহার ইংরাজী অনুবাদ সেইখানে লিখিয়া রাখা হইয়াছে। যেমন---" So long as my sons and grandsons shall reign, as long as the moon and the sun shall endure, the monk or nun who shall cause diversion in the Sangha, shall be compelled to put on white robes and reside apart. For it is my desire that Sangha may be united and may long endure."

বুদ্ধদেবের সঙ্ঘ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"বুদ্ধদেব নানাদেশে নানা লোককে ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন। সেই ধর্ম্ম একটা শক্তি। এই শক্তি বহুলোকের মধ্যে ছড়ালো, অবশেষে তিনি তাকে নিয়মে সংযমে ব্যাপক করে বাঁধলেন, সেই হলো সঙ্ঘ। বহুলোকের মনকে এক ধর্ম্মতন্ত্রে মিলিত করে সঙ্ঘ সৃষ্টি করা মনীষীর কাজ" (কল ও কারখানা—বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৩৯)।

যে স্তূপটি সাঁচীর স্তূপের মধ্যে সর্ব্ব-প্রাচীন ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা নৈবেদ্যের মতন অর্দ্ধ-গোলাকার, তাহার ব্যাস ১০৬′ এবং উচ্চতা ৪২′ ফুট। সর্ব্বোচ্চ শিরঃ-স্থান সমতল, তাহার ব্যাস ক্রমশঃ কমিয়া ৩৪′ হইয়াছে। এই স্থানটি পূর্ব্বে বেড়া-দ্বারা বেষ্টিত ছিল মনে হয়, কারণ কয়েকটি রেলিংএর ভগ্ন অংশ সেখানে প্রোথিত রহিয়াছে। একটি চতুষ্কোণ বাক্সের

কনকহেড্ডা স্তূপ

11—1801 B.

আকারের পাথরের হর্ম্মিকা (হর্ম্মিজ "টী") স্থাপিত ছিল ; সেই আধারের নিম্নভাগ স্তূপের বেড়ার অনুকরণে এবং উপরাংশ জানালার আকারে প্রস্তুত, মধ্যস্থল ফাঁপা, আধারটি তিনখণ্ড প্রস্তরের ঢাকনীর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত। সম্ভবতঃ এই স্থানে কোন পবিত্র দ্রব্য রাখা ছিল। এই আধারের উপর প্রস্তরের ছত্র ছিল। ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা, বর্ণনা ও পরিচয় ক্যাপ্টেন জে. ডি. কানিংহাম সাহেবের প্রবন্ধে আছে (এসিয়াটিক সোসাইটী পত্রিকা, .৮৪৭ খৃঃ, আগষ্ট মাস)।

স্তূপটী ১২১′ ব্যাসবিশিষ্ট এবং ১৪′ ফুট উঁচু এক ঢালু পোস্তার উপর নির্ম্মিত। এই ১৪′ উচ্চে ছয় ফুট বিস্তৃত প্রদক্ষিণ পথটি ক্রমশঃ কাটান দিয়া গঠিত হইয়াছে। পথটি প্রস্তরের, অভিনব আকারে পাথরের বেড়ার দ্বারা বেষ্টিত, এবং টিলার উপর হইতে একটি পথ পোস্তার ঢালে ঢালে বিভক্ত হইয়া রেলিংএর সংযোগস্থলে মিলিত হইয়াছে। এই পথটির মধ্যে কয়েকটি সোপান ও চাতাল রহিয়াছে। উৎসব-সময়ে শ্রমণ, ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও পরিব্রাজকগণ দলে দলে এই পথটি দিয়া প্রদক্ষিণ করিতেন। পুণ্যস্থান ও মন্দির প্রদক্ষিণ করার প্রথা হিন্দু ও জৈনগণের মধ্যেও প্রচলিত রহিয়াছে।

স্তূপটির মধ্যস্থল গোলাকার, ইষ্টক-দ্বারা নির্ম্মিত, কাদার গাঁথুনী, বহির্ভাগ ছাঁটাই পাথরের দ্বারা মণ্ডিত, কতক অংশে চূণের পলস্তারা লাগান হইয়াছিল। পূর্ব্বে এই সব চূণ-কামের উপর নানা লতা-পাতা ও বুদ্ধদেবের জীবন-লীলার ছবি অঙ্কিত ছিল।

সাঁচীতে প্রধান স্তূপটির অপেক্ষা ছোট আরও দুইটি স্তূপ রহিয়াছে। দুইটি স্তূপের মধ্য হইতে স্মৃতিচিহ্নাধার
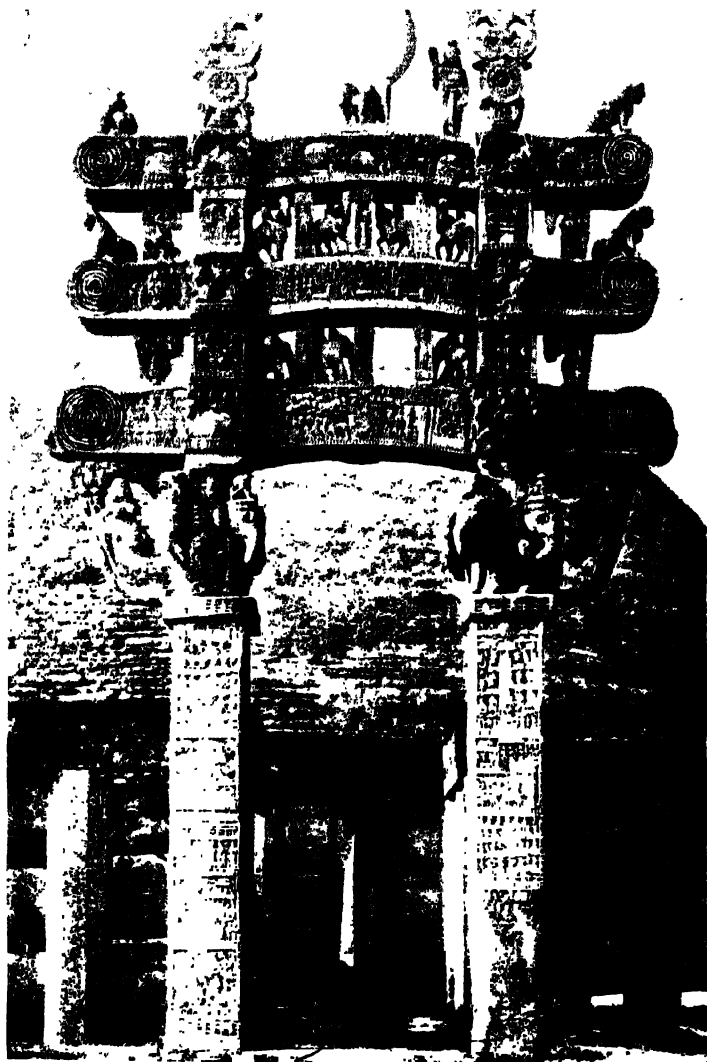
প্রধান স্তূপ ও তোরণ—সাঁচী

(রেলিক্ বক্স) পাওয়া গিয়াছে, তাহার ঢাকনীর উপর পরিচয় ক্ষোদিত আছে। এই লিপি পাঠ করিলে স্তূপটির নির্ম্মাণ-কাল এবং কাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্থাপিত ইত্যাদি ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

২নং স্তূপ হইতে যে 'ধাতুভাণ্ডে'র উদ্ধার হইয়াছে, তাহার ঢাকনীর উপর 'কাশ্যপ', 'মধ্যম' (মজ্ঝিম) ও 'দন্দুভীশ্বরে'র নাম উৎকীর্ণ আছে। (রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ১৯০৫ সালের বিবরণ-পত্রিকার ৬৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় বুদ্ধ-মহাসম্মিলনের অধিবেশন হয়। সম্রাট্ অশোকের নির্দ্দেশে হিমবন্ত প্রদেশের (হিমালয়ের) যক্ষদের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য এক বিরাট্ অভিযান হইয়াছিল। এই অভিযানের ভার 'কাশ্যপাগোত্রা' ও 'কোটিপুত'এর উপর অর্পিত হয়। তাহার সহিত 'মজ্ঝিম', 'দন্দুভীশ্বর,' 'সহদেব' ও 'মূলদেব' এই চারিজন বৌদ্ধাচার্য্য গমন করেন। হিমবন্ত প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহাদের নির্ব্বাণলাভ হইয়াছিল। এই প্রমাণ হইতে নির্দ্ধারিত হয় যে, স্তূপটি অশোকের ঠিক পরবর্ত্তী সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল।

সাঁচীর ৩নং স্তূপটির অতি সুন্দর ভাবে সংস্কার করা হইয়াছে। স্তূপটি 'মহামোগ্গল্লান স্তূপ' নামে পরিচিত। এই স্তূপটির খনন ও

মহামোগ্গল্লান স্তূপ

সংস্কারের সময়ে দুইটি হর্ম্মিকা (রেলিক বক্স) পাওয়া গিয়াছিল। দুইটি আধারের মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য বন্ধু ও সহচর মোগ্গল্লান ও শারিপুত্রের পবিত্র দেহাংশ ও অস্থি রক্ষিত ছিল। একটি আধারের ঢাকনীর উপর 'মহামোগ্গল্লান' অপরটির উপর 'শারিপুত্র' ব্রাহ্মী অক্ষরে

উৎকার্ণ রহিয়াছে। আধারের প্রস্তরের ঢাকনী দুইটি সাঁচীর মিউজিয়ামে রহিয়াছে। স্তূপের মধ্যস্থলে একটি কুঠরির মধ্য হইতে 'রেলিক বক্স' দুইটি পাওয়া গিয়াছে। কুঠরিটি ৫´ ফুট লম্বা একখণ্ড মোটা পাথরের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, বাক্স দুইটি সমচতুষ্কোণ আকারের, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক হাত পরিমাণ। ৬″ মোটা একখণ্ড পাথর বাক্স দুইটির ঢাকনী, বাক্সের মধ্যে দুইখণ্ড চন্দনকাষ্ঠ, একটুকরা অস্থি, কতকগুলি স্ফটিকের টুকরা ও কয়েকটি মুক্তা ছিল। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক স্তূপটি ৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া মত দিয়াছেন। ফার্গুসান সাহেব (পৃঃ ৬৮) লিখিয়াছেন—'মহামোগ্‌গল্লান' স্তূপ অশোকের সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। স্তূপটির উর্দ্ধদেশে একটি বড় প্রস্তরের ছত্র স্থাপিত রহিয়াছে। সম্মুখভাগে একটিমাত্র তোরণ রহিয়াছে। প্রধান স্তূপের তোরণের অপেক্ষা ইহা আকারে অনেক ছোট, তবে একই পরিকল্পনায় গঠিত।

এই তিনটি স্তূপ ব্যতীত আরও ৫।৬টি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্তূপগুলি খনন করিয়া বহু শিল্পসম্ভার পাওয়া গিয়াছে, সংগ্রহালয়ে সেইগুলি রক্ষিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ স্থাপত্যধারার আর একটি বিশিষ্ট পরিকল্পনা স্তূপ পরিবেষ্টন করিয়া শিলা-প্রাকার (রেলিং)-নির্ম্মাণ। বেড়ার গঠন

স্তূপের রেলিং

যেমন এক নূতন পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছে তেমনই তাহার উপরের কারুকার্য্য জগতের শিল্পকার্য্যের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য অধিকার করিয়াছে। বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপগুলির বেষ্টনী-সম্বন্ধে ফার্গুসান সাহেব লিখিয়াছেন— বুদ্ধগয়ার রেলিংগুলি সর্ব্বপ্রাচীন ধারার ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের

নিদর্শন (* * * one of the oldest and finest of the kind). সাঁচীর রেলিংএর উপরের খোদাই প্রচুরভাবে অলঙ্কৃত এবং চিত্তাকর্ষক (more ornamented and more interesting), অমরাবতীর রেলিংএর উপরের কার্য্য অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং অধিক পরিমাণে খোদাই কার্য্য-সম্বলিত (* * * one of the most elaborate and ornamental features of the style) এবং ভারুটের রেলিংগুলির উপর বৌদ্ধ শিল্পিগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন (* * * the great rail at Barhut made it clear that this was the feature on which the early Buddhist architects lavished all the resources of their art, and from the study of which we may consequently expect to learn most (H.I.E.A., Vol.I, 102).

সাঁচীর বেড়া পরিদর্শন করিলে শিলাপ্রাকার-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির ক্রমবিকাশের উপলব্ধি হয়। প্রধান স্তূপের অর্দ্ধগোলাকার বেষ্টনীর ব্যাস ১৪০′ ফুট, এগুলি একই পরিকল্পনায় গঠিত নহে, অধিকাংশ রেলিংএর বহির্ভাগই অণ্ডার্দ্ধাকৃতি, প্রদক্ষিণ-পথ বেষ্টন করিয়া এই রেলিং স্থাপিত, দুই ফুট অন্তর অষ্টকোণ-বিশিষ্ট (আটপল) ৮′ ফুট উচ্চ স্তম্ভের সহিত খাঁজ কাটিয়া ২′।৩″ লম্বা তিন সার রেলিং বসান হইয়াছে। কাঠের বেড়ার অনুকরণে থামেতে খাঁজ কাটিয়া রেলিগুলি সংযোজিত করা হইয়াছে।

২নং স্তূপের রেলিংগুলি গোলাকৃতি এবং তাহাদের উপরে প্রচুর খোদাই কার্য্য রহিয়াছে। তাহার মধ্যে দাতার নাম ও

দানের তারিখ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই লিপিমালার কয়েকটি লিপি পাঠ করিলে তাহাদের নির্ম্মাণ-কাল অশোকের সময়ের পূর্ব্বে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু প্রধান স্তূপটি অশোকের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার বহু নিদর্শন ফার্গুসান ও জেনারেল কানিংহাম সংগ্রহ করিয়াছেন।

ফার্গুসান সাহেব লিখিয়াছেন—("* * * the rail that surrounds the great Tope at Sanchi was probably commenced immediately after its erection, * * was probably in Asok's time B.C. 250; but as each rail as shown by the inscription on it, was **gift of** different individuals * * *"

জেনারেল কানিংহাম এই স্তূপ হইতে রেলিংএর উপর ক্ষোদিত ১৯৬টি লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া তাঁহার "ভীলসা টোপ্‌স্‌" গ্রন্থের ২৩৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছেন। জার্ম্মান অধ্যাপক বুলার (Bühler) তাঁহার Epigraphia Indica গ্রন্থের দ্বিতীয়-ভাগের ৮৭ পৃষ্ঠায় সাঁচীর প্রধান স্তূপের বেড়ার উপর উৎকীর্ণ ৩৭৮টি ও দ্বিতীয় স্তূপের বেড়ার উপর ক্ষোদিত ৭৮টি লিখনের পাঠ দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদার ইহার সংশোধন করিয়াছেন। এই সমস্ত লিপি পাঠ করিলে রেলিংগুলি যে এক শতাব্দী ব্যাপিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

তোরণগুলির নির্ম্মাণকাল তাহাদের গাত্রে ক্ষোদিত লিপিগুলি পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়। দক্ষিণ তোরণে উৎকীর্ণ লিপি পাঠে প্রকাশ পায়—এই তোরণ অন্ধ্রদেশের নরপতি শাতকর্ণি-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি ১৫৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন—তাহা

স্তূপের তোরণ

হইলে তোরণটি সেই সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল; আর তোরণটি স্তূপে উঠিবার পথের অগ্রেই স্থাপিত থাকায় সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার পর উত্তর- এবং তৎপরে পূর্ব্ব-তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব-তোরণের আদর্শের সঠিক ছাঁচ সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সর্ব্বশেষে পশ্চিম-তোরণটি প্রস্তুত হয়; কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাই প্রধান তোরণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

তোরণ-চতুষ্টয় মোটামুটি দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু রেলিংগুলি তৎপরে তোরণের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। আকারে ও পরিকল্পনায় চারিটি তোরণই এক রকম। কেবল উত্তর-তোরণটি অন্য তিনটি অপেক্ষা কিছু বড় এবং ইহার কারুকার্য্যও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু লেফ্‌টেনাণ্ট কোল সাহেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট তোরণের ছাঁচ না লইয়া পূর্ব্ব-তোরণের ছাঁচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর-তোরণের দুইটি স্তম্ভ পাদতল হইতে সর্ব্বনিম্ন পাড় ও মাত্‌লা পর্য্যন্ত ১৮′ ফুট উঁচু আর সর্ব্বোচ্চস্থানের মাপ ৬৫′ ফুট। এই স্থানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিরূপ চিহ্ন ত্রিরত্ন (Trident) স্থাপিত। এই তোরণের তিনটি পাড় বিশ ফুট লম্বা। পূর্ব্ব-তোরণটি সর্ব্বসমেত ৩৩′ উঁচু। অন্য দুইটির কতক অংশ পড়িয়া যাওয়াতে তাহাদের ঠিক মাপ পাওয়া যায় নাই।

প্রত্যেক তোরণের স্তম্ভের ও পাড়ের গাত্রের সমস্ত স্থানে বুদ্ধদেবের জীবন-লীলার ছবি পরিষ্কাররূপে ক্ষোদিত রহিয়াছে। অভিনিবেশ সহকারে সেইগুলি পরিদর্শন করিলে সিংহলী ও পালী ভাষার জাতকে লিখিত শাক্যমুনির বুদ্ধত্ব পাইবার পূর্ব্বের বিভিন্ন

জন্মের ও তাঁর এই জন্মের বহু কাহিনী অবগত হওয়া যায়। চিত্রগুলি যেমন সুস্পষ্ট তেমনই চিত্তাকর্ষক। এই স্থানে বুদ্ধের যে সব জীবন-লীলার ছবি উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন স্থানে বুদ্ধকে মানবমূর্ত্তিতে প্রকাশিত করিয়া ক্ষোদিত করা হয় নাই। কোন না কোন চিহ্ন দ্বারাই বুদ্ধদেব ও তাহার জীবন-লীলা প্রকাশিত করিবার জন্য চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে।

উত্তর-তোরণের বাম স্তম্ভটি যেন এক বিরাট্ মানবমূর্ত্তি; থামের মস্তকে পুষ্পমাল্য ক্ষোদিত রহিয়াছে এবং তলদেশে দুইটি চরণ খোদাই করা হইয়াছে, অন্য থামটির নক্সার কাজ অতি সূক্ষ্ম ও মনোরম, ইহা কোন ধর্ম্মসাধনার ধারা ব্যক্ত না করিলেও পরম সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। তোরণের গাত্রে বুদ্ধের তপস্যার প্রতীক পবিত্র 'বৃক্ষের' পূজার ছবি ৭৬ বার, নির্ব্বাণের চিহ্ন 'স্তূপ' ৩৮ বার, ধর্ম্মপ্রচারের চিহ্ন 'চক্র' ১০ বার এবং ঐশ্বর্য্য ও আনন্দের প্রতীক 'শ্রী' ১০ বার ক্ষোদিত হইয়াছে। এই সব খোদাই-কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা "ট্রী এণ্ড সার্পেণ্ট ওয়ারশিপ্" পুস্তকে রহিয়াছে। মিঃ এচ. কাজিন্স্ এই সমস্ত কারুকার্য্যের সুস্পষ্ট আলোক-চিত্র (ফোটো) মুদ্রিত করিয়াছেন।

ওদেত্ ব্রুল সাহেব সিলভ্যাঁ লেভীর 'ইণ্ডিয়ান টেম্পল্স্,' পুস্তকের ইংরাজী অনুলিপিতে উত্তর-তোরণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"Two vertical pillars support on two imposing capitols (four elephants back to back), three upper imposing architraves are decorated all over with small bas reliefs illustrating Buddhist legends. Although he is present in most of the scenes, the Buddha is never shown in human

forms. The artist only suggests the Buddha by means of various symbols." ইহাই অশোকের যুগে ভীলসা প্রদেশের বৌদ্ধশিল্পিগণের বিশিষ্ট সাধনার ফল।

পূর্ব-তোরণেও এই প্রকারে বুদ্ধের জীবন-লীলার নানা চিহ্ন (সিম্বল) খোদাই দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। যেমন নিম্ন পাড়ের উপর ক্ষোদিত 'হস্তিশাবক' বুদ্ধের মাতৃগর্ভে আগমনের, 'বৃক্ষ' বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির, দুইটি পাড়ের মধ্যে রক্ষিত 'চক্র' ধর্ম্ম-প্রচারের, উপরের পাড়ের মধ্যে ক্ষোদিত 'ডগবা' বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের, অশ্বারোহি-বিহীন 'অশ্ব' গৃহত্যাগের, দুইটি চরণের উপর 'ছত্র' তাঁহার বিশ্ব-হিতের কার্য্যের কথা ব্যক্ত করিতেছে। নিম্ন পাড়ে অশোকের বিরাট্ মিছিল-সহ বুদ্ধ-গয়াতে আগমনের ও নতজানু হইয়া প্রার্থনার ছবি উৎকীর্ণ আছে।

তোরণগুলিতে যুদ্ধবিগ্রহের চিত্রও ক্ষোদিত আছে দেখা যায় এবং কোন কোন চিত্রে নরনারীর আহারাদি নিত্যকর্ম্ম, এমন কি প্রেমালাপের চিত্রও খোদাই করা আছে। অবশ্য এইগুলি বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না।

প্রধান স্তূপের ৪০ গজ পূর্ব্ব-উত্তর কোণে একই চৌতারার উপর যে তিন নম্বর "মোগ্‌গল্লান"স্তূপ রহিয়াছে তাহার মাত্র একটি তোরণ দণ্ডায়মান আছে। এই তোরণটির দুইটি থাম ও একটি পাড় প্রথম আবিষ্কৃত হয়। পরবর্ত্তী কালে আর দুইটি পাড় সংযোজিত হইয়াছে। এই তোরণ সর্ব্বসমেত ১৭' উঁচু এবং ইহার পাড় ১৩' লম্বা। ইহা নিশ্চয় প্রধান স্তূপের তোরণ অপেক্ষা অনেক আধুনিক যুগের। শারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লানের জীবন-লীলা এই তোরণ-গাত্রে ক্ষোদিত হইয়াছে।

12—1304B.

সাঁচীর তোরণই যে সর্ব্বপ্রাচীন অথবা ইহার পর যে আর কোথাও এরূপ তোরণ নির্ম্মিত হয় নাই তাহা বলা যায় না। ভারতে এই প্রকার তোরণ বিরল হইলেও, চীন ও জাপানে এই সাচীর তোরণের অনুকরণে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অসংখ্য তোরণ দেখিতে পাওয়া যায়। চীন দেশে তাহাদিগকে "পাইলাস্" (Pai-lus) এবং জাপানে "টোরী-ইজ" (Tori-is) বলিয়া থাকে। ইহা কখনও প্রস্তরের, কখনও বা কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ফার্গুসান সাহেব লিখিয়াছেন যে, আশ্চর্য্যের বিষয় জেরুজালেমের মন্দিরের সম্মুখে যে দেউল আছে তাহার তোরণও এই সাঁচীর তোরণের সদৃশ, কেবল তিনটির স্থানে পাঁচটি পাড় সংযোজিত।

দক্ষিণ-তোরণের সর্ব্বনিম্ন সর্দ্দালে ও পশ্চিম দ্বারের পাড়ে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ-লাভের পর তাঁহার অস্থিরক্ষার জন্য যে বিবাদ হইয়াছিল সেই কাহিনা শিল্পিগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজ নিজ মতলব ও ধারা অনুযায়ী ক্ষোদিত করিয়াছিল। কাহিনীর চিত্র এমনই বোধগম্য যেন ছায়াচিত্রের ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। কাহিনীটি এই---যখন ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁহার এই নশ্বর দেহের অন্তিম সময় আগত জানিতে পারিলেন তখন প্রিয় শিষ্য আনন্দকে অন্তিমশয্যা রচনা করিতে আদেশ করিলেন। শয্যা রচিত হইলে তাহার উপর শয়ন করিয়া আনন্দের মুখমণ্ডলের উপর জ্যোতির্ম্ময় নেত্রদ্বয় স্থির ভাবে রাখিয়া তিনি কয়েকটি উপদেশ প্রদান করেন। তিনি সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে তাঁহার জন্মস্থান (কপিলবস্তু ও লুম্বিনী), বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির স্থান (গয়া), ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান স্থান (সারনাথ) ও নির্ব্বাণ-লাভের স্থান (কুশীনগর)—এই স্থানচতুষ্টয় পরম পবিত্র

জাতকের কাহিনী

বলিয়া গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। তৎপরে তিনি ধীরে ধীরে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। তখন আনন্দ এই সংবাদ মল্লগণকে জ্ঞাপন করেন। মল্লগণ দলবদ্ধ হইয়া সেই স্থানে সমবেত হন এবং ছয়দিনব্যাপী উৎসব করেন। তৎপরে মল্লাধিপতিগণ তথাগতের নশ্বরদেহ 'মুকুটবন্ধন'-স্থানে সজ্জিত চিতার উপর স্থাপন করেন। চারিজন মল্লপতি চিতায় অগ্নিসংস্কার করিতে উদেযাগ করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না। এক প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল—প্রিয় শিষ্য মহাকাশ্যপ আসিতেছে, অপেক্ষা কর। উদ্বিগ্নচিত্তে সকলে অপেক্ষা করিতেছিল—মহাকাশ্যপ বহু ভক্তসহ আগমন করিলে মহারোল উত্থিত হইল। সকলে বিস্ময়ে দেখিল চিতা আপনি জ্বলিয়া উঠিতেছে। সকলে চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। সমস্ত দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল, কেবল অস্থিখণ্ড অবশিষ্ট রহিল।

তখন মগধের অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবি জাতি, কপিল-বস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলিরা (Bullis of Allakappa), রামগ্রামের কোলিয়েরা (Koliyas), পাবার মল্লগণ (Mallas of Pava) বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ (Brahmans of Vethadvipa) বুদ্ধদেবের অস্থি গ্রহণ করিবার জন্য বিবাদ আরম্ভ করিল। অবশেষে আপোষে মীমাংসা হইল, বুদ্ধদেবের অস্থি আটটি সমানভাগে বিভক্ত হইয়া আটটি স্থানে রক্ষিত হইবে। ইহা ঠিক হইলে রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অল্লকপ্পা, রামগ্রাম, বেঠদ্বীপ, পাবা ও কুশীনগরে—সেই অস্থির উপর স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কাহিনী একই যায়গায় সম্পূর্ণভাবে ক্ষোদিত হইয়াছে।

তোরণের পাড়ে ও স্তম্ভে জাতকের নানা কাহিনী ধারাবাহিক

ভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ছদ্দন্ত জাতকের কাহিনী অতি সুস্পষ্ট ও সূক্ষ্মভাবে ক্ষোদিত হইয়াছে, ইহাতে বুদ্ধদেবের হস্তিরূপ জীবনের মর্ম্ম-রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণ- ও পশ্চিম-তোরণের গাত্রে বিশদভাবে একই কাহিনী উৎকীর্ণ, কিন্তু তাহাদের গঠন ও খোদাই করিবার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন—তবে দুইটিই উচ্চাঙ্গের। স্যর জন মার্শাল তুলনায় মন্তব্য করিয়াছেন—"The one on the south gateway is with the work of a creative genius, more expert perhaps the pencil or brush than the chisel but possessed of a delicate sense of line and of decorative and rhythmic composition. That on the work, on the other hand, is technically more advanced and individual figures, taken by themselves, are undoubtedly more effective and convincing."

দক্ষিণ তোরণের কারুকার্য্য সৃষ্টিশক্তির প্রতিভার নিদর্শন, শিল্পী পেন্সিল ও তুলি-দ্বারা চিত্রাঙ্কন অপেক্ষা বাটালির ঘায়ে অধিকতর দক্ষতা ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম-তোরণের অপর কারুকার্য্যাবলী খুবই technical। প্রত্যেকটি মূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখিলে প্রত্যেকটিই অভিনব এবং উচ্চ ভাবের প্রকাশক বলিয়া মনে হয়।

জি. আই. পি. রেলের যে লাইন জব্বলপুর হইতে বোম্বাই গিয়াছে, তাহার উপর ইটার্সী জংসন, সেই সংযোগ-স্থল হইতে উত্তরে ঝাঁসীর অভিমুখে একটি লাইন আছে, তাহার উপর ভূপাল সহর। ভূপাল ষ্টেশন হইতে ২৮ মাইল উত্তরে সুরম্য পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া গেলে সাঁচী

পথ

ষ্টেশন। ষ্টেশনের সন্নিকটেই ছোট এক পাহাড়ের উপর সাঁচীর বিখ্যাত স্তূপগুলি অবস্থিত। সাঁচী গ্রাম এখন জনবিরল, আহার্য্য-সামগ্রী দুই তিন মাইল দূরস্থ পল্লী হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। এখান হইতে সাত মাইল দূরে গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভীলসা নগর ও ষ্টেশন। সাঁচীর দুইটি সুরম্য ডাক-বাঙ্গালো ভ্রমণকারী ও দর্শকদের থাকিবার সুখ ও সুবিধা প্রদান করে। আমেরিকান ভ্রমণকারীদের জন্য যে বাঙ্গালোটি আছে তাতে বর্ত্তমান যুগোপযোগী সকল সুবিধা ও আরামের ব্যবস্থা আছে। অপরটি ভূপাল রাজ-সরকারের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে।

পরিনির্ব্বাণ অবস্থায় বুদ্ধদেব

অজন্তার ২৬নং গুহার মধ্যস্থিত পদ্মপুষ্পোপরি রক্ষিত মস্তক ত্রিশ ফুট লম্বা বিশাল মূর্ত্তি

বুদ্ধ-গয়ার মন্দির

গয়া ভারতের অতি প্রাচীন পরম-পুণ্যভূমি। হিন্দু ও বৌদ্ধগণের পরম-মোক্ষস্থান। পুণ্যতোয়া ফল্গুনদীর তীরে পর্ব্বতমালাবেষ্টিত প্রকৃতির মনোরম ঐশ্বর্য্যময় স্থান গয়াক্ষেত্রে যুগ-যুগান্তর হইতে শতসহস্র হিন্দু ও বৌদ্ধ নর-নারী সমবেত হইয়া আসিতেছে। নানা শাস্ত্রে গয়ার মাহাত্ম্য বর্ণিত রহিয়াছে।

যে বুদ্ধদেবের চরণে আজিও অর্দ্ধ-জগদ্বাসী ভক্তি ও প্রণতি জানায়, সেই বুদ্ধদেব এই গয়াধামে বোধিদ্রুমমূলে কঠোর তপস্যা করিয়া 'বুদ্ধত্ব' লাভ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগিমাত্রই বুদ্ধগয়ার বিশাল মন্দির ও অশ্বত্থবৃক্ষটি পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ভারতের সকল স্থান, এমন কি সুদূর চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা দেশ হইতে প্রতিবৎসর অসংখ্য বৌদ্ধ-নর-নারী এই পবিত্র স্থানে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে আগমন করেন।

বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ৫৬৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে নেপালের সীমানা 'লুম্বিনীতে', তপস্যা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন ৫৩২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে 'গয়াধামে', প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করেন ৫২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে 'সারনাথে', নির্ব্বাণলাভ করেন ৪৮৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে গোরক্ষপুরের নিকটবর্ত্তী 'কুশীনগরে'। বুদ্ধদেব যখন তাঁহার নির্ব্বাণলাভের সময় আসন্ন জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার

প্রিয় শিষ্যদের তিনি কতকগুলি উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে উক্ত চারিটি স্থান বৌদ্ধদের পরম পবিত্র এবং সেই চারিটি স্থান দর্শন করিলে পরম সুখ ও শান্তি লাভ হইবে—এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত গয়া বৌদ্ধদের পরম-প্রিয় তীর্থ।

অশোক তাঁহার রাজত্বকালের বিংশ বৎসরে বুদ্ধদেবের নির্দ্দেশ অনুসারে বৌদ্ধ-তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-লাভের প্রাক্কালে যে পথ অবলম্বন করিয়া কুশীনগরে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথ অনুসরণ করিয়া সম্রাট্ অশোক তীর্থ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। অশোক প্রথমে পাটলিপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গা পার হন, তৎপরে আধুনিক মজঃফরপুর ও চাম্পারণ জিলার মধ্য দিয়া গমন করেন। বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ ও বাখিরার (Bakhira) সিংহমস্তকভূষিত স্তম্ভ, কেশরীয়ার (Kesariya) স্তূপ, লউরীয়ার (Lauriya) সিংহমস্তকভূষিত স্তম্ভ, কুশীনগরের স্তূপ ও লুম্বিনীর অশোকস্তম্ভ আজও সম্রাট্ অশোকের তীর্থভ্রমণের সাক্ষ্য দিতেছে।

তিনি লুম্বিনীতে যে সুন্দর স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার গাত্রে কয়েকটি ছত্র উৎকীর্ণ আছে—তাহার অর্থ "মহামান্য সম্রাট্ প্রিয়দর্শী (অশোক) সশরীরে এই পুণ্যস্থানে আগমন করিয়া বুদ্ধদেবের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন, কারণ বুদ্ধদেব এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন * *।" এই শিলালিপি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ২৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে এই স্থান বুদ্ধদেবের জন্মস্থানরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। (আই. এস্. আর. ম্যা.—৩৪৪ পৃঃ)।

সম্রাট্ অশোক ২৬৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ২৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম ছিল। তিনি সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের বিশ্বকল্যাণকর বাণী ৮৪০০০ (চুরাশি হাজার) স্তম্ভ ও ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার উপর উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী, বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির স্থান গয়া, প্রথম-ধর্ম্মপ্রচারস্থান সারনাথ, নির্ব্বাণলাভের স্থান কুশীনগর এবং তাঁহার অস্থি যে অষ্ট স্থানে (রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অল্লকাপ্পা, রামগ্রাম, বেঠদ্বীপ, পাবা, কুশীনগর) সংরক্ষিত হইয়াছিল সেই সব স্থানগুলিতে অশোক স্তূপ, চৈত্য, বিহার ও স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অশোকের পূর্ব্বে এই সব স্থানে যে কি স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন বা প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রাজগিরি অতি প্রাচীন স্থান, হিন্দু-, বৌদ্ধ- ও জৈন-সম্প্রদায়ের পরম আদরের ভূমি। রাজগিরিকে কেন্দ্র করিয়া মগধের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

রাজগিরি

রাজগিরির পঞ্চপর্ব্বত যেমন প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যশালী, ইহার উষ্ণজল-প্রস্রবণ তেমনই রহস্যময়।

গৃহত্যাগের পর রাজকুমার গৌতম ছয় বৎসর রাজগিরিতে সাধনায় রত ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ হইলে মগধের রাজা বিম্বিসার এই রাজগিরিতে হিন্দুরাজাদের মধ্যে প্রথমে বুদ্ধদেবের ভক্ত হইয়াছিলেন। রাজগিরির সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত নালন্দা বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল।

এখনও সেই নালন্দায় প্রায় দুই মাইল ব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহ, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, বিহার প্রভৃতি বিশাল সৌধের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের পর তাঁহার নশ্বর দেহের অংশ মগধরাজ অজাতশত্রু সংগ্রহ করেন এবং এই রাজগিরিতে সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য রাজগিরি বৌদ্ধদের আটটি পবিত্র স্থানের অন্যতম।

জৈনদের তীর্থঙ্কর মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মহাপুরুষ। তাঁহার সাধনা ও সমাধির স্থান এই রাজগিরির নিকটবর্ত্তী পাবাপুরী। রাজগিরির সন্নিকটে (নয় মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে) পাবাপুরীতে বিশাল পদ্মপুষ্প-শোভিত হ্রদের মধ্যস্থলে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের ন্যায় মহাবীরের মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত স্মৃতি-সৌধ বিরাজমান। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র জৈন নরনারী কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার উৎসবের দিন এখানে সমবেত হয়। রাজগিরি ও পাবাপুরীতে দশ সহস্র যাত্রী থাকিবার উপযোগী কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে। রাজগিরি জৈনদের পরম প্রিয় স্থান।

মহাভারতের যুগ হইতে মগধের রাজধানী এই রাজগিরিতে বা গিরিব্রজে ছিল। মহাভারত-বর্ণিত প্রসিদ্ধ-প্রতাপশালী মগধের রাজা জরাসন্ধের রাজধানী এই রাজগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও জরাসন্ধের বৈঠক ও মল্লভূমি নামে পরিচিত এবং তাহা হিন্দুদের পরম পুণ্য স্থান।

জরাসন্ধের বৈঠক

ফার্গুসান সাহেব "জরাসন্ধ-কা-বৈঠক" অশোকের পূর্ব্ব-কালের প্রস্তর-নির্ম্মিত সৌধাবলির একমাত্র নিদর্শন এরূপ ধারণা করিয়া বলিয়াছেন—

The only stone building yet found in India that

13—1804 B.

has any pretension to be dated before Asoka's time is one at Rajgir having the popular name of Jarasandha-ka-baithak (H.I.E.A., Vol. I, p. 74).

এই বৈঠক প্রস্তরনির্ম্মিত উঁচু মঞ্চের মতন দেখায়, চারিটি দিক্ সমান মাপের, প্রত্যেক পার্শ্বের মাপ ৮৫ ফুট, ২৮ ফুট উঁচু, তলদেশ হইতে ক্রমান্বয়ে সরু হইয়া উঠিয়াছে। ছাদের মাপ ৭৪ X ৭৪ ফুটে পরিণত হইয়াছে। পরিচ্ছন্ন কাটাই-ছাঁটাই, প্রস্তরখণ্ডগুলি একটির উপর একটি সুকৌশলে স্থাপিত হইয়া সুদৃঢ় সৌধে পরিণত হইয়াছে। কোন মসলা ব্যবহৃত হয় নাই, তথাপি আড়াই হাজার বৎসরের অধিক কাল অটুট রহিয়াছে।
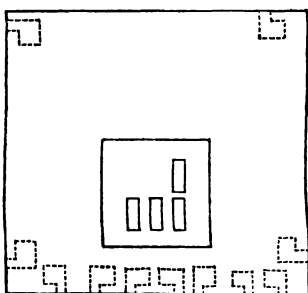
জরাসন্ধের বৈঠক

ইহার মধ্যে ১৫টি কুঠরি রহিয়াছে। প্রতি কুঠরি সমান আয়তনের, দৈর্ঘ্যে ৬।৭ ফুট ও প্রস্থে ৩।৪ ফুট, এখানে জরাসন্ধের

বৈঠকের একটি নক্সা প্রদত্ত হইল। এই নক্সা কানিংহাম সাহেবের প্রণীত নক্সারই অনুলিপি। এখানকার কুঠরিগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা এখনও ব্যবহৃত হয়।

গয়ার বুদ্ধমন্দির কখন্ এবং কাহার দ্বারা প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার সঠিক প্রমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। গয়ার বুদ্ধমন্দির নিশ্চয়ই অশোকের সময়ে বা তাঁহার পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত হইয়াছে। যে বোধিদ্রুমতলে বসিয়া বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহার বংশ এখনও সেই স্থানে রহিয়াছে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে যখন বুকানন হ্যামিলটন গয়াতে এই অশ্বত্থ গাছের তলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সেই স্থানের পুরোহিত মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, অশ্বত্থ বৃক্ষটি ২২২৫ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ বর্ত্তমানে ২৩৪৪ বৎসর) রোপিত হইয়াছিল এবং ১২৬ বৎসর পরে ২৮৯ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার দ্বারা অনুমান হয় অশোকই এখানে মন্দির বা স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই তথ্য মণ্টোগমারী মার্টিনের ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে প্রথম খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

বুদ্ধগয়ার মন্দির

ফা-হিয়ান ভারত-ভ্রমণকালে বুদ্ধগয়াতে বর্ত্তমান আকারের বৃহৎ মন্দির দেখেন নাই, তিনি অশোকের স্থাপিত বিহার দেখিয়াছিলেন, হিউএন সাংও এই কথা বলিয়াছেন। হিউএন সাং ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধগয়াতে আগমন করিয়াছিলেন ; তিনি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের যে ইতিহাস ও বর্ণনা দিয়াছেন তাহাই সর্ব্ব-প্রাচীন প্রামাণিক বর্ণনা। তিনি লিখিয়াছেন—অশোক এখানে একটি

বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহা প্রস্তরের প্রাকার (রেলিং) দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন ; সেই বেড়া বা রেলিং ভারতের সর্ব্ব-প্রাচীন প্রস্তরের রেলিং বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তখন হিউএন সাং রেলিংএর যেমন বর্ণনা করিয়াছেন এখনও সেইরূপ রেলিংএর কতক অংশ বুদ্ধগয়াতে রহিয়াছে। ভারতের সর্ব্ব-প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন এই বুদ্ধগয়ার রেলিংএর উপরই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রারম্ভে যে রহস্যপূর্ণ গাছ-গাছড়া ও সর্পপূজার প্রচলন ছিল তাহারই প্রতীক এই রেলিংএ খোদাই করা রহিয়াছে। "Most attractive of all the ancient remains is the sculptured rail of stone, wherewith Asoka surrounded the 'Vihara' which he had built, for they are the earliest specimens we have of the art in India, and remain to-day as yet untouched by any foreign influence whatever. Prominent therein is that ancient and mysterious worship of Trees and Serpents, the indigenous religion that Buddhism found, took to itself and assimilated"—(I. S. R. P. Budh Gaya).

হিউএন সাং লিখিয়াছেন—অশোকের নির্ম্মিত বিহারের বহু শতাব্দী পরে ১৬০´ ফুট উচ্চ এবং ৬০´ ফুট দীর্ঘ এক বিশাল মন্দির নির্ম্মিত হয়, সেই বিহারের বর্ণনাও তিনি সবিশেষ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে মন্দির দেখা যায় তাহার আকার ও মাপ তদনুরূপ বলিয়া কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন। (আর্কিও-লজিক্যাল রিঃ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫)

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, মহেশ্বরের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া 'অমরাহ' নামে এক ব্রাহ্মণ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অশোক-স্থাপিত প্রাচীন বিহারটির সংস্কার করিয়া বর্ত্তমান আকারের এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু "ডক্‌ট্রান এণ্ড হিষ্ট্রী অব্ বুদ্ধিজম্" গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় ওয়াসিলিউ (Wassilieu) সাহেব বর্ত্তমান আকারের মন্দিরটির নির্ম্মাণের ভিন্ন কাহিনী লিখিয়াছেন এই মন্দির পুণ্য নামে এক রাজপুত্রের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধাচার্য্য উত্তর পুণ্য এবং তাঁহার আর দুই ভ্রাতাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সারনাথের মৃগদাবে এবং অপরজন রাজগৃহের বেণুবনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন, আর পুণ্য স্বয়ং বুদ্ধ গয়াতে এই বিশাল বিহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

কানিংহাম সাহেব কয়েকটি তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন খৃস্টপূর্ব্বাব্দে কুশানরাজ হবিষ্কের দ্বারা এই প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল অনুমান করেন এবং কয়েকটি মুদ্রার উৎকীর্ণ লিপির সাহায্যে এই মন্দিরের অধিকাংশ সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন চতুর্থ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ইহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি দৃঢ়চিত্তে বলিয়াছেন— ভাস্কর্য্যের ও স্থাপত্যের পদ্ধতি অবলোকন করিলে মনে হয় বর্ত্তমান আকারের মন্দিরটি দ্বিতীয় হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে গঠিত হইয়াছে। হিউএন সাং যখন বর্ত্তমান আকারের বিহারের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই এই বিহারের কাঠাম ৬২৯ খৃস্টাব্দে ছিল। তখন এই বিহার আরও কিছু উঁচু ছিল কারণ হিউএন সাং-বর্ণিত যে

বৃহৎ উজ্জ্বল তাম্রের স্বর্ণজলমণ্ডিত কলস বিহারের শিরোদেশে স্থাপিত ছিল তাহার অস্তিত্ব এখন নাই। তিনি যে নীল বর্ণের টালির ও চূণের কাজের স্তূপ এবং বিভিন্ন তলায় তলায় বহু কুলঙ্গীতে বুদ্ধের স্বর্ণমূর্ত্তি স্থাপিত দেখিয়াছিলেন তাহারও কোন চিহ্ন নাই। "A towering pile of blue tiles covered with chunam having many niches in the different storeys filled with golden figures." (Beal's Life of Hiuen Tsiang.)

পক্ষান্তরে অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁহার Gaya and Buddhagaya নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিবিধ তথ্যের দ্বারা সপ্রমাণ করিতে গিয়াছেন যে, বুদ্ধগয়ায় অশোক-নির্ম্মিত কোন চৈত্য-স্থাপত্য অথবা ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। মগধাধিপ রাজা ইন্দ্রাগ্নি মিত্রের ধর্ম্মপ্রাণা বর্ষীয়সী রাণী কুরঙ্গী, রাজা ব্রহ্ম মিত্রের পত্নী নাগ দেবী ও অপর কয়েকজন দাত্রী ও দাতার প্রদত্ত অর্থে তদানীন্তন বোধিদ্রুমের সম্মুখে এক চতুরস্র উন্মুক্ত চৈত্যের মধ্যে এক চতুষ্কোণ বেদী, উহাকে বেষ্টন করিয়া এক চতুষ্কোণ শিলাপ্রাকার, উহার উত্তর-পার্শ্বেও উহার সংলগ্ন একচক্রম্ চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফা-হিয়ানের বুদ্ধগয়া আগমনের পরে এবং হিউএন সাং-এর আগমনের পূর্ব্বে শিব-মহেশ্বরের স্বপ্নাদেশক্রমে জনৈক ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আকারে বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা উহার দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ পুষ্করিণী খনন করেন। প্রায় সেই সময়ে মগধাধিপ রাজা পূর্ণবর্ষণ এই মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান বৃহত্তর আকারে শিলাপ্রাকারটি স্থাপন করেন।

মন্দিরের মধ্যে আরাকান ভাষায় উৎকীর্ণ যে শিলালিপি রহিয়াছে তাহার পাঠে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, "মন্দিরটি ধ্বংসোন্মুখ হওয়াতে ১১০৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশবাসীদের দ্বারা মন্দিরের আমূল সংস্কার হইয়াছিল এবং পুনরায় ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নূতন করিয়া মেরামত ও পুনঃ স্থাপিত হইল।" (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বুদ্ধগয়া'—পৃঃ ২০৯)

বর্ত্তমান ছাঁচের মন্দিরটি ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম সাহেবের তত্ত্বাবধানে ইংরাজ সরকার দুইলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সম্পূর্ণ সংস্কার ও মেরামত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মন্দিরটি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সরু সোজা সরল রেখার আকারে পিরামিডের কল্পনায় নয়তলার তদানীন্তন মন্দিরের ছাঁচ ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন বক্ষে করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। এই সংস্কারের ফলে ভারতের এক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন স্থাপত্যের সেই বিশিষ্ট ধারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

এই মন্দিরের গঠনপদ্ধতিও অভিনব, বৌদ্ধ স্থাপত্যধারার সহিত ইহার বিশেষ সমতা নাই। স্বাধীন ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য ঐতিহাসিক যুগের মতন কয়েকটি যুগে বিভক্ত করা যায়—যেমন মৌর্য্যযুগ (৩২০-১৪৫ খৃঃ পূঃ), শৌঙ্গ, আন্ধ্র (১৫০ খৃঃ পূঃ—২০ খৃঃ), কুষাণ (৫০-৩২০ খৃঃ), গুপ্তযুগ (৩২০-৬০০ খৃঃ), পালযুগ (৯১০-১২০০খৃঃ)।

প্রথম মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক বৌদ্ধ শিল্পধারার একজন প্রধান স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার সময় হইতে বৌদ্ধ স্থাপত্য-ধারা পাঁচ প্রকারে বিভক্ত।

বৌদ্ধ-স্থাপত্যের ধারা
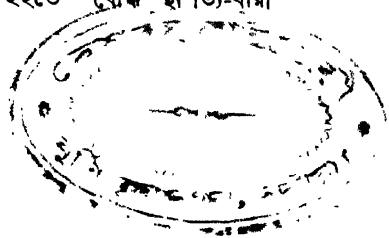
১ম—'স্তম্ভ' বা লাট—এক এক খণ্ড গোল (৫০।৬০ ফুট উচ্চ) মসৃণ প্রস্তরে নির্ম্মিত হইত এবং তাহার শিরে সিংহাদি পশুর শির বা ধর্ম্মচক্র স্থাপিত থাকিত। রাজা অশোক এই প্রকার চুরাশী হাজার চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গাত্রে বুদ্ধদেবের বাণী ও নানা নীতিকথা উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

অবশ্য প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সকল ধর্ম্মের শিল্পীরা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেন। জৈন শিল্পিগণ এইরূপ স্তম্ভ তাঁহাদের মন্দির বা বস্তির প্রাঙ্গণে স্থাপন করিতেন। সেই স্তম্ভগুলি দীপস্তম্ভরূপে ব্যবহৃত হইত। কোন কোন জৈন স্তম্ভের মস্তকে চতুষ্পদ জিনমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। (হিঃ ইঃ ইঃ আঃ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪)

হিন্দু শিল্পিগণ বিষ্ণুমন্দিরে নির্ম্মিত স্তম্ভের উপর বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্ত্তি স্থাপিত করিতেন— তাহাই গরুড়স্তম্ভ; রামচন্দ্রের দেউলে স্তম্ভের শিরে রামভক্ত হনুমানের মূর্ত্তি বসাইতেন; শিবমন্দিরে স্তম্ভের উপর ত্রিশূল স্থাপিত করিতেন; দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেক শিবমন্দিরে যে অতি উচ্চ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় দীপদান করা হয় সেই স্তম্ভগুলিকে ধ্বজস্তম্ভ বলে।

২য়—"স্তূপ"—বুদ্ধদেবের বা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যগণের দেহাংশ নিহিত করিবার জন্য স্তূপ নির্ম্মিত হইত। সাধারণতঃ ইহা অর্দ্ধগোলাকারে নিরেট সৌধরূপে গঠিত হইত, ইহার অভ্যন্তরে কোন স্থান থাকিত না। বৌদ্ধ শিল্পারা ছোট-বড় অসংখ্য স্তূপ-নির্ম্মাণে তাঁহাদের সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সাঁচী, তক্ষশিলা, সারনাথ, ভাহু‘ৎ, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে বৃহৎ বৃহৎ স্তূপ এবং সমগ্র ভারতের নানাস্থানে ছোট ছোট "অর্ঘস্তূপ"

(Votive stupa) এখনও বৌদ্ধ শিল্পীদের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেছে।

৩য়—"প্রাকার" বা রেলিং—সাধারণতঃ স্তূপের প্রদক্ষিণ-পথ বেষ্টন করিয়া পাথরের বেড়া নির্ম্মিত হইত। পবিত্র বৃক্ষ ও স্তম্ভ বেষ্টন করিয়াও রেলিং বা শিলা-প্রাকার (বেড়া) স্থাপিত হইত। ইহার গাত্রে নানা কারুকার্য্য থাকিত এবং অনেক স্থলে ইহাতে বুদ্ধদেবের জীবনলীলার ছবি উৎকীর্ণ হইত।

৪র্থ—"চৈত্য" বা পূজার স্থান—এক একটি দালান নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে পবিত্র বৃক্ষ রোপিত, বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত এবং বুদ্ধদেবের উপদেশবাণী উৎকীর্ণ হইত। এই চৈত্য-দালানে ধর্ম্মাচার্য্যগণ ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এক একটি হলে ৫।৭ হাজার লোক বসিবার স্থান সঙ্কুলান হইত। চৈত্য-দালানের নমুনা অজন্তা, ইলোরা এবং কার্লের গুহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

৫ম—"বিহার" বা মন্দির—ইহা বৃহদায়তনের একটি দালান, তাহার মধ্যস্থলে পূজা-আরতির স্থান, প্রান্তে পবিত্র দ্রব্য রাখিবার জন্য "ডগবা" (ধাতুগর্ভ) বা বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। মধ্য দালান বেষ্টন করিয়া পরিক্রমা-পথ, তাহার পরে ছোট ছোট ঘর নির্ম্মিত হইত। এই সব ঘরে বৌদ্ধ শ্রমণ, ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও পরিব্রাজকগণ অবস্থান করিতেন। দালানে ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রাধ্যয়ন হইত। কোন কোন বিহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইত। যেমন, নালন্দা বিহার।

কিন্তু বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি এই পাঁচটি স্থাপত্যধারার কোন রীতিতে গঠিত নহে। ইহার গঠন ও পরিকল্পনা অভিনব, এমনটি ভারতে আর কোথাও নাই। এই বিশাল মন্দিরের

14—1304B.

প্রথম দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া যেমনই প্রধান প্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায় তাহার সম্মুখেই এক বিরাট্ বুদ্ধমূর্ত্তি বেদীতে স্থাপিত দেখা যায়। মূর্ত্তিটি ব্রহ্মদেশীয় শিল্পীর দ্বারা সেই দেশের আদর্শে গঠিত, সমস্ত দেহ সোনালী রংয়ে মণ্ডিত। বুদ্ধদেব যেন যোগাসনে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় সংসারের দুঃখযন্ত্রণাক্লিষ্ট মানবের পরিত্রাণের চিন্তায় স্তিমিতলোচনে ধ্যানে বসিয়া আছেন। গাত্র যদিও রাজোচিত পরিচ্ছদে আবৃত এবং মস্তকে রাজচ্ছত্র বিরাজিত, তথাপি মূর্ত্তির নয়নদ্বয় ধ্যানীরই মতন শান্ত। ইঁহার প্রশস্ত ললাটে চন্দনের বিষ্ণুতিলক শোভিত, গলায় পুষ্পমাল্য দুলিতেছে। ইনি হিন্দুর নবম অবতাররূপে নিত্য শতসহস্র হিন্দুযাত্রীর নিকট হইতে পূজা ও অর্ঘ পাইতেছেন।

অন্যান্য ঘরে নানা প্রকারে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি সমস্তই আধুনিক যুগের। মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে মেঝে হইতে চার ফুট উঁচু ও পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটি মঞ্চ রহিয়াছে, এই স্থানে বুদ্ধদেব জ্ঞানলাভ করিবার পর আনন্দিত-চিত্তে পূর্ণ সাত দিন বিমুক্ত সুখে ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পাদচারণ করিয়াছিলেন। এবং ইহারই একপ্রান্তে প্রথম যে স্থানে তিনি পদার্পণ করেন সেখানে এক কারুকার্য্যময় পদচিহ্ন ক্ষোদিত রহিয়াছে। কিংবদন্তী আছে, এই পদচিহ্ন পূর্ব্বে নানা মণিমুক্তাখচিত ছিল। ইহার কিছুদূরে উত্তর দিকে বজ্রাসন নামে এক রাজাসন আছে, তাহাও অপূর্ব্ব ও মূল্যবান্ মণি-মরকত দ্বারা মণ্ডিত ছিল, এইরূপ হিউএন সাং লিখিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব পাইবার পরই এই স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই জন্য বৌদ্ধগণ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত এই আসনটিতে অর্ঘ-প্রদান করিতেন।

বুদ্ধমন্দির—বুদ্ধ-গয়া
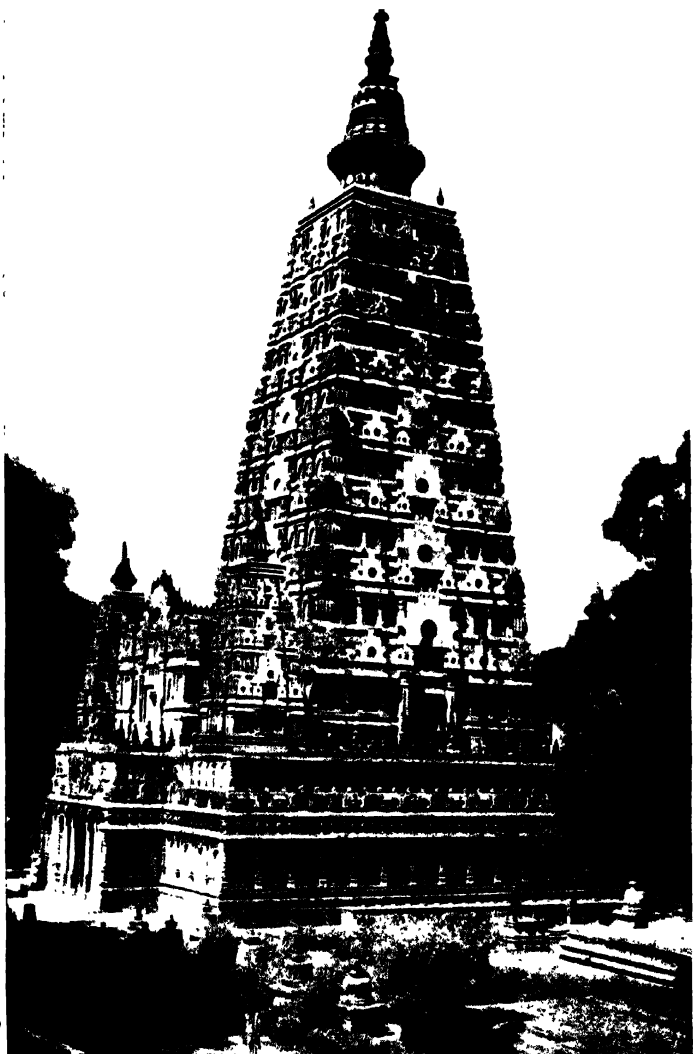
বৌদ্ধ সাহিত্যে এবং জাতক-গ্রন্থে বর্ণিত আছে বুদ্ধদেব যখন তপস্যা করিবার মানসে স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন তিনি উরুবিল্ব গ্রামে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানটি মনোরম শান্তিপূর্ণ যোগিজনবাসোচিত মনে করিয়া সেখানে সাধনার আসন পাতিতে মনস্থ করেন। তখন সে স্থানে অনেক মুনি ও তপস্বী সাধন-ভজন করিতেন। ফল্গুর জল তখনও সাধকদের পদ ধৌত করিত। বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের পর হইতে এই স্থানের আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। সম্রাট্ অশোকের নির্দ্দেশে এই স্থান ফলপুষ্প-শোভিত বৃক্ষরাজি-সমাবৃত হইয়া সুদৃশ্য তপোবনে পরিণত হয়।

এই স্থানের এক বোধি-তরুমূলে আসন পাতিয়া গৌতম দীর্ঘ সাত বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

বোধিদ্রুম

তিনি সাধনবলে অবগত হন মানব নিজের জীবনে অহিংসা, দান, সংযম, পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তির সাধনা করিয়া ইহ-জগতের ক্লেশ, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুরয ন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে এবং জন্মান্তরের হাত হইতে নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হয়। এখনও সেই স্থানে সেই তরু বা তাহার বংশধর বিরাজিত রহিয়াছে। কিংবদন্তী এই—তরুটি অজর অমর। প্রয়াগের অক্ষয়-বটের ন্যায় ইহা যুগে যুগে মানবের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া আসিতেছে।

হিউএন সাং লিখিয়াছেন—এই বোধিদ্রুমের পল্লব বা শাখা কি গ্রীষ্মে কি শীতে শুষ্ক হয় না। তিনি আরও লিখিয়াছেন—অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে একদা এই বৃক্ষ ছেদন করিতে আদেশ প্রদান করেন। যে দিবস সেই বৃক্ষ ছেদন করা হইল, সেই রাত্রেই তাহার মূল হইতে সতেজ-পত্রবিশিষ্ট বহু

শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া তরুবর বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন অনুতপ্ত অশোক পরম শ্রদ্ধার সহিত বৃক্ষটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। প্রস্তরের বেড়ার দ্বারা তাহার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া দিলেন। সেই বেষ্টনীর অংশ এখনও বুদ্ধগয়াতে আছে, সেইগুলি ভারতে রেলিং বা প্রাকার-স্থাপত্যে সর্ব্ব-প্রাচীন নিদর্শন। তৎপরবর্ত্তী গুপ্তযুগের সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য্যমণ্ডিত রেলিংগুলিও দেখিবার বস্তু।

এই বোধিদ্রুম হইতে একটি শাখা ছেদন করিয়া সম্রাট্ অশোক যখন তাঁহার কন্যা সঙ্ঘমিত্তার হস্তে সিংহলে লইয়া যাইবার জন্য প্রদান করেন, সেই অনুষ্ঠানের করুণ কাহিনীর বর্ণনা সকরুণ ও সুললিত ভাষায় মহাবংশ-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সেই বৃক্ষ-শাখা অনুরাধাপুরের বিরাট্ বিহারে রোপিত হওয়ামাত্রই নানা শাখা-প্রশাখায় গজাইয়া উঠে, তদ্দৃষ্টে সিংহলের রাজ-পরিবারের সকলে এবং সিংহলবাসিগণ সঙ্ঘমিত্তার ও তাহার ভ্রাতা মহেন্দ্রের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। গয়ার ন্যায় সিংহলে অনুরাধাপুরে এখনও সেই বৃক্ষ অমর হইয়া বুদ্ধের মহিমা ঘোষিত করিতেছে।

বোধিদ্রুমের সন্নিকটেই গয়ায় মহন্তের বিদ্যাভবন আছে, তাহার গাত্রে যে শিলালিপি আছে তাহার পাঠ—"আমাদের প্রভু ভগবান্ বুদ্ধ যে স্থানে তপঃক্লিষ্ট দেহে দুগ্ধ ও মধু পান করিয়াছিলেন সেই পবিত্রক্ষেত্রেই সম্রাট্ অশোক এই বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" (I.S.R.M., ৮ম খণ্ড).

প্রধান মন্দির হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই ক্ষুদ্রায়তনের অতি প্রাচীন একটি মন্দির দেখা যায় তাহার ভিতর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত। এরূপ সৌম্য মূর্ত্তি গয়াতে আর নাই। মন্দিরের

গাত্রে বুদ্ধদেবের জীবন-লীলার বহু চিত্র সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বুদ্ধের প্রত্যেক জীবনের খেলা এক একটি প্রতিভূ (symbol) দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। তখন মানবমূর্ত্তির আকারে বুদ্ধদেবকে প্রকাশ করা হইত না। যেমন বলগাবিহীন আরোহিশূন্য অশ্ব বুদ্ধের গৃহত্যাগের প্রতীক, বোধিদ্রুম ও বজ্রাসন বুদ্ধের তপস্যার ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির, চক্র প্রথম ধর্ম্মপ্রচারের, স্তূপ নির্ব্বাণ-লাভের, প্রস্ফুটিত পদ্ম বুদ্ধের জন্মের কথার প্রতীক রূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

পাথরের বেড়াগুলিতেও এইরূপ চিত্র ক্ষোদিত আছে। প্রধান মন্দিরের পোস্তায় ও গাত্রে ছোট-বড় অসংখ্য যে-সব বুদ্ধমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে তাহা সমস্তই বর্ম্মার শিল্পীদের ধারায় ক্ষোদিত ; ভারতীয় শিল্পীদের ধ্যানী, প্রশান্ত, কমনীয় স্বর্গীয় তেজঃপূর্ণ, অন্তর্দৃষ্টিযুক্ত সৌম্যমূর্ত্তির মতন চিত্তাকর্ষক না হইলেও এই মূর্ত্তিগুলি দেখিলে, এই স্থানে দাঁড়াইলে এক শান্তির রাজ্যে উপনীত হওয়া যায়। যেন বুদ্ধময় জগৎ—চারিদিকে যেন সেই বৌদ্ধদের মহামন্ত্র "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বলিতে হয়—"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি"।

গয়া যেমন বৌদ্ধদের পরম পবিত্র স্থান, তেমনই হিন্দুদের এক মহাতীর্থ। কানিংহাম ও হাণ্টার সাহেব দেখাইয়াছেন—আদিতে গয়া বৌদ্ধ তীর্থরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে, পরে বৌদ্ধযুগের অবসানের সহিত হিন্দুরা বৌদ্ধদের এই মন্দির দখল করিয়া হিন্দুদের দশ অবতারের অন্যতম নবম অবতার-রূপে বুদ্ধদেবের পূজার প্রচলন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রেরও

এই মত। কিন্তু মহাভারত ও রামায়ণ এই প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে গয়ার বিবরণ আছে। রামচন্দ্র ফল্গুনদীর তীরে বালির পিণ্ড দান করিয়া তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। মহাভারতে দেখা যায় 'গয়' নামে এক রাজর্ষি এই গয়াধামে বিরাট্ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সেই যজ্ঞের পুণ্যফলেই গয়া এমন পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। অন্দর গয়াতে কষ্টি-পাথরের কারুকার্য্যখচিত মন্দিরমধ্যে বিষ্ণুর চরণ রক্ষিত আছে, সেখানে হিন্দুরা ফল্গুনদীর তীরে শ্রাদ্ধ করিয়া অর্ঘ প্রদান করেন। মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই।

অবশ্য ফা-হিয়ান বলিয়া গিয়াছেন—অশোকের সময় হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত গয়াতে বৌদ্ধধর্ম্মের একাধিপত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, ফা-হিয়ান চতুর্থ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তিনিই অশোকের স্থাপিত বোধিদ্রুমের নিকটে বিহারটি দেখিয়াছিলেন। হিউএন সাং ৬২৯ খৃষ্টাব্দে গয়াতে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন ও প্রতিপত্তি দেখিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে হিন্দুপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি গয়া ও বুদ্ধগয়াতে হিন্দুরই প্রতিপত্তি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম মুসলমান-যুগে ভারত হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়, বুদ্ধ-কীর্ত্তি সমস্ত ধ্বংস পায়, কিন্তু বুদ্ধগয়া অন্যান্য স্থানের ন্যায় তেমন বিধ্বস্ত হয় নাই। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের হাতে যখন গয়াধাম স্থায়িভাবে আসিল, তখন বেহারী হিন্দু সেতাব রায়ের হস্তে এই মন্দিরের ব্যবস্থার ভার অর্পিত হইয়াছিল; হিন্দু-মহন্তের হস্তেই তিনি পাকাপাকি ভাবে এই মন্দির অর্পণ করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব দুইলক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার ব্যাপক সংস্কার করেন, তাহার পরই গয়ার মহন্ত এই মন্দির

দখল করেন এবং বুদ্ধদেবের ললাটে বিষ্ণু-তিলক অঙ্কিত করিয়া বিষ্ণুরই অবতাররূপে পূজা, ভোগ ও আরতির সুব্যবস্থা করেন। সরকারও বৌদ্ধদের আপত্তি আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না। কানিং-হাম সাহেব তাঁহার 'মহাবোধি' গ্রন্থের ভূমিকায় এই বিবরণ সুস্পষ্ট ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।

বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের প্রকাণ্ড মূর্ত্তির সম্মুখে শত-সহস্র হিন্দু নরনারী বিষ্ণুর অবতার-জ্ঞানে এই বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও অর্ঘ প্রদান করেন এবং তাঁহাকে পূজান্তে—

"অশ্বত্থরূপিণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষং বৃক্ষরাজধরং হরিম্॥"

মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। মন্ত্রের অর্থ— বৃক্ষরূপধারী অশ্বত্থরূপী দেবতা শঙ্খচক্রগদাধর পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে প্রণাম করি। তৎপরে তাঁহারা অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে জলপ্রদান করিয়া প্রণাম করিয়া শান্তি বোধ করেন।

আবার শত-সহস্র দেশ-বিদেশের বৌদ্ধ নরনারীও সেই মূর্ত্তির চরণে অর্ঘপ্রদান ও দীপদান করেন।

ই. আই. রেলের গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে গয়া ষ্টেশনে নামিয়া গয়াধামে উপনীত হইতে হয়। সেখান হইতে ৬ মাইল মোটরে গেলে বুদ্ধগয়াতে যাওয়া যায়।

পথ

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে ত্রিশ মাইল গেলে বুদ্ধগয়াতে প্রথম উপস্থিত হইয়া তৎপরে গয়াতে উপনীত হওয়া যায়। পথে রামশিলা, ব্রহ্মযোনি পর্ব্বত। তাহার উপরে উঠিবার জন্য সুন্দর বাঁধান প্রস্তরের সোপান আছে।
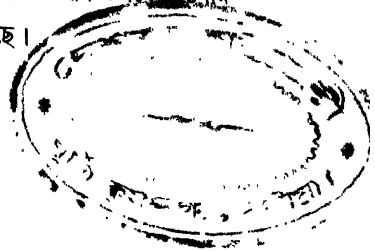
বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দির

গোবিন্দদেবের মন্দির মধ্যযুগে উত্তর-ভারতের হিন্দু স্থাপত্যের অনুপম কীর্ত্তি। গোবিন্দদেবের মন্দির এ যুগের বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ্। বর্ত্তমান বৃন্দাবন যেমন বাঙ্গালীর প্রিয় স্থান তেমনই বাঙ্গালীর দ্বারাই বৃন্দাবনের কীর্ত্তি বিশ্ববাসীর নিকট প্রচারিত এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের দ্বারাই আধুনিক বৃন্দাবন গঠিত, বাঙ্গালার গৌরব প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর দ্বারাই ইহা স্থাপিত।

বৃন্দাবন হিন্দুর অতি প্রাচীন তীর্থস্থান। ব্রজধাম কেবল হিন্দুর নিকট নহে, অতি পূর্ব্বকাল হইতে জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকটও পুণ্যক্ষেত্র ও প্রিয় স্থানরূপে গণ্য। মহাভারতে শূরসেন বলিয়া যে স্থান বর্ণিত আছে, তাহারই মধ্যে ব্রজধাম বা বৃন্দাবন। রামায়ণে লিখিত আছে যে, মধুদৈত্য মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া অপূর্ব্ব অস্ত্র ত্রিশূল লাভ করেন। সেই ত্রিশূল যতক্ষণ তাঁহার হস্তে থাকিবে ততক্ষণ কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না—মধুদৈত্য শিবকে তুষ্ট করিয়া এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ত্রিদিব জয় করিয়া যে সমস্ত ধনরত্ন লাভ করেন তাহারই দ্বারা তাঁহার রাজধানী মধুপুরী নির্ম্মাণ করেন—সেই মধুপুরীই বর্ত্তমান মথুরা। সেই প্রদেশের মধ্যেই বৃন্দাবন।

মধুর পুত্র লবণকে বধ করিয়া রামের অনুজ শত্রুঘ্ন এই মধুপুরী দখল করেন, এই স্থানকে আর্য্যদের বাসোপযোগী

করিয়াছিলেন। তদবধি এই প্রদেশ শূরসেন বা স্থসেনা বলিয়া খ্যাত হয় (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৮৩ সর্গ)। যেখানে মধুদৈত্য মধুপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই শত্রুঘ্ন শূরসেনদিগের রাজধানী মথুরাপুরীর পত্তন করিয়াছিলেন—সেই পুরী যমুনা-তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই আর্য্য-স্থানে মধুপুরীর প্রসিদ্ধি ছিল। মথুরা ও বৃন্দাবনের ইতিহাস বহু রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ভবিষ্যপুরাণের ১৩৮।৫ ও বরাহ-মিহিরের বৃহৎ-সংহিতার ৬০।১৯ শ্লোকের বর্ণনায় জ্ঞাত হওয়া যায়—"বিষ্ণুর পূজক ভাগবতগণ, সূর্য্যের পূজক মগ-ব্রাহ্মণগণ, শিবের ভস্মধারী দ্বিজগণ, মাতৃগণের মাতৃমণ্ডলবিৎ ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মার বেদবিৎ বিপ্রগণ, তীর্থঙ্কর জিনের শ্বেতাম্বর জৈনগণ ও বুদ্ধের সর্ব্বত্যাগী শ্রমণগণ মথুরাপুরীর উপাসক ছিলেন।"

মথুরার শক-নরপতিগণের অভ্যুদয় ঘটে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। তাঁহাদের সময়েও ব্রজমণ্ডলে ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ-প্রতিপত্তি খুবই ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সৌর হূণরাজগণের প্রভাব-বিস্তারের সহিত মথুরা-বৃন্দাবনে সৌরগণের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়. তখন সেখানে অনেক সূর্য্যমন্দির ও সূর্য্যতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত ব্রজ-পরিক্রমা গ্রন্থে (পৃঃ ১॥৶০) বিশদভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারই কয়েক শতাব্দী পরে মুসলমানগণের অত্যাচারে সমস্ত প্রাচীন মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া যায়। বৃন্দাবনের সূর্য্যতীর্থ, সূর্য্যকুণ্ড, সূর্য্যালয় ও মগহেরা সেই প্রাচীন স্মৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করে।

15—1304B.

ব্রজমণ্ডলের নানা স্থান খনন করিয়া যে সমস্ত প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি দেখিলে ব্রজমণ্ডলে জৈনদেরও প্রাদুর্ভাবের কথা অবগত হওয়া যায়। জৈনদের ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে উনবিংশ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও একবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ মথুরায় জন্মগ্রহণ ও মোক্ষলাভ করেন। ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৭৭ অব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন; তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বে ব্রজমণ্ডলে জৈন-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার সম্যক্ বর্ণনা—Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes (Vol I, p. 165) গ্রন্থে পাওয়া যায়। জৈন-রমণীগণ ব্রজমণ্ডলে নানা কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবং কুমার-মিত্রার দানের ও উপদেশের উল্লেখ কতকগুলি শিলালিপিতে আছে। (Epigraphia Indica, Vol. I). খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্রজমণ্ডল জৈন-সম্প্রদায়ের প্রধান স্থানরূপে গণ্য হইত।

বৌদ্ধ যুগের অনেক কীর্ত্তি ব্রজমণ্ডলে ছিল। সম্রাট্ অশোকের আধিপত্যকালে উপগুপ্ত মথুরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। সম্রাট্ অশোক এখানে চারিটি বৃহৎ স্তূপ এবং মথুরার নিকটবর্ত্তী স্থানে শাক্যশিষ্য শারীপুত্র, মোগ্গল্লান, পূর্ণ-মৈত্রায়ণী-পুত্র, উপালী, আনন্দ, রাহুল, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতির স্মরণার্থ কতকগুলি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং, যখন ৭ম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি সেই সকল কীর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ৫টি বৃহৎ হিন্দু-মন্দিরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবনের উল্লেখ দেখা যায় না। (মাথুর-কথা—পৃঃ ১৫১)

তৎপরবর্ত্তী কালে হিন্দুর প্রভাবে ও হিন্দুশিল্পিগণের নৈপুণ্যে

কারুকার্য্যখচিত সুদৃশ্য বহু বৃহৎ বৃহৎ বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মিত হওয়ায় ব্রজমণ্ডলের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মথুরা ও বৃন্দাবন ভূতলে অমরাবতী বলিয়া প্রকৃতই একদিন প্রতীয়মান হইয়াছিল। ভক্ত বৈষ্ণবগণ যেখানে যাহা কিছু পাইয়াছিলেন তাহা দিয়া ব্রজের দেব-মন্দির সজ্জিত করিয়াছিলেন, এবং মহামূল্য মণি-মাণিক্যদ্বারা ভগবানের বরাঙ্গ বিভূষিত করিয়াছিলেন। ব্রজমণ্ডলের সেই সব অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-শিল্প-নিদর্শন বিশ্ববাসীকে বিমুগ্ধ করে।

১০১৮ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর গজনীর সুলতান মামুদ যমুনা পার হইয়া প্রথমবার মথুরা লুণ্ঠন করেন। তিনি পুনঃ পুনঃ ব্রজমণ্ডল আক্রমণ করিয়া যাবতীয় ধনরত্ন ও সম্পদ্ লুণ্ঠন করেন এবং সমস্ত শিল্পৈশ্বর্য্য বিধ্বস্ত করিয়া ব্রজমণ্ডলকে হতশ্রী করিয়া দেন। তদবধি ভারতের গৌরব-রবি ম্লান হইয়া যায়। গজনীর মামুদের পার্শ্বচর নিজামউদ্দীন আহম্মদ তাঁহার 'তবকাত-ই আকবরী তারিখ-ই যামিনি' গ্রন্থে ব্রজমণ্ডলের অতুল ঐশ্বর্য্য ও শিল্পসম্পদের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন :—

"দুর্গের সম্মুখে স্থাপত্যশিল্পের অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ আকাশভেদী একটি অপূর্ব্ব মন্দির। এরূপ সুন্দর ও সকল শোভার আস্পদ অপূর্ব্ব দেবালয় সুলতান আর দেখেন নাই। মন্দিরের বহির্দেশে নানারত্নখচিত বিবিধ ক্ষোদিত মূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল। সেই গগনস্পর্শী মন্দিরই তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মন্দির বলিয়া খ্যাত ছিল। সুলতান আরও দেখিয়াছিলেন, রাজপথের দুই পার্শ্বে ও যমুনাকূলে উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যে অলঙ্কৃত পাষাণময় দুই সহস্র দেব-মন্দির। প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরে বহুমূল্য মণিমাণিক্যমণ্ডিত

দেবমূর্ত্তি শোভিত। অধিকাংশ দেবমূর্ত্তি সুবর্ণময় ও হীরকখচিত-অলঙ্কার-বিমণ্ডিত। মন্দিরের অলিন্দগুলি সু:শস্ত ও লৌহ-শলাকা-দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের বহির্ভাগ এবং চূড়াগুলিও অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। নগরের মধ্যভাগের দেব-মন্দির অপর সকল মন্দির হইতে উচ্চ, এবং বিচিত্র বর্ণের মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত।" (ব্রঃ পঃ, পৃঃ ২।৶০)

এই ভাস্কর্য্য দেখিয়া সুলতান বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু গজনীপতি বিশ্বের এই অতুল সম্পদ্ রক্ষা করা অনুচিত মনে করিয়া নির্ম্মমভাবে এগুলি ধ্বংস করিয়া দেন। বৃন্দাবনের উল্লেখ তাহার পর হইতে মহাপ্রভুর আগমন কাল পর্য্যন্ত বিশেষ পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনে মন্দির ও মূর্ত্তি না থাকিলেও বৈরাগী ও ভগবৎ-প্রেমিকদের বাসস্থানরূপে ব্রজমণ্ডল চিরকাল গরীয়ান্। সেই সব প্রেমিক সাধকগণ যুগে যুগে ভগবৎ-প্রেমের যে অনুপ্রেরণা প্রদান করিয়া থাকেন তাহা মানবের চিত্ত বিগলিত করিয়া দেয়। সেই ভাবে উদারপ্রাণ আকবর বাদশাহ হিন্দু বৈষ্ণব সাধনায় বিগলিত হইয়াছিলেন।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে একদিন যখন আকবর বাদসাহ বজরা-আরোহণে যমুনা-বক্ষে বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে মানসিংহ, রায়সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দু রাজা ও সেনাপতি ছিলেন। নৌকা হইতে হরিদাস স্বামীর সুললিত স্তোত্রগীত শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া তিনি বৃন্দাবনে অবতরণ করেন ও বৈরাগীদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও দীনাবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনি সমুপস্থিত হিন্দু সামন্ত ও রাজাদিগকে বৃন্দাবনধামে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তৎপরেই রূপ-সনাতন

আদি গোস্বামিগণের চেষ্টায় ও সাধনায় বৃন্দাবনের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৃন্দাবন অচিরে নানা সমুন্নত ও সুগঠিত মন্দির বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীমান্ হইয়া উঠে। (মাঃ কথা, ২৫৩ পৃঃ)

এক শতাব্দী পরেই ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব মথুরা-ধ্বংসের সহিত বৃন্দাবনের গোবিন্দজী, মদনমোহনজী, রাধাবল্লভজী প্রভৃতির সুন্দর দেব-দেউলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার হুকুম প্রদান করেন। আজ বৃন্দাবনে যে সব দেব-দেউল ও দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রায় সমস্তই ইংরাজ আমলে নির্ম্মিত হইয়াছে। কেবল গোবিন্দ, মদনমোহন ও গোপীনাথের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হিন্দু-স্থাপত্যের পূর্ব্ব গরিমা আজও প্রকাশ করিতেছে। এই সব দেব-দেউল যুগে যুগে বিধ্বস্ত হইলেও সেই সব দেব-দেউলকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুর সংস্কৃতি, জ্ঞান ও সাধনার যে বিকাশ হইয়াছিল তাহা এখনও হিন্দুকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সেই গোবিন্দজীর মন্দিরের ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে আবশ্যক।

যখন চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার চিহ্ন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। ভাবাবেশে ও ভগবৎ-প্রেরণায় তখন তিনি লীলাক্ষেত্রগুলি এক এক করিয়া চিহ্নিত করিতে লাগিলেন। পরে তিনি রূপ ও সনাতনের উপর বৃন্দাবন-গঠনের ভার অর্পণ করিলেন। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে রূপ-সনাতনের দ্বারা লুপ্ততীর্থ বৃন্দাবনের উদ্ধারের বর্ণনা রহিয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী 'গোমা' নামক স্তূপ হইতে 'গোবিন্দদেব'মূর্ত্তি ও ব্রহ্মকুণ্ড হইতে 'বৃন্দা'মূর্ত্তি, সনাতন গোস্বামী মহাবন হইতে 'মদনগোপাল'মূর্ত্তি

ও শ্রীমধুপণ্ডিত বংশীবটের নিকট হইতে ‘গোপীনাথ’মূর্ত্তি পাইয়া তাহা স্থাপন করেন। এইরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চেষ্টাতেই ব্রজধাম আবার হিন্দু-জগতের প্রসিদ্ধ স্থানে পরিণত হইয়াছে এবং এই কারণে বাঙ্গালীর যশ ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়াছে।

সনাতন ও রূপ গোস্বামী ১৫৭৩ সংবতে (১৫১৬ খৃষ্টাব্দে) বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। ১৫৯২ সংবতে বা ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা একাদশী তিথিতে ‘গোবিন্দদেব’ রূপ গোস্বামীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন। অম্বরাধিপতি মানসিংহ অজস্র অর্থব্যয়ে গোবিন্দদেবের অত্যুচ্চ, সুন্দর, সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ লাল পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের এই মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল। মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত মন্দির-নির্ম্মাণকারী শিল্পীদের নামযুক্ত একখানি হিন্দী শিলালিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রাজা মানসিংহ দ্বারা এই মন্দির ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গ্রাউস্ সাহেব ইহার পাঠ নিম্নরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন :—

“সংবত ৩৪ শ্রী শকবন্ধ অকবর শাহ রাজ শ্রীকর্মকুল শ্রী পৃথিরাজাধিরাজ বশ মহারাজ শ্রী ভগবন্তদাসসুত শ্রীমহারাজাধি-রাজ শ্রী মানসিংহদেব শ্রীবৃন্দাবন জোগপীঠস্থান মন্দির করাজৌ শ্রীগোবিন্দদেব কো কাম উপরি শ্রীকল্যাণ দাস আজ্ঞাকারী মাণিকচন্দ চোপাড়ু, শিল্পকারি গোবিন্দদাস দীলবলি কারিগরু দঃ গোরষদসুবোংভবল ॥”

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৪৫ সালের চতুর্থ সংখ্যার ২১২ পৃষ্ঠায় ডাঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো মহাশয় ইহার বাঙ্গালা করিয়াছেন :—“শ্রীবিক্রমাদিত্য আকবর শাহ রাজ-সংবৎ (regnal

year) চতুস্ত্রিংশ বর্ষে কূর্ম্মকুলোদ্ভব [কচ্ছবাহ=কচ্ছপঘাত] রাজাধিরাজ শ্রীপৃথীরাজ-বংশজাত মহারাজ শ্রীভগবন্ত দাস-সুত মহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহ দেব-কর্ত্তৃক যোগপীঠস্থান শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের এই মন্দির নির্ম্মিত হইল। [ইহার] কাম-উপরি (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) শ্রীকল্যাণ দাস, আজ্ঞাকারী [পরিচালক] শ্রীমাণিকচাঁদ চোপাড়ু (?), শিল্পকারী [architect] গোবিন্দদাস…"

তিনি এই পাঠ হইতে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, "সম্রাট্ আকবর হিন্দু ও মুসলমান উভয় স্থাপত্যধারার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয়তাদ্যোতক নূতন যে স্থাপত্যকলা প্রচলিত করিয়াছিলেন এবং যাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার ফতেপুর সিক্রী—সেই নূতন ধারা অনুসারে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। গম্বুজাদি-নির্ম্মাণে মুসলমানেরাই অধিকতর দক্ষ ছিল। সুতরাং, মনে হয়, হিন্দু গোবিন্দদাস ছিল architect এবং 'দিলবর' নামক ব্যক্তি ছিল কারিগর অর্থাৎ প্রধান রাজমিস্ত্রী।"

মণ্ডপের পশ্চিমভাগে একটি সংস্কৃত প্রশস্তি লেখা ছিল। উহার ভগ্নাংশটুকু গ্রাউস্ সাহেবের সময়েও পাঠোদ্ধারের প্রায় অযোগ্য ছিল। উহা হইতে জানা যায়, ১৬৪৭ বিক্রমাব্দে (১৫৯০ খৃষ্টাব্দে) কচ্ছবাহ-রাজ মানসিংহ রূপ-সনাতন গুরুদ্বয়ের নির্দ্দেশানুসারে এ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১০) লিখিয়াছেন যে, সনাতন গোস্বামীর মৃত্যু ১৫৫৮ এবং রূপ গোস্বামীর মৃত্যু ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে হইয়াছিল।
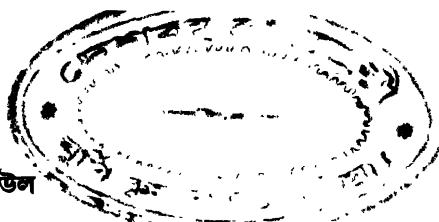
কিন্তু গ্রাউস্ সাহেব তাঁহার মথুরার পুরাবৃত্ত-সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দজীর মন্দিরের নক্সার সহিত বহু য়ুরোপীয় গির্জ্জার সাদৃশ্য থাকায় মনে হয়, যে স্থপতি ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তিনি য়ুরোপীয় জেস্যুইট ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন; বাস্তবিক আকবর বাদশাহের সভায় বহু জেস্যুইট উপস্থিত থাকিতেন।" (F. S. Growse's 'Mathura', p. 242).

গোবিন্দজীর মন্দির পঞ্চচূড়া-শোভিত ছিল। পাশ্চাত্ত্য-স্থাপত্যের ছাপ এই মন্দিরে ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়াটি বহু দূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই গোবিন্দজীর মন্দিরের পূর্ব্বোক্ত শিলালিপি হইতে প্রমাণ হয় যে, রূপ-সনাতনের ইচ্ছানুসারে মহারাজ মানসিংহ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালী গোবিন্দদাস ইহার প্রধান স্থপতি ছিলেন। বিদেশীর ছাপ এই মন্দিরের ভাস্কর্য্যে বা স্থাপত্যে যে কখনও ছিল মন্দিরের নিম্নাংশ দেখিলে তাহা মনে হয় না।

প্রবাদ আছে যে গোবিন্দজীর মন্দির এত বৃহৎ ও উচ্চ ছিল যে মন্দিরের মধ্য-চূড়ার শিরে যে দীপ জ্বালা থাকিত তাহা আগ্রার দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদ হইতে আওরঙ্গজেব দেখিতে পাইতেন। একদিন তিনি এই আলোক কোথায় প্রজ্বলিত হয়, তাহা উজীরকে জিজ্ঞাসা করেন। উজীর বাদসাহকে বলেন, বৃন্দাবনে কাফেরদের যে মন্দির আছে তাহারই চূড়ার উপর প্রজ্বলিত দীপের আলোকরশ্মি দেখা যায়। দেববিগ্রহদ্বেষী আওরঙ্গজেব অবিলম্বে সেই মন্দিরের উচ্চ চূড়া ভাঙ্গিয়া তাহার উপর মসজিদ
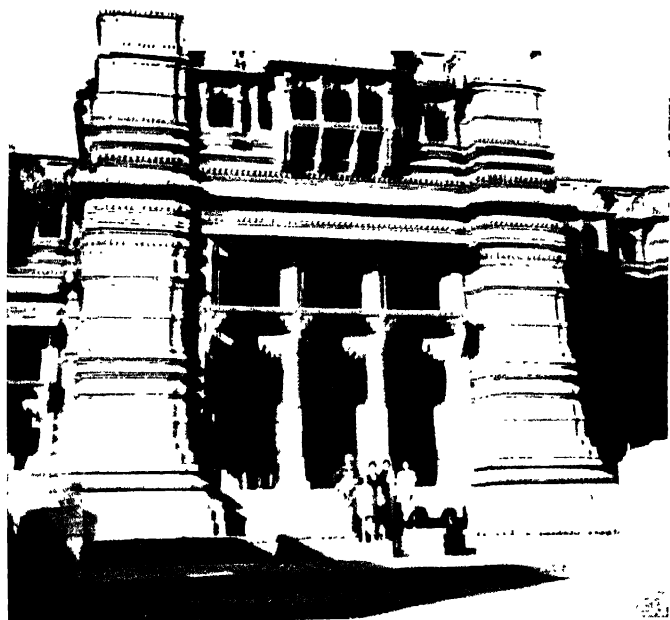
গোবিন্দজীর মন্দির—বৃন্দাবন

নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন এবং তাহা ভাঙ্গিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। মুসলমানগণ মন্দিরের চূড়া কয়টি ভাঙ্গিয়া দিল এবং কথিত আছে আওরঙ্গজেব মন্দির ও নাটমন্দিরের বিস্তৃত ছাদের উপর নমাজ পাঠ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ মন্দির ভগ্ন করিতে আগমন করিতেছে সংবাদ পাইবামাত্র পুরোহিতগণ পূর্ব্বেই গোবিন্দজীর বিগ্রহটি লইয়া অম্বরে পলায়ন করেন। তদবধি গোবিন্দজীর পূজারীগণ অম্বরে এবং পরে জয়পুরে মনোহর গোবিন্দজীর বিগ্রহটির পূজা করিতেছেন।

আওরঙ্গজেব কোন্ বৎসরে বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দির ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও, খুব সম্ভব ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের রমজান মাসে তাহা ভাঙ্গা হয়। কারণ এই সময়ে সম্রাট্ মথুরার কেশবজীর মন্দির ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজ মানসিংহ গোবিন্দজীর পূজা ও সেবার জন্য বিপুল ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন। জয়পুরের মহারাজেরা এই মন্দিরের পুরুষানুক্রমিক অভিভাবক। ইহার জমিদারীর আয় মাসিক প্রায় ৪,৫০০৲ টাকা। বৃন্দাবনের রাধাবাগ ও অনেক বাড়ীও গোবিন্দজীর সম্পত্তি। পাইকপাড়ার লালা-বাবুর মন্দিরের জমিও গোবিন্দজীর জমিদারী হইতে খরিদ করা হইয়াছে। লালাবাবু পাইকপাড়ার রাজা ছিলেন। বৃন্দাবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ইঁহারই জমিদারী। বঙ্গদেশস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের সাধনায় ও অর্থে আধুনিক বৃন্দাবনের দেবালয়গুলি গঠিত হইয়াছে।

16—1804 B.

ফার্গুসান সাহেব গোবিন্দজীর মন্দিরের স্থাপত্যের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন,—" It is one of the most interesting and elegant temples in India, and the only one, perhaps, from which a European architect might borrow a few hints." (H.I.E.A., Vol. II, p. 156).

মন্দিরটির আয়তন বিশাল, ইহার নাটমন্দির বা চাঁদনীর আয়তন ১১৭' পূর্ব্ব ও পশ্চিমে এবং ১০৫' উত্তর ও দক্ষিণে, ইহা খৃষ্টীয় ক্রশের আকার-বিশিষ্ট। অভ্যন্তরের গঠন ও ভাস্কর্য্য নিখুঁত। পূর্ব্বেকার অন্তরালা বা গর্ভমণ্ডপ এখন সংস্কৃত হইয়া মন্দির-রূপে ব্যবহৃত হইলেও পূর্ব্বমন্দিরের আকারের কোন আভাস নাই। ইহার সুদৃঢ়, অত্যুচ্চ শিখর আওরঙ্গজেব বাদসাহের সৈন্যগণ ধ্বংস করিয়া দিলেও নিম্নের অবশিষ্ট অংশের স্থাপত্য যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই সুগঠিত।

মিঃ গ্রাউসের ধারণা, ইহার শিখর পঞ্চচূড়া-বিশিষ্ট ছিল। গর্ভমন্দির, অন্তরালা, নাটমন্দির ও পশ্চাতের দুইটি ক্ষুদ্রাবয়ব ভজনালয়ের উপরই এই পঞ্চশিখর ছিল। তাহাই ভাঙ্গিয়া এই সুবৃহৎ মন্দিরের উপরতলে এক 'ইদগাহ্' নির্ম্মাণ করা হয়। মেরামতের সময়ে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'ইদগাহ্' ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। (Growse's 'Mathura,' 2nd Ed., pp. 223-224).

ক্রসের মত চাঁদনীর চতুর্ভুজে যে খিলান-যুক্ত ছাদ এখনও বর্ত্তমান, তাহার এক একটি স্প্যানের (Span) মাপ ২৩½ ফুট, কিন্তু মধ্যেরটির স্প্যান ৩৫ ফুট, ইহা অতি উৎকৃষ্ট গথিক খিলানের পরিকল্পনারই অনুরূপ।

মন্দিরের বাহিরের পরিকল্পনা, নক্সা ও কারুকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট। ফাগুর্সান দেখাইয়াছেন প্রত্যেক কোণই অতি সুন্দর ও সম-মাপে ভাঁজ হইয়াছে। জানালা ও ফোকরগুলি বেশ বড় এবং অতি আরামদায়ক এবং ছবির মতন সাজান। খাড়া সোজা রেখায় লাল পাথর বিভক্ত হইয়া সজ্জিত আছে। ইহাই মন্দিরের স্থাপত্যের বিশেষত্ব। এখানে ঘন ঘন ভাঁজ ও কোণ দ্বারা ইহার কারুকার্য্য সরল ও মনোরম হইয়াছে। সাধারণতঃ দেব-দেউলের গাত্রে যে লতা-পাতা ও মূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখা যায় তাহা এখানে নাই। মন্দিরের এক পার্শ্বের চিত্র ও ছাঁচ বেশ সাদাসিধা ভাবে গঠিত হওয়াতে ইহা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। মন্দিরের বাতায়নের সম্মুখস্থ বারাণ্ডাগুলি অভিনব ধারায় গঠিত এবং অতিশয় সুদৃশ্য। উত্তর-ভারতে আধুনিক যে সমস্ত মন্দির দেখা যায় তাহার মধ্যে গোবিন্দজীর মন্দির যেমন সাদাসিধা, তেমনই সুদৃঢ় ও সুন্দর; ইহা মধ্যযুগের হিন্দু-স্থাপত্যের অনুপম কীর্ত্তি।

বৃন্দাবনে উপনীত হইবার জন্য আগ্রা হইতে বি. বি. সি. আই. রেলপথে মথুরানগরে নামিয়া একাতে বা ছোট রেল লাইনে আট মাইল যাইতে হয়। সুবিস্তৃত যমুনা-কূলে বৃন্দাবন বিরাজিত। বৃন্দাবনের মদনমোহন, গোপীনাথ ও যুগলকিশোরের মন্দিরসমূহ প্রাচীন এবং সাহাজীর, লালাবাবুর, সেঠীদের মন্দিরগুলি আধুনিক শিল্পকলা ও স্থাপত্যের নিদর্শন।
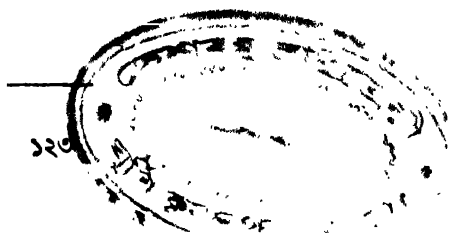
মথুরাপুর

বাঙ্গলা দেশ নদী-মাতৃক স্থান, বাঙ্গলার পলি মাটীতে কোন সৌধ চিরস্থায়ী হয় না। দক্ষিণ বাঙ্গলার জনপদ নদীর তীরেই গঠিত হইত। নদীর গতি অস্থায়ী, ভাঙ্গন বেশী, তাই স্থায়ী সৌধ, দেউল বা হর্ম্ম্যের কারুকার্য্য-নিদর্শন অতি বিরল। জল-বায়ুর ও 'নোনা' ধরার দোষে দেউলগুলি অবিকৃত থাকে না। বাঙ্গলায় প্রস্তরের অভাবে সৌধ-নির্ম্মাণের জন্য ইষ্টকই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত, সেইজন্য বাঙ্গলার শিল্পীদের নৈপুণ্যের প্রাচীন নিদর্শন অতি বিরল; ৩।৪ শত বৎসরের অধিক পুরাণ অট্টালিকা বা দেব-দেউলের পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙ্গলার শিল্পীরা চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই স্বীয় মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য বেশী পরিমাণে দেখাইয়াছিল। বর্ত্তমানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হইতেছে। পাল ও সেন রাজত্বকালের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের আদর্শ ও পদ্ধতির সঙ্গে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের সম্বন্ধ ও বাঙ্গলার শিল্পের প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। অধ্যাপিকা ডাক্তার ষ্টেলা ক্র্যামরিশ, পি-এইচ. ডি. (ভিয়ানা) স্বর্গীয় দীনেশ সেন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—
"The indigenous and original character of Bengal art has become known mainly in its paintings (Pata & book-covers) and but recently also in its sculpture (Paharpur, 7th Century). Its connection and leading role in image-making with the rest of Aryabarta is amply illustrated by the

sculptures of the Pal and Sen ages at that place. It also influenced the further East, and Paharpur must be considered as the most convincing monument preserved; unmistakably it proves that the temples of Khmer greatness are unthinkable without this prototype." 'বৃহৎ বঙ্গ', ভূমিকা—২॥/৹ ।

যদিও আকাশচুম্বী হর্ম্ম্য ও দেউলের উপর বাঙ্গলার শিল্পি-গণের বিজয়-নিশান উড্ডীন নাই, তথাপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত গৃহে ধীমান্ ও বীতপাল বাঙ্গালী ভাস্করেরা কলালক্ষ্মীর সাঁঝের দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। বাঙ্গলার খড়ের ঘরের চার দফা ভাজে অতি ঢালু চাল এবং তাহার জল চারি ধারে চাঁচা দিয়া গড়াইয়া পড়িবার রীতিতে প্রস্তুত করিবার প্রথা বাঙ্গলার নিজস্ব স্থাপত্য-কৌশল। এ প্রকার সহজে জল গড়াইয়া পড়িবার প্রথাতে ছাদ নির্ম্মাণ করা বৃষ্টিপাত-বহুল বাঙ্গলা দেশেরই
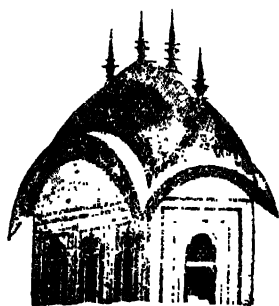
খড়ের চালের অনুকরণে ইষ্টকের মন্দির

পরম উপযোগী। ঐ প্রকার ছাদের গঠনে বহু মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ছাদ-গঠন বাঙ্গলার স্থপতি ও

শিল্পাদের খেয়ালমাত্র নহে, ইহা দস্তুরমত বৈজ্ঞানিক প্রথায় ও পরিকল্পনায় গঠিত। হ্যাভেল সাহেব "এনসিয়েণ্ট এণ্ড মিডিইভেল আর্কিটেকচার অব্ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"The peculiar double curvature given to these Bengali roofs and drawing out of the eaves at the four corners of the cottage are not mere freaks of the unpractical oriental builder, but thoroughly scientific inventions designed for throwing off heavy rains."

বাঙ্গলায় অতিরিক্ত মুষল ধারায় বারিপাতের অনিষ্ট হইতে মন্দির ও মসজিদগুলির ছাদ অটুট রাখিবার জন্য প্রাচীন ইষ্টক ও প্রস্তরের মন্দির এবং মসজিদগুলির পাকা ছাদও এই খড়ের ঘরের চালের অনুকরণে ও প্রথাতে নির্ম্মিত হইত। বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির অনুকরণে সমতল ছাদ, বাঙ্গলা দেশের প্রচুর বৃষ্টিধারার বেগ সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্যই সরকারী পূর্ত্ত বিভাগকে (পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট) প্রতিবৎসর সরকারী হর্ম্ম্যগুলির ফাটা ছাদ মেরামতের জন্য প্রচুর অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিতে হয়। পূর্ত্ত-বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারগণ বাঙ্গলার চিরন্তন প্রথায় ছাদ-নির্ম্মাণের পদ্ধতি উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গলাদেশের আবহাওয়ার অনুপযোগী সমতল ছাদ প্রস্তুত করিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। কিন্তু হ্যাভেল সাহেব তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"The progressive European, rather than learn anything from the Hindu builder, endures patiently the leaky roofs which the British engineer puts over

his head in the plains of Bengal." (Havell's 'Ancient & Medieval Architecture of India', p. 22).

এই প্রকার চারচাল বা আটচাল-বিশিষ্ট ছাদের নিদর্শন ভারুটের ও সাঁচীর স্তূপের বেড়ার (রেলিংএর) কারুকার্য্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

মাদ্রাজ প্রদেশের মহাবলিপুরমে দ্রৌপদীর রথাকৃতি মন্দির বাঙ্গলার চালা ঘরেরই অনুকরণে নির্ম্মিত। বার্জ্জেস্ সাহেব

দ্রৌপদীর রথ—মহাবলিপুরম্

বলিয়াছেন, বাঙ্গলা দেশ হইতে এই ভাবের মন্দিরাদি ও গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনুকৃত হইয়াছে।

সমতল ছাদের জলপড়া বন্ধ করিতে হইলে ছাদের ঢাল প্রচুর দিতে হইবে। অবশ্য ঢালু চারচালা বা আটচালার ছাদ খড়ের, টিনের ও কাষ্ঠেরই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখনও সে পদ্ধতি প্রচলিত আছে। রীজ্ ডেভিস্ সাহেব বলিয়াছেন যে, পালি সাহিত্যে লেখা আছে যে বড় বড় প্রাসাদের ছাদ সমতল হইত। তাহাদের "উপরি-পাসাদাতলা" বলা হইত। সাধারণতঃ বাঙ্গলাদেশে খড়ের ঘরের মতন চালই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এমন কি গৌড়ের 'সোনা মসজিদে'র খিলানযুক্ত ছাদও বাঙ্গলার আটচালার পরিকল্পনায় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গৌড় এক সময়ে বাঙ্গলার স্থাপত্য-শিল্পের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল। বাঙ্গলার দেউলগুলি বাঙ্গলার চালা ঘরের অনুকরণে চারচালা-বিশিষ্ট। অধিক বারিপাতে এই প্রকার ছাদই জলধারা নিষ্কাশনে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। অবশ্য এই প্রকার ঢালু চালের ছাদের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায়, তথাপি বাঙ্গলার স্থাপত্যেরও একটা অভিনব বিশেষত্ব আছে।

যখন বিধর্ম্মীদের বিশেষতঃ কালাপাহাড়ের নির্ম্মম অত্যাচারে হিন্দুর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থে বিশ্বের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় শিল্পের নিদর্শন দেব-দেউল ও মূর্ত্তিগুলি বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন ও তাহার পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গলার পল্লিগ্রামে শিল্পীরা তাঁহাদের চিরনূতন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় গ্রামের দেব-দেউল-নির্ম্মাণে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহারই এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন মথুরাপুরের দেউল।

ফরিদপুর জিলার রাজবাড়ী মহকুমায় মথুরাপুর গ্রামে একটি কারুকার্য্যময় সুন্দর দেউলের সন্ধান পল্লী-শিল্পের দরদী
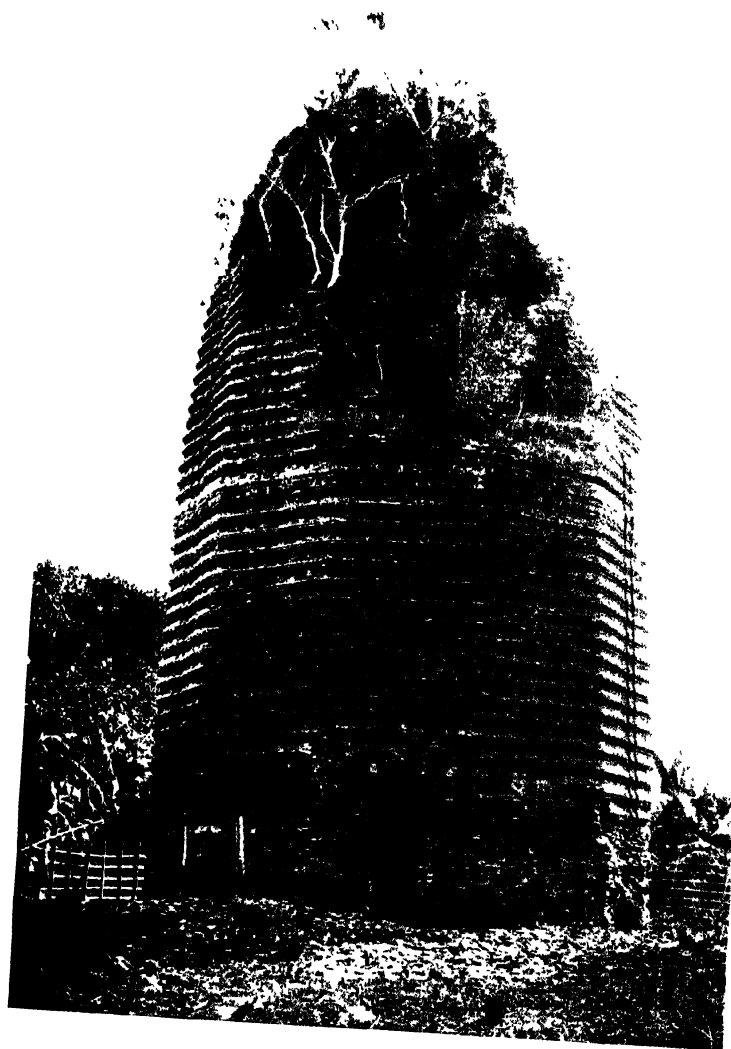
মথুরাপুর দেউল—ফরিদপুর, বাঙ্গলা

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই. সি. এস. মহোদয় ১৯৩৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন।

দেউলটি বর্ত্তমানে জমি হইতে ৭০ ফুট উচ্চ দেখায়, বাঙ্গলার দেউলের মতন ভিত হইতে ক্রমশঃ অল্প অল্প থাকে থাকে সরু হইয়া ২৯ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তারপর ইহার বাঁক ক্রমান্বয়ে সরু হইয়া শির পর্য্যন্ত গিয়াছে। ২৯ ফুট উচ্চে একটি বৃহৎ কার্নিস বেড় দিয়া রহিয়াছে। কার্নিসের উপর হইতে দেউলের চূড়া ঢালু হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, তবে তাহার সেই স্থানের গাত্রে কোন কারুকার্য্য নাই। মনে হয় ইহার শিরোদেশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। খিলানের উপরিভাগে একটি বড় গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া দেউলের অভ্যন্তরে আলোক প্রবেশ করিতেছে। ইহার শিরে কোন 'আমলক' বা কলস স্থাপিত হইয়াছিল কি না তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। বড় বড় গাছ জন্মিয়া দেউলের উপরিভাগের বহু স্থান ধ্বংস করিয়াছে।

নিম্নভাগেরও পাঁচ ফুট পর্য্যন্ত টেরাকোটার কারুকার্য্যগুলি 'নোনা' ধরিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটি দ্বাদশ-পলযুক্ত, প্রত্যেকটি পল পঞ্চরথের পরিকল্পনায়। দেউলের শিরস্থান হইতে ভিত পর্য্যন্ত বারকোণ খাড়াভাবে উঠিয়াছে, প্রত্যেকটি পল 'পঞ্চ পগে' (শিরায়) বিভক্ত হইয়াছে। ইহাই এই মন্দিরের নিজস্ব বিশিষ্ট গঠনপদ্ধতি। ইহার তুলনা আর নাই।

দেউলের গাত্রের টেরাকোটার মূর্ত্তি ও চিত্রাবলী উৎকৃষ্ট ভাবব্যঞ্জক ও শিল্প-জগতের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের নিদর্শন। বাঙ্গলা দেশে পাহাড়ের প্রাচুর্য্য না থাকায় গৃহ-নির্ম্মাণে প্রস্তর ব্যবহৃত হইত না। সেইজন্য বাঙ্গলার শিল্পীরা পাথরের উপর

17—1804B.

তাঁহাদের তক্ষণ-কার্য্যের নিপুণতার নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালী কারুকার্য্যের বিশেষত্ব পোড়া ইটের উপর ফুটিয়া উঠিত। সে সব পোড়া মাটির কারুকার্য্যখচিত অট্টালিকাগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। নদীর ভাঙ্গনে অনেক সৌধমালার অস্তিত্ব লোপ পাইয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও দূর পল্লীতে দৈবক্রমে কালের ধ্বংসলীলার কবল হইতে যে কয়েকটি দেব-দেউল রক্ষা পাইয়া টিকিয়া আছে তাহাদের পোড়া ইষ্টকের (টেরাকোটার) কারুকার্য্য বর্ত্তমান যুগের শিল্পী ও স্থপতিগণের বিস্ময় ও পুলক সঞ্চার করে। বিষ্ণুপুরের মন্দির তাহার এক প্রধান নিদর্শন।

মথুরাপুরের দেউলটি সেইরূপ মনোহর স্থাপত্য। কোন দৈব-দুর্ঘটনার জন্য মন্দিরটিতে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের মতে সংগ্রাম জয় করিয়া কোন বিজয়ী বীর তাঁহার বিজয়স্তম্ভরূপে এই দেউল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেউলের গাত্রের তেজোব্যঞ্জক পশু ও নর-নারীর মূর্ত্তিগুলি এবং বিজয় অভিযানের নানা চিত্রাবলী বীরভাব-প্রকাশক ; এমন কি রামায়ণ-মহাভারতের ও কৃষ্ণলীলার যে সব মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে তাহাও বীরত্বব্যঞ্জক ও 'যুদ্ধং দেহি' ভঙ্গিমায় গঠিত। এ সমস্ত বীরভাবের প্রাচুর্য্য দেখিয়াই শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে, এই দেউল যুদ্ধবিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ। জমি হইতে ২৯ ফুট উচ্চ দ্বাদশ পলের মধ্যে নয়টি পলের কটিদেশ বেষ্টন করিয়া যে বিচিত্র সিংহশ্রেণী অমিতবিক্রমে কমল-বন দলিত করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের অভিনব পরিকল্পনা ও বীরত্বব্যঞ্জক গঠন-পদ্ধতি

গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অন্যতম কারণ। সিংহমূর্ত্তিযুক্ত কটিবন্ধটি ও জয়োল্লাসে মত্ত স্ফীত-কেশরযুক্ত পশুরাজ-সমষ্টির গড়ন অপূর্ব্ব। এমন জয়োল্লাসমত্ত সিংহের মিছিল অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না। প্রত্যেকটি সিংহ এক একটা পদ্মের কুঁড়ি কামড়াইয়া ছিঁড়িতে উদ্যত হইয়াছে, প্রস্ফুটিত কমলবন ধ্বংস করিয়া মত্ত সিংহগুলি ছুটিতেছে। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"That in the whole field of culture, it would be difficult to find a treatment of the lion motif which can equal this Mathurapur lion motif in vigour and virility of design. (Modern Review, March, 1934).

তিনি আরও লিখিয়াছেন—"আমার মনে হয় মথুরাপুরের সিংহের পরিকল্পনায় যে পৌরুষ ও বীরত্বের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে, বিশ্বের সমগ্র ভাস্কর্য্য-শিল্পের ক্ষেত্রে কোথাও তার তুলনা মিলিবে না।

এই 'সিংহকটি' ছাড়াও মল্লদৃশ্য, কীর্ত্তিমুখ, সিংহমুখা নল প্রভৃতি শিল্পকার্য্যগুলি সংগ্রামের বিজয়সূচক চিহ্ন।

দেউলের পশ্চিম দিকের দেয়ালে স্তরে স্তরে নানা ক্ষোদিত মূর্ত্তি ও ভাস্কর্য্যের সাহায্যে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার সমস্ত কাহিনী এমনভাবে ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হয়েছে যে সেগুলি বীরত্ব ও পৌরুষব্যঞ্জক। সেগুলি যবদ্বীপের প্রাম্বানমের ভাস্কর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আমার মনে হয় যে, প্রাম্বানমের ভাস্কর্য্যের চেয়েও মথুরাপুরের দেউলের ভাস্কর্য্য অধিকতর বীর্য্যবান্ ও পৌরুষব্যঞ্জক। মথুরাপুর দেউলের আর একটা বিশেষত্ব এই

যে, ভাবের পরিকল্পনা ও গঠনপদ্ধতি সমস্তই বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর নিজস্ব।" (বঙ্গলক্ষ্মী, চৈত্র, ১৩৪০)।

দেউলের অন্য দিকের গাত্রে রুক্মিণী-হরণ চিত্রটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রবাদ সংগ্রামসিংহ নামে এক বীর মথুরাপুরে প্রতিপত্তি বিস্তার করেন, তাঁহারই জয়স্তম্ভস্বরূপ এই দেউল প্রস্তুত হয়। এই প্রবাদ অনুসারে এই দেউলটি আনুমানিক ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পুস্তকে ('Revised list of Ancient Monuments in Bengal') এই দেউল ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই পুস্তকের ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সংস্করণে (২২৪ পৃঃ) লিখিত আছে যে বৈদ্যবংশীয় সংগ্রাম-সিংহ কর্ত্তৃক আনুমানিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হয়।

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বৃহৎ বঙ্গ' পুস্তকের (১ম খণ্ডের ৪৩৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, "সংগ্রামসিংহ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া বৈদ্য সমাজের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চেষ্টা করেন। বহু বৈদ্য পরিবারের পুত্রকন্যা তিনি জোর করিয়া আপনার পরিবারে বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হওয়াতে উচলি সেন বংশীয় হরিনাথ সেই লজ্জায় দেশান্তরিত হইয়াছিলেন। 'সংগ্রামসিংহতনয়া-পাণিগ্রহণপীড়িতঃ'—কবিকণ্ঠহার তাঁহার বৈদ্যকুলপঞ্জীতে (১৬৩৫ খৃঃ অব্দে) লিখিয়াছিলেন।" সুতরাং সংগ্রামসিংহ নিশ্চয়ই তিন শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক।

বর্ত্তমান যুগে এই দেউলের সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ মেজর রেনেলের 'জার্নেল' এবং মেজর রেনেলের 'মেময়ার' গ্রন্থের

১৬৭৪—৮ই ও ১০ই তারিখে লিখিত রোজনামার (ডায়ারীর) পাতায় পাওয়া গিয়াছে :—" 10th July; Passed the Pagoda of Motrapore which lies on each side of the creek" (Major Rennel's Journal. *Vide* Vol. III, p. 108, pp. 95, 248 of the Memoirs of the Asiatic Society of Bengal). এই পুস্তকের সম্পাদক ৮ই জুলাই ১৭৬৪ খৃঃ তারিখে রেনল সাহেব কর্তৃক লিখিত বর্ণনার একটি পাদটীকা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি কিন্তু লিখিয়াছেন—" Mathurapor at the junction of this creek with Kumar. The temple is said to have been built about 70 years before this by one Sangram Shah of the Baidya family, but was left unfinished because one of the masons fell from the stupa and died (List of Ancient Monuments, Bengal, page 224). তবে এই মতের পরিপোষক কোন প্রবাদ বা লিখিত নিদর্শন নাই।

সংগ্রাম সাহ্ যে মথুরাপুর দেউলের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেউলের সম্মুখ ভাগের দক্ষিণাংশের মূর্ত্তিগুলি রামলীলার ও উত্তরাংশের মূর্ত্তিগুলি কৃষ্ণলীলার বলিয়া মনে হয়। দেউলের সর্ব্বনিম্নের বহিরংশের ব্যাসের মাপ ৩৪′ ১১″ এবং ভিতরাংশের ব্যাসের মাপ ২২′ ১১″ তাহা হইলে দেউলের দেওয়াল ১২′ মোটা। দুইটি প্রবেশ-দ্বার খোলা আছে, একটি পশ্চিমে এবং অপরটি দক্ষিণে অবস্থিত। উত্তর ও পূর্ব্বে এইরূপ দ্বারের আকারের অনুকরণে দুইটি

রুদ্ধ দ্বার আছে। দ্বাদশ পলের প্রত্যেকটি পলের মাপ ভিত্তি-স্থানে ৯' : ০"।

মথুরাপুরের মন্দির-গাত্রে একটি অশ্বারোহী শিকারীর মূর্ত্তি খুবই তেজোব্যঞ্জক। শিকারীর মুখ চোখ নাই, কেবল দেহের ও মুখের অস্পষ্ট রেখাঙ্কন আছে, ঘোড়াটা অটুট আছে। এই ঘোড়াটি দেখিলেই মথুরাপুরের শিল্পীর দক্ষতা উপলব্ধ হয়। স্বর্গীয় দীনেশ সেন মহাশয় বৃহৎ বঙ্গে (১ম খণ্ডের ৪৩৩ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"কোনারক, অজন্তা, ভুবনেশ্বর বা অন্য কোন স্থানে এইরূপ তেজোময় ঘোড়া হইতে উৎকৃষ্ট ঘোড়া দৃষ্ট হয় না; ইহার গতি, সমস্ত অঙ্গের লীলায়িত ভঙ্গী এবং দুর্দ্দমনীয় বেগ—ভাস্কর কি অদ্ভুত শিল্প-কৌশলে প্রদর্শন করিয়াছেন! কেবল রেখার ইঙ্গিতে তাহার অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতা ও তেজোগর্ভ বর্শাক্ষেপ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্শাটি যে ভাবে দেখান হইয়াছে, তাহাতে যেন ভাস্কর মূর্ত্তিতে সম্পূর্ণ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঘোড়াটি বেগে এক হরিণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। হরিণের মুখ ঘোড়াটি কামড়াইয়া ধরিয়াছে। * * শিল্পীর কি অদ্ভুত ক্ষমতা! সে শুধু রেখা দিয়া সমস্ত চিত্র নানারূপ ভঙ্গী-সহকারে অতি অনায়াসে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত চিত্রটির মধ্যে একটি অদ্ভুত গতিশীলতা ও শিকারের উত্তেজনা দৃষ্ট হয়।"

যশোদা-কৃষ্ণ, ভরত ও রামের চিত্রকূটে মিলন, প্রজ্বলিত হোমাগ্নি, মল্লযুদ্ধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামসকাশে হনুমান্, বাঙ্গলার পল্লিগ্রামের খড়ের ঘর, নৃত্যরতা পুরবাসিনী ও স্নানের দৃশ্যাবলী অতি সুন্দর ললিতকলার নিদর্শন।

মথুরাপুর

ফরিদপুর জিলায় রাজবাড়ী মহকুমায় মথুরাপুর অবস্থিত।

পথ — ই. বি. রেল লাইনে গোয়ালন্দ লাইন হইতে কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া শাখা লাইনের নালীয়া গ্রাম ও মধুখালী স্টেশনের মধ্যে মথুরাপুরের দেউল অবস্থিত।
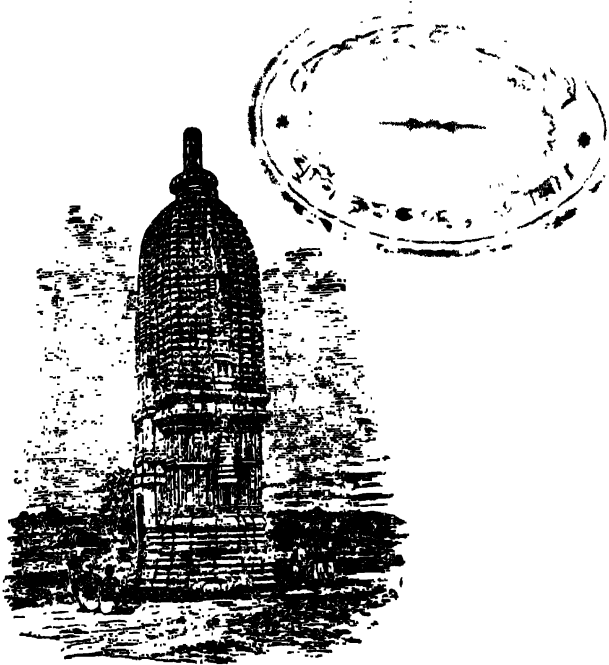
বাঁকুড়ার নিকট বাহলারা গ্রামের মন্দির
বাঙলার মন্দির স্থাপত্যের একটি নিদর্শন।

আবু পাহাড়

জৈনদের বিশ্বাস মন্দির-নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহাদের আরাধ্য-দেবতা পরেশনাথ, নেমিনাথ, মহাবীর প্রভৃতির মধ্যে কোন জিনকে প্রতিষ্ঠা করিলে ইহকালের ও পরকালের মঙ্গল হইবে। সেই জন্য মধ্যবিত্ত ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার বিত্ত ও চিত্ত মন্দির-নির্ম্মাণে নিয়োগ করিতেন। তাহার ফলে আমরা ভারতের নানা স্থানে স্থাপত্যের, শিল্পের, ভাস্কর্য্যের চরম উন্নতি ও বিকাশ বহু জৈন মন্দিরে দেখিতে পাই। বর্ত্তমান যুগেও ধারওয়ার জিলার লাক্কুন্দী, শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের (পালিটনা) ঋষভনাথের মন্দির, গির্নার (গুজরাটে) পর্ব্বতের নেমিনাথের মন্দির, অর্ব্বুদ পাহাড়ের (মাউণ্ট আবুর) বিমলশা মন্দির, পরেশনাথ পাহাড়ের পার্শ্বনাথের মন্দির, যোধপুর রাজ্যের মধ্যে রানপুরের আদিনাথের মন্দির, গোয়ালিয়ারের পর্ব্বত-গুহার ৫৩′ উচ্চ জিনমূর্ত্তি-সমেত বিহার এবং খাজুরাহোর নেমিনাথ, আদিনাথ ও পার্শ্বনাথের মন্দিরসমূহের ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও শিল্পৈশ্বর্য্য বিশ্ববাসীকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জৈন মন্দিরগুলি সমস্তই শিখরযুক্ত এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-মণ্ডিত। জৈন-ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম হইবার সৌভাগ্য অতি কম হইলেও, জৈনদের মধ্যবিত্ত ধনী ব্যক্তিদের কৃপায়ই জৈন শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ও বিকাশ হইয়াছিল। কোন একটা বিরাট্ দেউল না থাকিলেও সংখ্যাধিক্যে ও শ্রেষ্ঠ শিল্পৈশ্বর্য্যে জৈনদিগের মন্দির ভারতের শিল্পরাজ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

ফার্গুসান সাহেব লিখিয়াছেন—"It may, however, be also owing to this that their buildings are more elaborately finished than those of more national importance. * * wealthy individuals feel pleasure in elaborate detail and exquisite finish than on great purity or grandeur of conception." (Vol. II, p. 26).

জৈন শিল্পের চরম ও পরম বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হইয়াছে মাউণ্ট আবুর মর্ম্মর-প্রস্তরের বিমলশার ও তেজপালের দিলওয়ারা মন্দিরে। রাজপুতনার মরুভূমির বক্ষ হইতে ৪,০০০ চারি হাজার ফুট উচ্চ পত্রপুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি-সমাচ্ছন্ন অর্ব্বুদ পাহাড় সগর্ব্বে উত্থিত হইয়াছে। আবু পাহাড় বহু দিন হইতে হিন্দু ও জৈনগণের প্রিয় তীর্থস্থান, বর্ত্তমানে দেশ ও বিদেশের নরনারীর পরম-প্রীতিকর চিত্তবিনোদনের আবাস। পর্ব্বতের উপরিভাগ ছয় মাইল লম্বা ও দুই তিন মাইল প্রস্থ পরমরমণীয় সমতলভূমি। যদিও সমস্ত ভূমিখণ্ড প্রস্তরময় তথাপি স্থানে স্থানে বৃক্ষ ও লতাগুল্মের সমাবেশ এই স্থানের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। ছোট "নখীতলাও" এই ভূস্বর্গের বহুমূল্য কণ্ঠহারের মরকতমণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। আধুনিক যুগে এই স্থান জৈনদের কোন বিশেষ তীর্থ না হইলেও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন জৈন-ধর্ম্মের খুবই প্রাদুর্ভাব ছিল তখন এই অর্ব্বুদ পাহাড়ে জৈনরা বহু মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্থানটিকে পবিত্র ও প্রিয় করিয়া-ছিলেন। অবশ্য মন্দিরের সংখ্যা গির্নারের তুলনায় মাউণ্ট আবুতে খুবই কম। তবে বিমলশার এবং তেজপালের নির্ম্মিত

18—1801 B.

শ্বেত-পাথরের বিরাট মন্দির দুইটি জৈন-শিল্পীদের অদ্ভুতকীর্ত্তি, বর্ণনার দ্বারা ইহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র উপভোগ করা যায় না। মাউণ্ট আবুর জৈনদের শ্বেত-পাথরের মন্দির দেখিয়া কর্ণেল টড সাহেব এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার রাজস্থান গ্রন্থে শত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিয়াছেন—All that was required to form the sublime was at hand; and silence confirmed the charm. * * * A little farther to the right rose the clustering domes of Dilwara, backed by nobles woods, and buttressed on all sides by fantastic pinnacles, shooting like needles from the crest of the Plateau; it appears like a cluster of the half disclosed lotus whose cups are so thin, so transparent, and so accurately wrought, that it fixes the eye in admiration.

বিমলশার শ্বেতপাথরের মন্দির

বিমলশা রাজা ভীমদেবের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১০৩১ খৃঃ বিশ ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত অত্যুচ্চ শ্বেত-পাথরের পাহাড় হইতে মর্ম্মর-প্রস্তর আনিয়া এই সুন্দর নিখুঁত কারুকার্য্য-মণ্ডিত মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের গাত্রের শিলা-লিপিতে উৎকীর্ণ আছে যে, এই মন্দির বিধর্ম্মি-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে ১৩৭৮ সালে মেরামত হয় এবং আরও ক্ষোদিত আছে যে, অম্বা দেবীর আদেশে বিমলা এই আদিনাথের মন্দির ১০৮৮ সংবতে (১৩৩১ খৃঃ) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ('এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা', ৯ম খণ্ড, ১৪৮ এফ্ পৃঃ)।
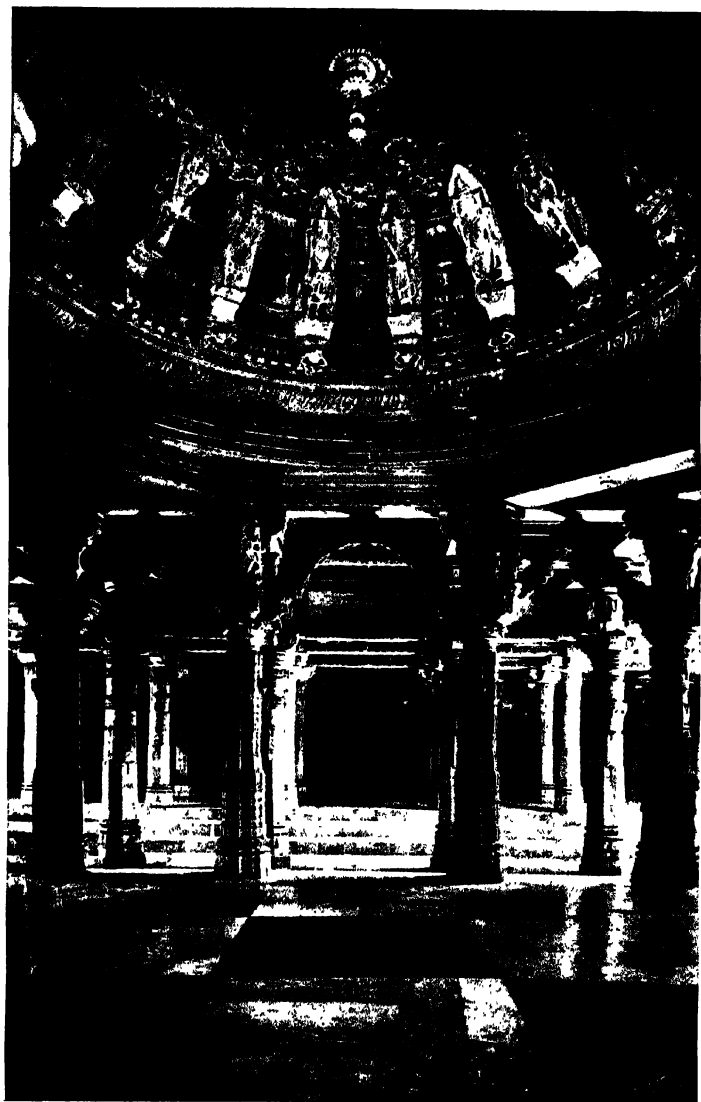
বিমলশা জৈন-মন্দিরের শ্বেত-পাথরের উপর কারুকার্য্য—আবু পাহাড়

প্রধান মন্দিরের আয়তন ১৫০′×৯০′, উপরে শ্বেতপাথরের একটি গোলগম্বুজ আছে। বারাণ্ডা (২৫′×৩০′) ও তৎসংলগ্ন ছয়টি স্তম্ভযুক্ত সমচতুষ্কোণ (২৫′×২৫′) মণ্ডপের মধ্য দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। ছয়টি স্তম্ভের সহিত ৪′ উচ্চ শ্বেতপাথরের দশটি হস্তী সংযুক্ত আছে। প্রত্যেক হাতীর উপর মাহুত এবং তৎপশ্চাতে শ্বেতপাথরের কারুকার্য্য-খচিত হাওদার উপর এক এক মূর্ত্তি বসান ছিল। মুসলমানগণ তাহা অপসারিত করিয়া দিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি বিমলশা ও তাঁহার পরিবারবর্গের ছিল, তাঁহারা যেন মন্দিরে আদিনাথের চরণে অর্ঘ প্রদান করিতে যাইতেছেন। নয় জন আরোহীর নাম এখনও পাদপীঠে ক্ষোদিত আছে। তার মধ্যে ছয়টিতে ১১৪৯ খৃঃ এবং অপর তিনটিতে ১১৮০ খৃঃ অনুযায়ী সংবৎ উৎকীর্ণ আছে।

গর্ভমন্দিরের মধ্যে ঋষভনাথ বা আদিনাথের যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। ইহার উপর নানা কারুকার্য্য-খচিত শিখরযুক্ত মন্দিরচূড়া নির্ম্মিত রহিয়াছে। শ্বেতপাথরের হইলেও অন্যান্য জৈনমন্দিরের ন্যায় উচ্চ বহুশিখরমণ্ডিত নহে। ইহার সম্মুখের মণ্ডপ বা নাটমন্দিরই এই মন্দিরের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য। এই মণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ১২৫′ ও প্রস্থে ৭৫′ আয়তনের আঙ্গিনার দ্বারা বেষ্টিত। মণ্ডপটির অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যমণ্ডিত শ্বেতপাথরের ৪৮টি স্তম্ভের মস্তকে সুশ্রী, সুঠাম ও সুন্দর নারীমূর্ত্তি-সম্বলিত ব্রাকেট শোভিত। বীমের উপর গোলাকার গম্বুজ অবস্থিত থাকায় অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। আবার সমস্ত স্থানটির চারিদিক্ জোড়া জোড়া

ছোট ছোট স্তম্ভ সম্বলিত দালান দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে এবং তাহাদের সংলগ্ন ৫২টি কুঠরী তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। বৌদ্ধবিহারের মঠ বা কুঠরীর মতন হইলেও এইগুলি সাধু-সন্ন্যাসীর বাসের জন্য ব্যবহৃত হইত না, এখানে তাহার পরিবর্ত্তে প্রত্যেকটি ঘরে এক একটি 'জিনে'র মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, আর প্রত্যেকটির উপর শিখরযুক্ত চূড়া রহিয়াছে। সমস্ত স্থাপত্যই শ্বেতপাথরের।

বাহির হইতে ইহার সৌন্দর্য্য আদৌ উপলব্ধি করা যায় না, কারণ চারিদিক্ দুর্গের প্রাকারের মতন উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত রহিয়াছে, অন্দরের প্রাঙ্গণে না আসিলে মন্দিরটির প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধ হয় না। তখন সমগ্র সুষমা দেখিয়া চিত্ত পুলকে ভরিয়া উঠে এবং বিস্ময়ে মন স্তম্ভিত হইয়া যায়।

একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন—Forests of marble columns, carved and polished till they resemble Chinese ivories, are linked by '*toranas*' or flying arches, that twist and twine from pillar to pillar like exquisite creepers, softening outlines and producing the effect of a symphony of graceful movement. The ceilings are adorned with layer upon layer of carving so ornate, so cunningly executed, that the eye fails to grasp the marvels of the craftsmanship. (I.S.R.P., p. 2)

গম্বুজের মধ্য হইতে শ্বেতপাথরে ক্ষোদিত পুষ্পগুচ্ছ অনেকটা ঝুলিয়া রহিয়াছে; একটি পাকান ঝালরের স্তবক তাহার চারিদিকে ঝুলিতেছে। গোলাকার গম্বুজের পাড়ে ও

ছাদের তলায় যে সমস্ত চিত্র ও মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছে তাহা অধিকাংশ হিন্দু দেব-দেবীরই লীলাব্যঞ্জক। কোথায়ও দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন-লীলায় সর্পের ফণার উপর নৃত্য করিতেছেন, কোথায়ও বা নরসিংহ অবতার জানুর উপর রাখিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিতেছেন। প্রতি কোণ ও ফাঁকে ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত মানব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। কারুকার্য্যমণ্ডিত করিতে শিল্পী এক আঙুল স্থানও পরিত্যাগ করেন নাই। এরূপ হিন্দু শিল্পীর প্রভাব অনেক জৈন-মন্দিরেই দেখা যায়।

জৈনদের বিশ্বাস তাঁহাদের পবিত্র ও শান্তির স্থানগুলি পরমাসুন্দরী রমণীদের মূর্ত্তি-দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া উচিত। সেইজন্য বিমলশা ও তেজপালের মন্দিরে বহু সুঠাম ও সুন্দর গঠনের রমণীমূর্ত্তি খোদাই করিয়া মন্দিরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সেই নিমিত্ত Abbe Dubois লিখিয়াছেন—"The sight alone of these enchanting beauties is sufficient to intoxicate the senses of the blessed, and to plunge them into a perpetual ecstasy that is far superior to all mere earthly pleasures." (I.S.R.P.)

বিমলশার মন্দিরে জৈনদের বিংশ তীর্থঙ্কর মুনিসুব্রতের বৃহদায়তনের মূর্ত্তিটি রহস্যময়। অম্বিকার স্বপ্নাদেশে বিমলশা শ্বেতপাথরের স্তূপের মধ্যে এই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহার চক্ষুর তারা দুইটি মণিময় উজ্জ্বল। এই মূর্ত্তি দ্বাবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মূর্ত্তি।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটু উঁচু পোস্তার উপর মূল মন্দিরের অপেক্ষা প্রাচীনকালের যে মন্দিরটি দেখা যায় তাহা অম্বা দেবীর মূর্ত্তি, অম্বা দেবী দুর্গার নামান্তর, অম্বা দেবী নেমিনাথের যক্ষিণী (ইষ্টদেবীরূপে) পূজিত হইতেন। এই মন্দিরটি বর্ত্তমান মন্দির হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, বোধ হয় এইটি এখানকার সর্ব্বপ্রাচীন মন্দির এবং তাঁহারই অবস্থিতির জন্য এই স্থানটি পবিত্র। জৈন পুরাণ-শাস্ত্রে 'অম্বা' বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছেন। দণ্ডা গ্রামের ১৫ মাইল দূরে অম্বাজী নামে হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, সেখানে প্রতিবৎসর বহু জৈন মন্দিরটি দর্শন করিতে যান।

জৈন শাস্ত্রে তীর্থঙ্কর বা জিনদের পূজা পরম আরাধ্য কাজ এবং যে মন্দিরে যত জিনের মূর্ত্তি থাকিবে তাহা ততই পবিত্র। সেইজন্য অনেক মন্দিরে সহস্রাধিক মূর্ত্তি কুলঙ্গীতে বসান থাকে, তাহা যেন কপোত-নীড়ের মতন দেখায়।

শ্বেত পাথরের গোলাকার গম্বুজটি যেমন বৃহৎ তেমনি পরম সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত। ইহার গঠন-পরিকল্পনাও অভিনব—সিলিংএর, বীমের, পাড়ের, সর্দ্দালের, ব্রাকেটের, কার্নিসের শ্বেতপাথরের উপরের সূক্ষ্ম কার্য্য, হাতীর দাঁতের উপরের কারুকার্য্যকে ম্লান করিয়া দেয়। মণ্ডপের নানা রকমের নক্সা বহু বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান-সম্পন্ন স্থপতিকে বিস্মিত করে। স্তম্ভগুলির গাত্রের কার্য্য এবং মাথার গঠন সম্পূর্ণ নূতন ধারায় দক্ষতার সহিত ক্ষোদিত। এই স্তম্ভের উপর ছোট ছোট স্তম্ভ, তার উপর গোলাকার সর্দ্দাল। বৃহৎ

গম্বুজটি এই সর্দ্দালেরই উপর এমন কৌশলে স্থাপিত যে সমস্ত ভার বহন করিয়া আনিয়া থামগুলির উপর রাখা হইয়াছে।

তেজপাল ও বাস্তুপাল দুই ভ্রাতা ছিলেন, গির্নারের অনেক জৈন বস্তি তাঁহাদেরই দানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

তেজপালের নেমিনাথের মন্দির

আবু পর্ব্বতের মন্দিরটি তেজপাল একক তাঁহার ভ্রাতার স্মৃতিকল্পে ১২৩০ খৃঃ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নেমিনাথ তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই মন্দির জৈন-গ্রন্থে "লুনিগাঁ" বস্তি (মন্দির) নামে পরিচিত। সমস্ত মন্দির, মণ্ডপ, প্রাঙ্গণ ও প্রাচীর শ্বেত-পাথরের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যমণ্ডিত। ফার্গুসান সাহেব লিখিয়াছেন—" * * * For minute delicacy of carving and beauty of detail stands almost unrivalled even in the land of patient and lavish labour" (H.I.E.A., Vol. II, p. 36).

নেমিনাথের মন্দিরটি বিমলশার মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত, ছোট প্রাঙ্গণ মাত্র ব্যবধান। বাহির হইতে এই মন্দিরেরও সৌন্দর্য্যের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মন্দিরটিও সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাকারের দ্বারা বেষ্টিত, মন্দিরের পশ্চাতে যে সমস্ত কুঠরি আছে তাহার পূর্ব্বদিকের ঘরের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতার বংশের নর নারীর মূর্ত্তি স্থাপিত, ইহার সম্মুখের বারাণ্ডা ও প্রাঙ্গণ জালিপর্দ্দার দ্বারা বিভক্ত, এই জালির কাজ সূক্ষ্ম না হইলেও সুদৃঢ়। পর্দ্দার পর প্রাঙ্গণের মধ্যে মনোহর 'চৌমুখ' প্রতিষ্ঠিত, তাহার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া

পাঁচটি হস্তী অবস্থিত, তাহাদের হাওদার ও ঝালরের কার্য্য সূক্ষ্ম ও মনোহর। দুঃখের বিষয় তাহাদের আরোহীদের মূর্ত্তি মুসলমানরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

মন্দিরের আয়তন ১৫৫'×৯২', বিমলশার মন্দিরের অনুকরণে প্রস্তুত হইলেও সেই একাদশ শতাব্দীর গঠন-ধারা সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই। ইহার মণ্ডপের গম্বুজটি পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার শিল্পৈশ্বর্য্য বিমলশার মন্দিরের অপেক্ষা যেন সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট। অষ্টকোণ পলের বৃহদায়তন স্তম্ভের উপরই বৃত্তাকার গম্বুজ স্থাপিত। এখানে সর্দ্দালের উপর ছাদের তলায় দ্বিতীয় থাক, পাড়ের নীচে ষোলটি ব্রাকেট অতিরিক্ত বসান আছে। তাহার উপর যে পরীর মূর্ত্তি (বিদ্যাদেবী) ক্ষোদিত আছে তাহা যেমন সুঠাম তেমনই মূর্ত্তি-গঠনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ছাদের তলার (সিলিংএর) মধ্যস্থল হইতে যে বৃহৎ অপূর্ব্ব দুল (Pendant) ঝুলিতেছে তাহার কারুকার্য্যের মতন সূক্ষ্ম এবং সুন্দর বিশ্বে আর কোথাও নাই বলিয়া ফার্গুসান সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন—

"The whole is in white marble, and finished with a delicacy of detail and appropriateness of ornament which are probably unsurpassed by any similar example to be found anywhere else. Those introduced by the Gothic architects in Henry VII's chapel at Westminster, or at Oxford, are coarse and clumsy in comparison." (H.I.E.A., Vol. II, p. 41)

মন্দিরের অন্য দুই দিকের যে কুঠরী আছে তাহার দ্বারের মাথার শিলালিপিতে, তেজপাল ও তাঁহার বংশের দুলালরা যে যে তীর্থঙ্কর স্থাপন ও দান করিয়াছেন সেই বিবরণ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এইগুলি ১২৩০-৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত।

এখানে আর দুইটি মন্দির দ্রষ্টব্য আছে—একটি 'আদি-নাথে'র আর একটি বিখ্যাত চৌমুখ' মন্দির। এই মন্দিরটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনতলা উচ্চ, ইহার চারিদিকে সর্ব্বদিক্ খোলা, কেবল স্তম্ভের উপর গম্বুজযুক্ত চারিটি মণ্ডপ বিদ্যমান। পশ্চিম দিকের মণ্ডপটি প্রধান তাহাতে ৬৬টি স্তম্ভ রহিয়াছে।

19-1304B.
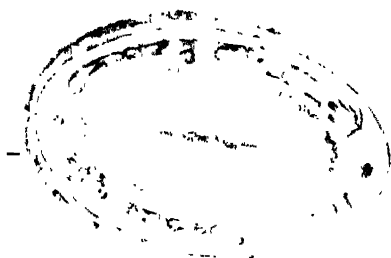
রামটেক্

প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন রামটেক্ গিরি চারি দিকে পর্ব্বতশ্রেণী-বেষ্টিত হইয়া সরলভাবে সগর্ব্বে শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। সাগর-জলতল হইতে পর্ব্বতটি দুই হাজার ফুট উচ্চ। পর্ব্বতটি অশ্বক্ষুরাকৃতি, ঘোড়ার ক্ষুরের ন্যায় শেষ প্রান্ত গোল, দুইটি বাহু বিস্তৃত করিয়া পর্ব্বতটি চলিয়াছে, তাহার মধ্যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। এই উপত্যকায় বিশাল 'অম্বরা' হ্রদ বিরাজ করিতেছে।

ত্রেতাযুগে শম্বুক নামে এক শূদ্র স্বর্গারোহণ-মানসে তপস্যা করিয়াছিলেন। শূদ্রের তাদৃশ তপস্যায় অধিকার ছিল না। সেই নিমিত্ত রামরাজত্বে পাপ-সঞ্চারের কারণ হয় এবং তাহার ফলে অকালে এক ব্রাহ্মণের শিশুর মৃত্যু হয়। সেই ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় রামের নিকট তাঁহার শিশুর অকাল-মৃত্যুর জন্য অভিযোগ করেন। অনেক অনুসন্ধানের পর এক শূদ্রের তপস্যাই এই শিশুর অকালমৃত্যুর কারণ ইহাই স্থির হয়। তখন রামচন্দ্র স্বয়ং এই পাহাড়ে আগমন করিয়া দেখেন যে শম্বুক কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন। তখন তিনি স্বহস্তে তাঁহাকে বধ করেন। ভগবানের হস্তে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার মুক্তি হয়। রামচন্দ্র তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে শম্বুক বর চান যে, "রাম যেন এই পর্ব্বতে যুগে যুগে বসতি করেন।" এই কাহিনী উত্তর-রাম-চরিতে বর্ণিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র-মন্দির—রামটেক্ গিরি—নাগপুর

তদবধি এই গিরি হিন্দুদের নিকটে পরম পবিত্র তীর্থ এবং ইহার নাম 'তাপসগিরি', 'সিন্দূরগিরি' বা 'রামগিরি' (কানিংহাম সাহেবের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১১)। ইহার 'সিন্দূরগিরি' নাম হইবার অন্যতম কারণ—রামটেক্ পাহাড়ের প্রস্তর ভাঙ্গিলে রক্তধারার ন্যায় দেখা', কিংবদন্তী প্রচলিত যে, শম্বুক শূদ্র রামচন্দ্র-কর্তৃক নিহত হওয়াতে তাহারই রক্তে এই পাহাড় প্লাবিত হয়, সেই জন্যই প্রতি প্রস্তরখণ্ড-মধ্যে এই প্রকার রক্তধারা দেখা যায়।

এই রামগিরির পরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই মহাকবি কালিদাসকে তাঁহার মেঘদূত-রচনায় অনুপ্রেরণা প্রদান করিয়াছিল। রাম-লক্ষ্মণের মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি সুদৃশ্য মঞ্চ আছে, তাহার নাম 'রাম ঝরকা'। কালিদাসের বর্ণিত বিরহী যক্ষ এই স্থানে বসিয়াই বোধ হয় তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয়ের মর্ম্মকথা মেঘের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিরাণীর সৌন্দর্য্যময় ক্রোড়ে দাঁড়াইয়া ব্যথিত হৃদয়ে বিরহী তাঁহার প্রণয়িনীর নিকট মেঘকে দূতরূপে গমন করিবার জন্য যে সব প্রাণের কথা নিবেদন করিয়াছিলেন তাহা যেন এখনও এই গিরিতে মুখরিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামটেক্ই কালিদাসের 'রামগিরি' বলিয়া সপ্রমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সম্প্রতি এই স্থানের এক গুহাতে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানেই কালিদাসের এক সময়ের লীলা-নিকেতন ছিল শিলালিপি-পাঠে ইহাই নির্দ্ধারিত হয়।

রামটেক্ পল্লী হইতে পর্ব্বতারোহণের পথ গিরিবরকে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া 'অম্বরা' হ্রদতীরে উপনীত হইয়াছে। এখানেই রামগিরি দুর্গের বাহির প্রাচীরের প্রথম তোরণ—তোরণটি উচ্চ, প্রস্তর-নির্ম্মিত—দিল্লীর পুরাণ কিল্লার তোরণের অনুকরণে গঠিত। এই তোরণের মধ্য দিয়া, 'অম্বরা' হ্রদের তীরে তীরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পাহাড়ের বাম ধারে গিরিবপুর উপর উঠিবার সোপান রহিয়াছে।

ভারতের সৌভাগ্যরশ্মি যখন ম্লান হইয়া যায় নাই, তখন এক স্বাধীন মহারাষ্ট্র-নরপতি এই রামগিরির দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রামচন্দ্রের মন্দিরটি নিরাপদ্ করিয়াছিলেন। এখান হইতে প্রায় সাত শত সোপান অতিক্রম করিয়া উঠিলে পর্ব্বতের শিরে উপনীত হওয়া যায়। পথিমধ্যে দ্বিতীয় প্রাকারের ছোট এক তোরণের মধ্য দিয়া সোপান-শ্রেণী চলিয়াছে। এই দ্বারের বাম দিকে একটি পুরাণ মসজিদ দেখা যায়, মুসলমান যোদ্ধারা এখানেও আসিয়াছিল তাহারই নিদর্শন এই মসজিদ। সোপানগুলি বিস্তৃত প্রস্তর-দ্বারা মণ্ডিত। অনেকগুলি সোপানের গাত্রে দাতার নাম, ধাম ও নির্ম্মাণের কাল উৎকীর্ণ রহিয়াছে। আরও কতকগুলি সিঁড়ি বাহিয়া উঠিলে দুর্গের প্রধান সুদৃঢ় প্রাকারের নিকট উঠা যায়, এখানে একটি তোরণের মধ্য দিয়া একটু অগ্রসর হইলে ডান দিকে এক মণ্ডপে বৃহৎ বরাহ-মূর্ত্তি রহিয়াছে। মণ্ডপটির ছাদ চারিটি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত, মূর্ত্তির আকার ৮½'×৮½' সম-চতুষ্কোণ, ৬'।৬" উচ্চ এবং খুবই প্রাচীন। বরাহের গাত্রে পুরু সিন্দূরের প্রলেপ থাকায় তাহার স্বরূপ আদৌ বোঝা যায় না। এই

প্রাঙ্গণের চারিদিকে অনেকগুলি ভগ্ন মন্দির ও পুরোহিতদের আবাস-বাটী দেখা যায়।

বহিঃ-প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইলেই মূল মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যায়। এইখানে ছোট মন্দিরের মধ্যে শ্বেতপাথরের এক সুদৃশ্য মূর্ত্তি রামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ নামে পূজা পাইয়া থাকে। কিন্তু এই মূর্ত্তিটি দুর্গের বা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার প্রতিমূর্ত্তি, এইরূপ অভিমত কানিংহাম সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। (কাঃ, আঃ সাঃ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১১৬)

মহামণ্ডপে প্রবেশ করিতে হইলে আর একটি তোরণ অতিক্রম করিতে হয়। এই মণ্ডপে এক খণ্ড শিলালিপি প্রোথিত আছে। তাহাতে এই পাহাড়ের নাম রামচন্দ্রগিরি এবং এই মন্দির "রামচন্দ্রের মন্দির" এই তথ্য উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মণ্ডপের পার্শ্বে পুরাণ অব্যবহার্য্য দুইটি কামান ও মণ্ডপের দেওয়ালে বহু মরিচা পড়া অস্ত্র, বর্শা, তরবারি, বন্দুক, ঢাল, তীরের ফলা সজ্জিত দেখা যায়।

মণ্ডপের পরই উচ্চ বহু-শিখরযুক্ত গগনচুম্বী দুইটি মন্দির দণ্ডায়মান। মন্দিরগুলি খাজুরাহোর মন্দিরের স্থাপত্য-ধারায় গঠিত যদিও অত প্রাচীন নহে। চূড়ার উপরিভাগ শ্বেতবর্ণের চূণের আস্তর-মণ্ডিত। দূর হইতে মর্ম্মর-প্রস্তরের মন্দির এইরূপ ভ্রম হয়। এইস্থান হইতে অসীম অনন্ত নীল গগনতলে কাল পাহাড়ের ঢেউ বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। অদূরে উপত্যকায় স্বচ্ছ নীরপূর্ণ 'অম্বরা' হ্রদ ও 'খিরিঞ্চিতলাও' যেন হারের মধ্যে নীলকান্তমণির ন্যায় প্রদীপ্ত দেখায়। এই স্থান রামচন্দ্রের পদরেণু-স্পর্শে যেমন পুণ্য তেমনই

ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্তে পরম পুলক সঞ্চার করে। পর্ব্বতারোহণে দেহের সকল ক্লান্তির অবসান হয়, মনও শান্ত হয়, দেব-দর্শনের ইচ্ছা প্রবল হয়।

পর পর দুইটি মন্দির, প্রথমটি লক্ষ্মণের এবং তৎপশ্চাতে রামচন্দ্রের। ভ্রাতৃবাৎসল্যের অবতার লক্ষ্মণের পূজা অগ্রে করিয়া তারপর ভগবান্ রামচন্দ্রের পূজা বিধেয়। মন্দির-মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত রৌপ্য-সিংহাসনে লক্ষ্মণের কষ্টি-পাথরের মূর্ত্তি বিরাজিত। পশ্চাতের মন্দিরের মধ্যেও মুনিজনলোভা সুশ্রী রামচন্দ্রের মূর্ত্তি স্থপতির দক্ষতার নিদর্শন।

মন্দির ও দুর্গ পঞ্চদশ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন না হইলেও এখানের অনেক দেব ও দেবীর মূর্ত্তি বহু প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। কৌশল্যা, লক্ষ্মীনারায়ণ, ঐকাটস্বামী, বালাজী, লক্ষ্মী, অষ্টভুজা, মহাবীর ও গণেশের মূর্ত্তি ছোট ছোট মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত রহিয়াছে। তাহাদের গঠন-পদ্ধতি এক নূতন ধারার।

পর্ব্বতের উপরিস্থ দেব-দেউল দর্শনের পর অবতরণ করিয়া সুশীতল বারিপূর্ণ 'অম্বরা' হ্রদে স্নান করিলে পুণ্য হউক বা না হউক পরম তৃপ্তি পাওয়া যায় ইহা খুবই সত্য। এই দীঘিটি প্রায় ¼ মাইল বিস্তৃত, তিনটি পাড় সুদৃঢ় প্রস্তর সোপান-শ্রেণীদ্বারা মণ্ডিত। চারি কোণে চারিটি প্রস্তরের সুন্দর বুরুজ রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃহৎ আয়তনের ঘাট, মন্দির, চাঁদনী নির্ম্মিত রহিয়াছে। উত্তর-তীরে সরল সোজা পাহাড় দণ্ডায়মান। পাহাড়ের বিপুল দেহস্থ বৃক্ষলতা-গুল্মাদির

প্রতিবিম্ব হ্রদের স্বচ্ছ নীরে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়া থাকে। সরোবরের শোভা যেমন মনোলোভা ইহার জল তেমনি উপকারা। কিংবদন্তী আছে অম্বা সিং নামে এক রাজপুত রাজপুত্র শিকারে আসিয়া পথভ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়েন, এই স্থানে উপস্থিত হইয়া একটি ঝরণা দেখিয়া জল পান ও স্নান করেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধির চিহ্ন ছিল, কিন্তু ঝরণার জলে স্নান করিবামাত্রেই তাহার ব্যাধির সর্ব্বলক্ষণ দূর হইয়া গেল। তিনি প্রাকৃতিক রহস্য-লীলার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া সেই ঝরণার জল সঞ্চয় করিবার জন্য এই সুদৃশ্য সরোবরটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তারপর এক স্বাধীন মহারাষ্ট্র নরপতি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হ্রদটির সংস্কার করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর মেলার সময়ে সহস্র সহস্র নরনারী এই স্থানে সমবেত হন এবং এই সরোবরে স্নান করিয়া উপকৃত হন।

পথ

মধ্যভারতের বিখ্যাত নাগপুর নগরের ২৬ মাইল উত্তরে রামটেক্ গিরি অবস্থিত। নাগপুরের সন্নিকট কাম্পটি ছাউনীর পার্শ্ব দিয়া কাহ্বান নদী প্রবাহিত, তাহার উপর দিয়া রেল লাইনের এক শাখা ছাব্বিশ মাইল গিয়াছে, এই রেল পথের রামটেক্ ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া 'রেণীতে' (দরমার ছাউনিযুক্ত যুগল অশ্বদ্বারা চালিত গো-শকটের মতন যান) দুই মাইল গমন করিলে, রামটেক্ পল্লীতে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানে যাত্রিনিবাস ও আহারাদির স্থান আছে। সেখান হইতে পর্ব্বতে উঠিবার

পথে এই রেণীতেই আরও দুই মাইল গমন করিলে অম্বরা হ্রদ ও পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। ষ্টেশন হইতে এই চার মাইল পথ যাতায়াতের জন্য 'রেণী'র ভাড়া মাত্র ছয় আনা।

লিঙ্গরাজ মন্দির—ভুবনেশ্বর

উড়িষ্যা স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন লিঙ্গরাজ মন্দির, ইহার অপর নাম ত্রিভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বর সুপ্রতিষ্ঠিত শৈবতীর্থ। কেশরী রাজগণ উত্তর ভারতের বারাণসীসম পুণ্যতীর্থ স্থাপন-কল্পে বহু শিবলিঙ্গ ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। লিঙ্গরাজদেব স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গগুলি হিন্দুদিগের বিশ্বাস-মতে সৃষ্টির প্রথম হইতেই বিদ্যমান। কখন্ কোন্ যুগে মানবাকৃতি শিবমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল তাহার সঠিক প্রমাণ জানা নাই। "পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের সময়ের (১৫০ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব্ব হইতে যে শিবের বিগ্রহ মানবাকারে গঠিত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি পুস্তকে বর্ণিত শিবমূর্ত্তি মানবাকৃতি। ডাক্তার ইউজেন্ বুর্নুফ্ বলেন যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬০০ অব্দেও ভারতে শিবপূজা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ আছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত গ্রীকদের পেরিপ্লাস নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, ভারতের দাক্ষিণাত্যে শিবের প্রতিমাপূজা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। নটরাজ শিবমূর্ত্তি তাহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ও শিল্পৈশ্বর্য্য। মেগাস্থেনিস ৩০২ খৃষ্টাব্দে দেখিয়া গিয়াছিলেন যে, বৈদিক রুদ্র ও শাকদ্বীপী মগধের দেবতা শিব উভয়েই মিলিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। চীন পরিব্রাজকেরাও শৈব ধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন। হিউয়েনসাং এক বিরাট্ মানবাকৃতি শিবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন

20—1304B

(ষষ্ঠ শতাব্দী)। বরাহ-মিহিরের সময় পর্য্যন্ত শিবের সাকার উপাসনা প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দী হইতে লিঙ্গমূর্ত্তি শিবের বিগ্রহরূপে পূজিত হইতে আরম্ভ হয়। স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিঙ্গপূজা সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (শিব ঠাকুরের ঠিকুজি ১৩২৭ সালের কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী")।

ভুবনেশ্বরের পূর্ব্বনাম একাম্রকানন। কপিল-সংহিতায় লিখিত আছে একাম্রকানন কোটিলিঙ্গাভিপূরিত ও কোটি-তীর্থ-সমাযুক্ত ('কপিল-সংহিতা', পৃঃ ৩১) চৈতন্যচরিতম্ গ্রন্থে মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন, "বসন্তি যত্রেশ্বরলিঙ্গকোট্যো বিশ্বেশ্বরাত্মাসশ্চ সুপুণ্যতীর্থাঃ"। চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে—

ভুবন মোহন, দেউল ভিতরে
দেখিল একাম্রবনে ॥ (গৌর চলিলা)
একাম্রবনে ঊনকোটি লিঙ্গ
দেউল দেখিল কপিলেশ্বরে ॥
('চৈতন্যমঙ্গল', সাঃ পঃ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৭)।

ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ ভুবনেশ্বরে অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত দেব-মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও ভুবনেশ্বরে এখন অত অধিকসংখ্যক দেউল দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি যে কয়েকটি দেউল এখনও বিরাজ করিতেছে সেগুলি দর্শন করিলে উড়িষ্যার শিল্পী ও স্থপতিদের বিরাট্ সাধনার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।
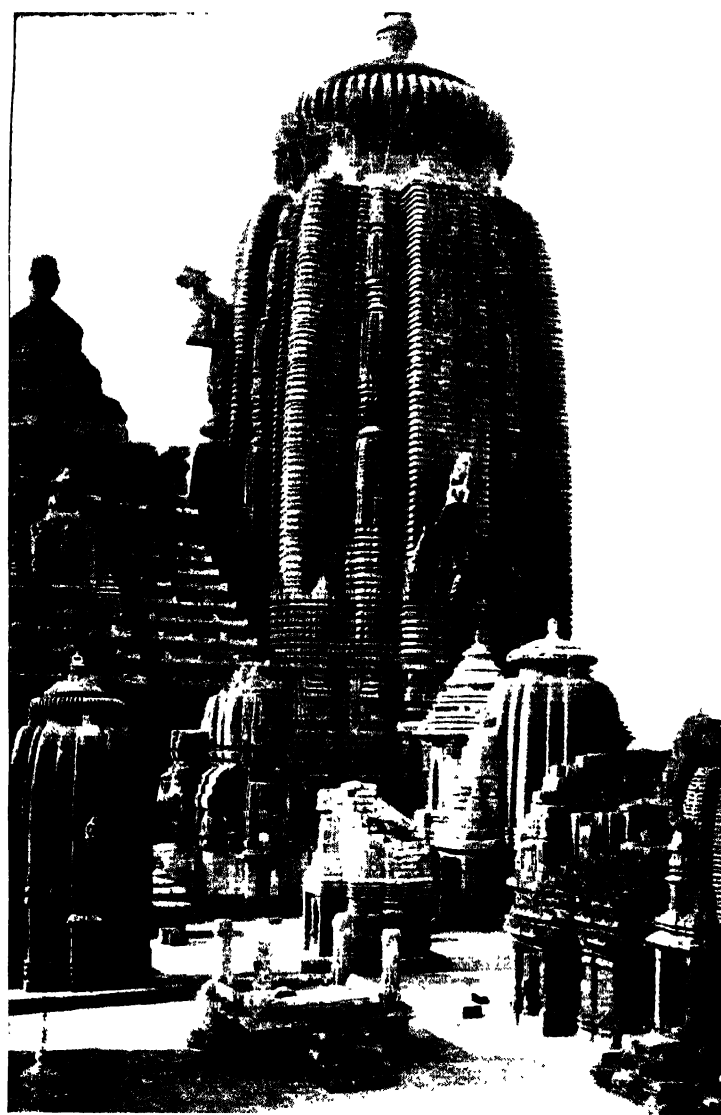
লিঙ্গরাজ-মন্দির—ভুবনেশ্বর

ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির মধ্যে লিঙ্গরাজের মন্দির সর্ব্ব-বৃহৎ। মন্দিরটি যেমন বৃহৎ তেমনই ইহার কারুকার্য্যেরও অন্ত নাই। লিঙ্গরাজের সমগ্র মন্দিরটি দেখিলে সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ফার্গুসান সাহেব লিখিয়াছেন, "The great temple of Bhuvaneswar, known as the Lingaraja, is one of the landmarks in the style. It is traditionally ascribed to a Lalatendra Kesari who is said to have ruled in the 7th cent. though this is mere fable. The temple may tentatively be ascribed to about the 9th or 10th century; but be this as it may, taking it all in all, it is perhaps the finest example of a purely Hindu temple in India." (H.I.E.A., Vol. II, page 99).

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির

প্রচলিত প্রবাদ-অনুসারে লিঙ্গরাজ মন্দির সপ্তম শতাব্দীতে রাজা ললাটেন্দ্রকেশরী-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ষ্টার্লিং সাহেব লিখিয়াছেন, খৃষ্টীয় ৬৫৭ অব্দে অন্যূন চল্লিশ বৎসর পরে লিঙ্গরাজ মন্দির-নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এম. এইচ. আরনট্ এই মত সমর্থন করেন। (Preface to the Photographs illustrating repairs executed to the temples at Bhuvaneswar).

ডাক্তার লে বোঁ সপ্তম শতাব্দীর শেষাংশ মন্দিরের নির্ম্মাণ-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। কামসূত্রের ইংরেজী অনুবাদকের মতে ভুবনেশ্বরের শৈবমন্দির অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। আধুনিক কোন কোন পণ্ডিতের মতে "ত্রিভুবনেশ্বরের

মন্দির খৃষ্টীয় নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত বলিয়া বিশ্বাস জন্মে।” (শ্রীগুরুদাস সরকারের ‘মন্দিরের কথা’, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০)।

যে সময়েই লিঙ্গরাজ মন্দির নির্ম্মিত হউক না কেন ত্রিভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরটি যে হিন্দু-ভারতীয় বা ভারতীয়-আর্য্য (Indo-Aryan) স্থাপত্য-পদ্ধতির এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন তাহা এল. ডি. বার্নেট্ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। (Dr. L. D. Barnett's 'Antiquities of India,' p. 239).

লিঙ্গরাজ মন্দিরের আয়তন ২১০′ লম্বা, ৬০′ হইতে ৭৫′ চওড়া এবং ১৮০′ উচ্চ। “উড়িষ্যার মন্দিরগুলি এক চূড়ার বা বিশাল স্ফীতোদর বিমান ও পার্শ্বদেশের উর্দ্ধাধঃ ভগ্নতার (curvature) পরিকল্পনায় গঠিত।” মূল মন্দির বা বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির এবং ভোগমণ্ডপ এই চারি ভাগে বিভক্ত। নাট- ও ভোগ-মণ্ডপ পরবর্ত্তী কালে সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। ভোগমণ্ডপটি ৭০′×৬৩′, নাটমন্দিরটি ৬১′×৭৮′ ও জগমোহনের আয়তন ৬৫′×৪৫′। গর্ভমন্দিরের মধ্যে যে বৃহদাকারের লিঙ্গ অবস্থিত তাহা একখণ্ড গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহার ব্যাস ৮′ এবং সেটি ৯′ উচ্চ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিশক্তির ছায়া ইহাতে রহিয়াছে।

জগমোহনটি উড়িষ্যার রাজা যযাতি কেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কথিত আছে যে রাজা যযাতি মগধের গুপ্ত-রাজগণের অধীন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বকালে ভুবনেশ্বরে বৌদ্ধ-প্রাধান্য ছিল, তিনি হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের প্রাঙ্গণ সর্ব্বসমেত ৩৬৬ হাত দীর্ঘ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রস্থে ২৬৬ হাত, চারিদিকে ৫ হাত উচ্চ প্রাচীর। সমস্ত অংশই বিনা মসলায় কেবল প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ফার্গুসান সাহেব বিমানগাত্রস্থ কারুকার্য্য দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, খোদাই কাজ কাঠের রথের অনুকরণেই নির্ম্মিত এবং ইহাতে দ্রাবিড় পদ্ধতিতে মন্দির-নির্ম্মাণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্থাপত্য-শিল্পের জন্য প্রস্তর ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে কাঠই যে মন্দির-নির্ম্মাণের প্রধান উপাদান ছিল এই কথা অনুসন্ধানী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ভুবনেশ্বরের ওড্র-স্থাপত্যকলায় উড়িষ্যার শিল্পিগণের আশ্চর্য্য প্রতিভা দেদীপ্যমান।

স্থাপত্যের দিক্ দিয়া উৎকলের মন্দিরগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—'মুক্তেশ্বরে'র স্তম্ভহীন মন্দিরই প্রথম শ্রেণীর দেউলের প্রাচীনতম আদর্শ। ফার্গুসান ইহাকে 'জুয়েল অব উড়িষ্যিয়ান আর্ট' বলিয়াছেন। লিঙ্গরাজ মন্দির দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত, শিখর-সংযুক্ত ও অত্যুচ্চ। তৃতীয় শ্রেণীর মন্দিরগুলি সমস্তই স্তম্ভযুক্ত, বহুকারুকার্য্যমণ্ডিত। 'রাজা-রাণী'র মন্দিরই এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভুবনেশ্বরের অধিকাংশ মন্দিরে বিশেষতঃ প্রধান প্রধান মন্দিরগুলিতে বা মণ্ডপে স্তম্ভ ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাই এখানকার মন্দির-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য।

মন্দিরের গাত্রস্থ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অষ্ট সখী, অষ্ট দিক্পাল, কার্ত্তিক, গণেশ ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তিগুলি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপথে পড়িয়া থাকে। কার্ত্তিকমূর্ত্তি পশ্চিমের কুলঙ্গীতে, পার্ব্বতী-মূর্ত্তি উত্তরের খাঁজে এবং গণেশ দক্ষিণের বাঁকে অবস্থিত।

অষ্ট দিক্‌পালের মধ্যে ইন্দ্র, যম. নৈঋর্ত, বরুণ ও পবন বৈদিক দেবতা—তাহাদের বাহন মেষ, হস্তী, মহিষ, মানব, মকর ও মৃগ। বরুণের দুইপার্শ্বে মকরবাহিনী গঙ্গা ও কূর্ম্ম-বাহিনী যমুনামূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। দেউলের পার্ব্বতী-মূর্ত্তিটি বড়ই মনোহর।· এমন সুন্দর স্ত্রীমূর্ত্তির পরিকল্পনা এবং সৌন্দর্য্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভাস্কর্য্য, এরূপ সুশোভন কলা-কৌশল ক্কচিৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু মূর্ত্তিটির হস্ত চারিটির মধ্যে একটিও বিদ্যমান না থাকায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের নিদর্শন অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। কার্ত্তিকের মূর্ত্তিটি তরুণ সেনাপতির সগর্ব্ব ও বীরোচিত মূর্ত্তি।

এখানে একটি বীর ও বীরজায়ার সুন্দর মূর্ত্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন। সশস্ত্র এক যোদ্ধা বাহু-দ্বারা তাঁহার প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মূর্ত্তির পরিকল্পনা যেমন স্বাভাবিক তেমনি প্রেমব্যঞ্জক। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে কোথাও অশ্লীলতার চিহ্ন নাই। স্বাধীন ভারতের নর-নারীর এমনই বীরত্বব্যঞ্জক তেজোদীপ্ত বপু ছিল।

লিঙ্গরাজ দেবের দেউলের বহির্গাত্রে বহু নগ্ন ও মৈথুন-মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। দেবতার মন্দিরে এইরূপ মৈথুন-মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিবার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য লইয়া বহু মনীষী প্রতিকূল ও অনুকূল সমালোচনা করিয়াছেন। যে শিল্পী তাহার সাধনার দ্বারা জড় পাথরের মধ্যে সজীব রূপ দিতে পারে, তাহার রুচি কি এমনই কদর্য্য ছিল যে এইরূপ মৈথুন-চিত্র ক্ষোদিত করিয়া তাহার প্রতিভার অপব্যবহার

করিবে? নিশ্চয় ইহার গুহ্য মর্ম্ম আছে, যে জন্য সেই যুগের সাধকেরা মানব-কল্যাণের হিতেই এমন মৈথুন-চিত্র ও প্রেমপূর্ণ রস-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

দর্পণধারিণী নগ্না স্ত্রীমূর্ত্তি, লেখনীধারিণী রমণীমূর্ত্তি, শিশুকোলে মাতৃ-মূর্ত্তি পরম রমণীয়। তদনুরূপ মূর্ত্তি এই ভুবনেশ্বর হইতে আনীত কলিকাতার মিউজিয়াম গৃহে রক্ষিত আছে। উড়িয়া ভাস্করেরা শুধু পাথর কাটিবার কসরৎ করিতে নিপুণ ছিলেন না তাঁহারা স্ব স্ব পরিকল্পনায় প্রাণ সঞ্চার করিতে সুদক্ষ ছিলেন। বাটালির আঘাতে মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি-স্ফুরণে তাঁহারা যথেষ্ট কৃতিত্ব-প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি অপেক্ষা এইসব মূর্ত্তিগুলি অধিকতর সৌন্দর্য্যকলায় বিভূষিত। দেবমূর্ত্তি-তক্ষণে শিল্প-শাস্ত্রের অনুশাসন মানিতে হয়, এইপ্রকার মূর্ত্তি-গঠনে উড়িয়া শিল্পিগণ স্বাধীন পরিকল্পনা খাটাইতে সমর্থ হওয়াতে এই মূর্ত্তিগুলি অতি মনোরম ও ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে। সাঁচী ও অমরাবতীর স্ত্রীমূর্ত্তির ন্যায় এইগুলি বহু অলঙ্কারে শোভিত, কিন্তু সবই প্রায় নগ্ন, পরিধেয় বস্ত্রের চিহ্ন নাই। ললিত-কলার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্যই যে মূর্ত্তিগুলি বিবস্ত্রা তাহা এক ইংরাজ শিল্পী লিখিয়াছেন –

"The prevailing character of these bas-reliefs is not due so much to ethnic or social causes as to the exigencies of Art—desire to display the female contour in all its attractions—"

শিশুক্রোড়ে জননীর মূর্ত্তি নারীর মাতৃত্বের এক অপরূপ ছবি। প্রস্তর-ক্ষোদিত বাৎসল্য-রসের উন্মেষক ভারতীয় মূর্ত্তিগুলি ইয়োরোপীয় ম্যাডোনা মূর্ত্তি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। এই মূর্ত্তিগুলি যেমন স্নেহময় তেমনি মনোরম। এই মাতৃ-মূর্ত্তিগুলি প্রায়ই কৃষ্ণ-যশোদার মূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত ও পূজিত হয়। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রথম খণ্ডে ও শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রূপম্' পত্রিকার ১৯২০ সালের এপ্রিল সংখ্যায় মাতৃমূর্ত্তি-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় শিল্পিগণ বাৎসল্য-রস-সৃষ্টিতে বিশ্বের শিল্পিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনেরই অধিকারী।

শুধু স্ত্রী-মূর্ত্তি কেন, তৈজসপত্র, আসবাব, অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যকলা-বিষয়ক চিত্রগুলিও অতি নিপুণতার সহিত ক্ষোদিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে যে শুধু উড়িষ্যার সভ্যতার ও সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, উড়িয়া সীমন্তিনীগণের ললিত-কলায় পারদর্শিতার ছবিও চিত্তে উদ্ভাসিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ভুবনেশ্বরের মূর্ত্তি-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্ম্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্ত্তি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। * * *

"মানুষ এই প্রস্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা সেই বহু দূরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"সে কথা এই—দেবতা দূরে নাই, গির্জ্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, মিলন-বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁর চিরন্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহঃ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনকালে নূতন নহে, কোন কালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তমান অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সততা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না। কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্য সত্য প্রকাশ পাইতেছে।" (বঙ্গদর্শন, ১৩১০, পৌষ)

উড়িষ্যার মন্দিরগুলির চূড়া প্রায় একই ধারায় নির্ম্মিত, অত্যুচ্চ ও মোটা গোলাকৃতি। লিঙ্গরাজ মন্দিরটি দূর হইতে পর্ব্বতের ন্যায় বিপুলকায় দেখায়। ভিত হইতে ১৮০ ফুট উচ্চের চূড়ার কলস পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-মণ্ডিত। চূড়ার গাত্রে সুকৌশলে অনেকগুলি খাঁজ খাড়াইভাবে (Vertical section এ) কাটা রহিয়াছে, সেইজন্য ইহাকে ত্রিতল বা চারিতল বলিয়া ভ্রম হয়। গাত্রে খাড়াভাবে মাঝে মাঝে খাঁজ (horizontal ribs) কাটা আছে। ইহার দ্বারা একঘেয়ে ভাব বিদূরিত হইয়াছে। মন্দিরগাত্র হইতে বাহির হইয়া চারিপার্শ্বে কতকগুলি শার্দ্দূলমূর্ত্তি মুখ ব্যাদান করিয়া কেশরী-রাজবংশের বীরত্বের মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

'কীর্ত্তিমুখ' বলিয়া পরিচিত যে এক প্রকার বিকট দংষ্ট্রাবিশিষ্ট মুখাকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের 'রূপমে' বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীগুরুদাস সরকার তাঁহার 'মন্দিরের কথা' নামক পুস্তকের ৩য় খণ্ডে ৩৪ পৃষ্ঠায় নৃত্যশীলা রমণী ও মৈথুনরত মূর্ত্তির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ইহা ছাড়া নৃত্যশীলা রমণী ও মিথুন-মূর্ত্তির অভাব নাই। ইহার মধ্যে কতকগুলি আবার কোনারকের কামলীলা-পরিচায়ক মূর্ত্তিসমূহের ন্যায় নিতান্ত কদর্য্যভাবসম্পন্ন। সে যাহা হউক ললিতকলার দিক্ দিয়া মন্দির-ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমাদের ক্ষুদ্র লেখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব নহে।" তিনিই ঠিক বলিয়াছেন—"Idealism অথবা ভাবপ্রবণতাই ভারতীয় শিল্পের প্রাণ। ভারতীয়গণ কখনও বাস্তবের হুবহু নকলে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। শিল্পশাস্ত্রোক্ত তালমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অমসৃণ প্রস্তরাদিতেও তাঁহারা অপূর্ব্ব সুষমার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জনৈক লেখকের মতে শুধু পার্ব্বতীর গাত্রবসনখানিতে যেরূপ অত্যুৎকৃষ্ট কারুকার্য্য রহিয়াছে তাহা দর্শন করিলে শিল্পিগণকে 'অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন' বলিতে কুণ্ঠা বোধ হয় না।" ('মন্দিরের কথা', ৩য় খণ্ড, ৫৪ পৃঃ)।

বৃত্তাকার উচ্চশিখর স্কন্ধের চারিধারে চারিটি সিংহ ও চারিটি রাক্ষসীমূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহারই উপর ৬৪ খাঁজযুক্ত গম্বুজ এবং তদুপরি কলস অবস্থিত। ইহার সহিত আমলকী ফলের

সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাকে "আমলা"শীলা কলস বলা হয়। কিন্তু হ্যাভেল সাহেবের মতে ইহা বৈষ্ণবদিগের আদরণীয়, পরম পবিত্র নীলপদ্ম-পুষ্পের বীজের ন্যায়, সুতরাং আমলকী ফলের সহিত 'আমলাশীলার' সাদৃশ্য তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তবে তিনি তাহার 'শিখর' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"এই আমলার ন্যায় আকৃতিযুক্ত অলঙ্কার অশোকস্তম্ভের শিরোদেশেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

লিঙ্গরাজ মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু লর্ড কার্জ্জন সাহেব মন্দির-পরিদর্শনের সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পরিদর্শনের জন্য যে মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, আজও তাহা অবস্থিত রহিয়াছে।

নাট-মন্দির ও জগমোহনের কারুকার্য্য-সম্বন্ধে ফার্গুসান সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন—

"All that power of expressions is gone which enabled the early architects to make small things look gigantic from the exuberance of labour bestowed upon them. A glance at the Nata-Mandir is sufficient for the mastery of its details. A week's study of the Jagamohan would every hour reveal new beauties." (H.I.E.A., Vol. II, p. 103.)

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ব্যতীত ছোট-বড় অনেকগুলি মন্দির একই ধারায় ও সাদৃশ্যে নির্ম্মিত। সেইগুলির মধ্যে রাজরাণী ও মুক্তেশ্বর মন্দির অতিশয় সুন্দর। তাহাদের

গাত্রের কারুকার্য্য উড়িষ্যা ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ অবদান। "The details are of the most exquisite beauty, it (Raja Rani) is one of the gems of Orissa Art." (*Ibid*, page 104).

ভুবনেশ্বরের নিকটে ৪ মাইল পশ্চিমে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহা অবস্থিত। এইখানকার গুহাগুলির কারুকার্য্য যেমন ছবির মত সুদৃশ্য তেমনই প্রাচীন জৈন-স্থাপত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উদয়গিরির গুহাতে হাতীগুম্ফা বলিয়া যে গুহাটি আছে তাহাই সর্ব্বপ্রাচীন; এই গুহাটির দ্বারের বিস্তৃত শিলালিপি হইতেই ইহার প্রাচীনত্ব স্থিরীকৃত হয়। কলিঙ্গরাজ খরভেলা জৈন সন্ন্যাসীদের বাসস্থানের ও সাধনার আসন পাতিবার উদ্দেশ্যে এই গুহাগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণি গুহা-নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষ খৃঃ পূঃ ১৫৫ অব্দ গুহাটির নির্ম্মাণকাল বলিয়া শিলালিপিতে ক্ষোদিত আছে।

উদয়গিরির ব্যাঘ্রগুম্ফা

উদয়গিরিতে উনিশটি গুহা বর্ত্তমান—রাণী হংসপুরা, ভজঘারা, ছোট হাতীগুম্ফা, অলকাপুরী, জয়া-বিজয়া, ঠাকুরাণী, পাংশাগুম্ফা, পাতালপুরী, মঞ্চপুরী, গণেশগুম্ফা, ধনগড়, হাতীগুম্ফা, সর্পগুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা, জম্বেশ্বর, হরিদাসগুম্ফা, জগন্নাথ ও রামুই।

খণ্ডগিরির গুম্ফাগুলির নাম—তত্ত্বগুম্ফা, তেন্তুলী, অনন্তগুম্ফা, খণ্ডগিরিগুম্ফা, ধনগড়, নবমুনি, বারভুজী, ত্রিশূলগুম্ফা, জৈনগুম্ফা, ললাটেন্দ্রগুম্ফা ও আকাশগঙ্গা।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হাতীগুম্ফাটি সর্ব্বপ্রাচীন ও জৈন গুহা। ইহা সাঁচীর ও ভারুট স্তূপের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন। এই গুহাগুলিতে বৌদ্ধ-স্থাপত্য বা -ভাস্কর্য্যের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। গজলক্ষ্মী, শ্রী, সর্প, পবিত্র বৃক্ষ, স্বস্তিকা-আদি ধর্ম্মমত-প্রতিরূপ চিহ্নগুলি যদিও বৌদ্ধশিল্পীরাও ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি এইগুলি জৈনরাই বেশীরভাগ তাঁহাদের ধর্ম্মমতের প্রতিরূপ চিহ্নরূপে ব্যবহার করিতেন। এই গুহা-গুলির মধ্যে চব্বিশটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে।

সর্পগুহাটির সম্মুখের দ্বারের উপর বৃহৎ অজগর সর্প তিনটি ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ইহাতেও হাতী-গুম্ফারই মত প্রাচীন শিলালিপিতে 'চুলাকম্'এর কুটীর (the unequalled chamber of chulakam) উৎকীর্ণ আছে।

হরিদাস-গুহাটি বেশ বড় ঘর, ইহার তিনটি দ্বার এবং সম্মুখের বারাণ্ডা পর্ব্বতের অভ্যন্তরেই ক্ষোদিত হইয়াছে। গণেশ-গুম্ফা এবং রাণী-গুম্ফ এখানকার গুহাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ। রাণী-গুম্ফাটি রাণী হংসপুরা, রাণী-কা-নায়ুর নামেও খ্যাত। কিংবদন্তী আছে যে, ইহা রাজা ললাটেন্দ্র কেশরীর রাণী সপ্তম খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে ভ্রমণের সময়ে কলিঙ্গ দেশ জৈনদের প্রধান আড্ডা ছিল বলিয়া হিউয়েন সাং লিখিয়া গিয়াছেন। (Beal-এর 'বুদ্ধিষ্ট রেকর্ড', দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২০৮।) রাণী-গুম্ফাটির দুইধারে কাষ্ঠের বারাণ্ডার ভগ্ন অংশ এখনও দেখা যায়।

সেখানকার একটি প্রাচীন গুহা বেশ বৃহদায়তনের এবং

দ্বিতল। দুইটি তলায় বারাণ্ডা ছিল। উপর তলা ৬৩ ফুট লম্বা, ৪টি কুঠরিতে বিভক্ত, দ্বারগুলি উন্মুক্ত, নিম্নভাগ ৪৩ ফুট লম্বা, তিনটি দ্বারযুক্ত। দ্বারগুলির তলাঞ্চি অন্দরের দিকে ঢালু করা। ইহার নির্ম্মাণ-পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে গুহাগুলি খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হয়। উপরের বারাণ্ডার নয়টি স্তম্ভের মধ্যে এখন মাত্র দুইটি বর্ত্তমান আছে। নিম্নের ছয়টি স্তম্ভই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ব্যাঘ্র-গুম্ফাটি অপূব্ব বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। একখানি বৃহৎ পর্ব্বতখণ্ড বাঘের মাথার আকারে ছাঁটিয়া গুহামুখটি উন্মুক্ত-দন্ত ব্যাঘ্রের মুখ-গহ্বরের মত করা হইয়াছে। এই মুখবিবরই অভ্যন্তরস্থ কুঠরির দ্বারস্বরূপ। পর্ব্বতবক্ষে ঘরটি ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি অভ্যন্তরে ঢুকিয়া গিয়াছে। ইহার গঠন-প্রণালী খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের।

খণ্ডগিরির নিম্নভাগে তত্ত্ব-গুম্ফাটি বেশ বৃহদায়তনের, ইহা ১৬½ ফুট লম্বা ও ১৮ ফুট প্রস্থ এবং ইহা পর্ব্বতের ভিতরে ১৭ ফুট ঢুকিয়া গিয়াছে; ইহা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি উঁচু। থামগুলির শিরোদেশে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা রহিয়াছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের মূর্ত্তি পিছনের প্রাচীরে শোভা পাইতেছে।

খণ্ডগিরির গুহা

ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিবার সময়ে উদয়গিরি ও খণ্ড-গিরির গুহাগুলি দেখা কর্ত্তব্য। এগুলি হইতে প্রাচীন স্থাপত্যের একটি ধারার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

উড়িষ্যার প্রধান প্রধান মন্দিরের তালিকা ও তাহাদের

আনুমানিক গঠনের সময় দেখিলে উড়িষ্যার মন্দির-গঠনের শিল্পধারার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে : —

নির্ম্মাণের সময়	মন্দির	নির্ম্মাণের সময়	মন্দির
৬৭০—৯০০খৃ:	পরশুরামেশ্বর	একাদশ শতাব্দী	নাকেশ্বর
	শিশিরেশ্বর		ভাস্করেশ্বব
	কপালিনী		রাজারাণী
	উত্তরেশ্বর		চিত্রকর্ণী
	সোমেশ্বর		কপিলেশ্বর
৯০০—১০০০খৃ:	সারি দেউল	দ্বাদশ শতাব্দী	রামেশ্বর
	মুক্তেশ্বর		যমেশ্বর
	লিঙ্গরাজ		মৈত্রেশ্বর
	কেদারেশ্বর	১১০০ খৃষ্টাব্দে	জগন্নাথ (পুরী)
	সিদ্ধেশ্বর		মেঘেশ্বর
	ভাগ্যবতী	ত্রয়োদশ শতাব্দী	বাসুদেব (বিন্দুসাগর)
	সোমেশ্বর		সূর্য্যমন্দির (কোনারক)
	ব্রহ্মেশ্বর		নাটমণ্ডপ (ভুবনেশ্বর)
	মুক্ত-লিঙ্গেশ্বর		বিষ্ণু (কটক)
	বিরজা (জাজপুর		গোপীনাথ (রেমুনা)
	মার্কণ্ডেশ্বর (পুরী)		

সবগুলি মন্দিরই একই পরিকল্পনায় গঠিত। একমাত্র উচ্চ গোলাকার স্ফীতোদর বিমানটি ভূমি হইতে সোজা উঠিয়াছে ; কোন তলায় বা ধাপে এই স্থাপত্য বিভক্ত হয় নাই,

কিন্তু দ্রাবিড় বা আর্য্য-পদ্ধতির মন্দিরগুলি তলায় বিভক্ত থাকে। উড়িষ্যার মন্দিরের সহিত কোন মণ্ডপ সংযুক্ত থাকিত না। অবশ্য সূর্য্য, লিঙ্গরাজ ও জগন্নাথের মন্দিরের সহিত যুক্ত যে সব নাট- বা ভোগ-মণ্ডপ দেখিতে পাওয়া যায় সে সমস্তই মূল মন্দির নির্ম্মাণের অনেক পরবর্ত্তী সময়ে গঠিত হইয়াছে। সেই জন্য উড়িষ্যার এই স্থাপত্য-পরিকল্পনায় দেউলের কোন অংশ মূল-মন্দির হইতে বাহির করিয়া তজ্জন্য স্তম্ভ ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাই উড়িষ্যায় মন্দির-স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এইস্থানেই দ্রাবিড় ও আর্য্য-স্থাপত্যের সহিত উড়িষ্যার স্থাপত্যের প্রভেদ। দ্রাবিড়-পরিকল্পনায় মন্দিরগুলির বিমান তলায় তলায় বিভক্ত হইয়া ধাপে ধাপে উঠিয়াছে এবং ঐরূপ মন্দিরে নানা হর্ম্ম্য সংযুক্ত আছে. তাহাতে স্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ মন্দিরে শত বা সহস্র স্তম্ভযুক্ত একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত আছে।

উড়িষ্যা-প্রদেশে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের উপর ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি পরিদর্শন

পথ

করা যায়। এক সময়ে এই স্থান বিশাল জনপদ ছিল, এখন জনবিরল তীর্থমাত্র। এইখানের বিন্দুসরোবর ও মুক্তেশ্বর মন্দিরের দুধসরোবর দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহাদের জলও তেমনই স্বচ্ছ ও উপকারী। ভুবনেশ্বরের ঝরণার ও ইঁদারার জল পান করিলে হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায়। মন্দাগ্নি ব্যাধি-প্রপীড়িত ব্যক্তিরা এই স্থানে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আগমন করিয়া থাকেন।

কোনারকের সূর্য্যমন্দির

"ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলির কোনটি সাগর-সরিৎ-সঙ্গমে, কোনটি গিরিশিখরস্থ চিরন্তন তুষারমধ্যে, কোনটি বা জনবিরল সমুদ্র-কূলে অবস্থিত। এই সকল স্থানে অনন্তের ছায়া প্রতীয়মান হয়, এবং মানবহৃদয়ও তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে। তাই মানব তথায় তার নিজকৃত মন্দির, মূর্ত্তি এবং সুন্দর ক্ষোদিত প্রস্তর-ফলকসমূহে যেন লিখিয়া রাখিয়াছে—'আমার কথা শ্রবণ কর—আমি অমৃত পুরুষের সন্ধান পাইয়াছি।' মানবের ব্যক্তিত্বের যতই বিকাশ হয় এ অপূর্ব্ব আলোক ততই দূরে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। শিল্পরাজ্যও ততই তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া অজ্ঞাত দেশে প্রসার লাভ করিতে থাকে। তাই শিল্প-সৌন্দর্য্যের নিদর্শন দ্বারা তাহার জগৎ-জয়ের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছে। তাই যে সকল স্থানে কোন শব্দ শ্রুত হয় না, কোন বর্ণই নয়ন-গোচর হয় না, সেখানেও এই নিদর্শনগুলি বিরাজমান। গুহা-নিহিত অন্ধকারও তাই মানব আত্মাকে শান্তি-সুখ দান করিয়াছে ও তদ্বিনিময়ে শিল্পের মোহন মালায় নিজ শির অলঙ্কৃত করিয়াছে।" (শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক Tagore's Personality পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠার অনুবাদের অংশ।)

কোনারকের সূর্য্যমন্দিরের শিল্পীও নিজ শির শিল্পের মোহন মালায় অলঙ্কৃত করিয়া অমর হইয়াছে। এই মন্দিরের শিল্প ঐশ্বর্য্যের কথা যত অধিক বলা বা লেখা হইয়াছে ভারতের

22—1804B.

অন্য কোন মন্দিরসম্বন্ধে তত লেখা হয় নাই। ইংরাজি, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক ছাড়া কোনারকের বিবরণ বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার তাঁর 'মন্দিরের কথা' পুস্তকে নানা দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার রায় সূর্য্যমন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বহু প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্যপূজার প্রচলন সমগ্র উত্তর-ভারতে ছিল, তাহার নিদর্শন কাশ্মীরের অতি প্রাচীন 'মার্ত্তণ্ড'-মন্দির ও সূর্য্যের রথাকৃতির এই "কোণার্কের" মন্দির। দ্বাদশ শতাব্দীর পর এই সূর্য্যপূজা 'সূর্য্য-নারায়ণ' অর্থাৎ বিষ্ণু-পূজায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

'আইনী আকবরী'তে আবুল ফজেল লিখিয়াছেন (Gladwin's translation, Vol. II, p. 16) যে, নরসিংহ দেব (প্রথম) এই মন্দিরটি ৭৩০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ আন্দাজ ৮৬০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—"It is said that somewhat over 730 years ago Raja Narsing Deo completed this stupendous fabric and left this mighty memorial to posterity." ফার্গুসান সাহেবেরও মতে এই মন্দির ৮৬০ খৃঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। (হি. আই. ই. আ., ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬)। কিন্তু ষ্টার্লিং সাহেব একটি তাম্রলিপিতে উৎকীর্ণ লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নরসিংহ দেব (প্রথম) ১২৩৮ খৃঃ হইতে ১২৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারই রাজ্যকালে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পাকা প্রমাণও সঠিক বলিয়া সন্দেহ হয়, কারণ পুরীর

জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহার স্থাপত্য ও গঠন-পদ্ধতি কোনারকের মন্দিরের অনেক পরবর্ত্তী সময়ের ও নিম্নস্তরের। নিশ্চয়ই পুরীর মন্দিরের অনেক পূর্ব্বে কোনারকের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মাদলা-পঞ্জীর মতেও নরসিংহ দেব রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে (১২৫৬ খৃঃ) কোণার্ক-মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

সূর্য্যদেবের রথের পরিকল্পনায় কাল পাথর দিয়া মন্দিরটি রথের আকারে নির্ম্মিত। আটটি চক্র চারিপার্শ্বে ক্ষোদিত আছে। চক্রগুলি আকারে বৃহৎ; ধূরী, কাঠি ও বেড়ে নানা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে অনেক মন্দির কাষ্ঠের রথের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। মহাবলিপুরমের যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, সহদেব ও দ্রৌপদীর মন্দিরগুলি পঞ্চপাণ্ডবের রথ বলিয়া পরিচিত।

কোনারকের 'সূর্য্য' ও পুরীর 'জগন্নাথের মন্দির', দুইটিই সমুদ্রকূলে এবং অত্যুচ্চ, সূর্য্যমন্দির কাল পাথরের এবং জগন্নাথের মন্দির শ্বেত-আস্তরমণ্ডিত। সমুদ্রগামী অর্ণবপোতের নাবিকগণ বহু দূর হইতে মন্দির দুইটি দেখিয়া তাহাদের গম্যস্থান নির্দ্দেশ করিত। জাহাজের ইয়োরোপীয় কাপ্তেনরা কোনারকের মন্দিরটির "ব্লাক প্যাগোডা" এবং জগন্নাথের দেউলটির "হোয়াইট প্যাগোডা" নাম দিয়াছিল।

মূল-মন্দিরের অন্দরের মেঝে ৪০′ × ৪০′ সমচতুষ্কোণ আকারের। এই হর্ম্ম্যটি চল্লিশ ফুট উচ্চ একেবারে সোজা উঠিয়া গিয়া স্তরে স্তরে কাটান ধাপে ক্রমশঃ অল্পপরিসর হইয়া উঠিয়া চল্লিশ ফুট হইতে বিশ ফুটে পরিণত হইয়াছে।

এখানে ব্রাকেটের উপর ছাদ ন্যস্ত রহিয়াছে। ফোকরের উপর ছাঁটাই সমতল একটি প্রস্তর রক্ষিত হইয়াছে। ইহাই ছাদের তলা (সিলিং)-রূপে ব্যবহৃত। সমস্ত ছাদ লৌহ বিমের উপর ন্যস্ত। ষ্টার্লিং সাহেব বিমের মাপ ১৮′ লম্বা ও ১২″×১২″ বেড় দিয়াছেন। কিন্তু ফার্গুসান এই বিম ২৩ ফুট লম্বা ও ৮″×৯″ মোটা লিখিয়াছেন। এখন বিমগুলি মেঝের উপর পড়িয়া আছে। সেই প্রাচীন কালেও ভারতের হিন্দু স্থপতিরা এমন সুদৃঢ় লৌহ বিম প্রস্তুত করিতে পারিতেন, ইহা যেমন বিস্ময়কর তেমনই রহস্যময়, এত দিনের জলবায়ুর পীড়নে বিমগুলির গাত্রে মর্‌চা পড়ে নাই। এই সব উৎকৃষ্ট শিল্প উৎপাদনের প্রাচীন প্রথা এখন আর ভারতবাসীরা জানে না, এবং তাহা জানিবারও উপায় নাই। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক ইহা উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে (১৯৩৯-৪১ খৃঃ) জার্ম্মানরা যে সব অভিনব যুদ্ধোপকরণ ব্যবহার ও উৎপাদন করিতেছেন তাহার অনুরূপ এই আজব দেশের শাস্ত্রে, পুরাণে, মহাকাব্যে বর্ণিত রহিয়াছে। শব্দভেদী বাণ, পুষ্পক রথ, মেঘের অন্তরালে যুদ্ধ প্রভৃতির কথা ভারতবাসী অবগত আছে।

কোনারকের মন্দিরের গঠন-পদ্ধতি বিশেষতঃ ইহার 'কোণ', 'খাঁজ', 'বাঁক', 'ছেদভেদ' অতি সুষ্ঠু ও সুবিবেচনার সহিত গঠিত হইয়াছে। ফার্গুসান সাহেব ইহার স্থাপত্য-কৌশল বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের কোন স্থপতি বা শিল্পী এই মন্দিরের স্থাপত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কলাকৌশলের পরিচয় দিতে সমর্থ হয় নাই। "There is so far as I

know, no roof in India where the same play of light and shade is obtained with an equal amount of richness and constructive propriety as in this instance, nor one that sits so gacefully on the base that supports it." তিনি আরও বলিয়াছেন, হিন্দুরা তাঁহাদের দেবতার মন্দির গঠনের নিমিত্ত কেমন অকাতরে অজস্র শক্তি ব্যয় করে তাহারই নমুনা এই কোনারকের মন্দির—"It seems to be only another instance of that profusion of labour which the Hindus loved to lavish on the temples of their gods." (H.I.E.A., Vol. II, p. 107).

মন্দিরের যে স্থানে সূর্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল সে অংশ পতিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ক্লোরাইট প্রস্তরের বেদীটি এখনও অবস্থিত। এই বেদী দৈর্ঘ্যে ১৭' ফুট ও প্রস্থে ৯' ফুট ; বেদীর গাত্রে, খাঁজে, গড়নে (মোল্ডিংএ) ও কার্নিসে লতা-পাতা ও নারীমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। কোন রমণী চামর ঢুলাইতেছে, কেহ বা অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে, কোন স্থানে রমণী-মণ্ডলী যুক্তকরে দেবারাধনায় গমন করিতেছে। কতকগুলি পুরুষমূর্ত্তিও দেখা যায়, তাহার মধ্যে কোন কোন মূর্ত্তি নৈবেদ্য ও পুষ্পপাত্র বহন করিয়া চলিয়াছে, কোনটি বা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যুক্তকরে দণ্ডায়মান। বেদীর চারি কোণে চারিটি তেজস্বী কেশরীমূর্ত্তি বিরাজিত। কুলঙ্গী ও খাঁজগুলিতে নানাবিধ জীবজন্তু খোদাই করা রহিয়াছে। উক্ত শশক, ভেক, মৃগ, হস্তী, সর্প আদি সকল জন্তুর মধ্যেই এক মহাতেজ

বিদ্যমান। কলিঙ্গ-তক্ষণশিল্পের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন এই বেদীর কারুকার্য্য। স্বর্গীয় মনোমোহন গাঙ্গুলী তাঁহার "উড়িষ্যা এণ্ড হার রিমেন্স" গ্রন্থের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় এই বেদীর কারুকার্য্যের বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন।

মন্দিরের শিখরাংশের প্রস্তরখণ্ডে তিনটি অপূর্ব্ব সূর্য্যমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। পশ্চিম ও দক্ষিণের মূর্ত্তিদ্বয় দণ্ডায়মান, একটির মস্তকে মুকুট, অন্যটির শিরোভূষণ জটার ন্যায় লম্বা কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ। তৃতীয় মূর্ত্তি—সূর্য্যদেব অশ্বোপরি বসিয়া আছেন। সরকারী পূর্ত্ত-বিভাগ মন্দিরের দ্বারগুলি রুদ্ধ করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তর বালুকা ও প্রস্তরখণ্ড-দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

ডাঃ কুমারস্বামী লিখিয়াছেন যে—কোনারকের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের এরূপ নির্দ্দোষ সামঞ্জস্য জগতের অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ভিন্সেণ্ট স্মিথ সাহেব এই মন্দিরই মধ্যযুগের উড্র-শিল্পকলার শেষ অভিব্যক্তি ও চরম বিকাশ বলিয়াছেন।

মন্দিরে তিন থাক প্রশস্ত কার্নিস আছে, তাহার গড়নের উপর শিকার, শোভাযাত্রা, সাংসারিক গৃহস্থালী, হাট-বাজার, আমোদ-প্রমোদের নিখুঁত ছবি ক্ষোদিত হইয়াছে। কার্নিসের নীচে যে অবলম্বন (ব্রাকেট্) রহিয়াছে, সেগুলি .৮" চওড়া। কার্নিস লম্বায় ৩০০০ ফুট—মন্দিরের এই অংশে ছোট বড় প্রায় ৬০০ মূর্ত্তি খোদাই করা হইয়াছিল।

মন্দিরটি দক্ষিণ দেশের কাঠের রথের পরিকল্পনায় গঠিত। ভিতের গাত্রে আটটি রথচক্র বিদ্যমান। প্রত্যেকটি চক্রের

ব্যাস ৯'৮", ইহার কাঠি-গুলি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যমণ্ডিত। এক সময়ে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসবের ন্যায় কোনারকেও সূর্য্যদেবের রথ-উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। লক্ষ লক্ষ নরনারী দেশ-বিদেশ হইতে উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত সমবেত হইত। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব একটি বৌদ্ধদের অনুষ্ঠান বলিয়া লিখিয়াছেন।

'আইনী-আকবরী' গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদে মিঃ জেরেট সাহেব ১২৮ পৃঃ লিখিয়াছেন—মন্দিরের প্রাচীর ও বেষ্টনীর মধ্যে তিনটি তোরণ ছিল। পূর্ব্ব তোরণে দুইটি মত্ত হস্তী শুণ্ডের দ্বারা এক একটি নরমূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। পশ্চিম দ্বারে দুইটি সুসজ্জিত অশ্বোপরি দুইজন আরোহী বসিয়া আছে, পার্শ্বে এক এক জন অনুচর দণ্ডায়মান। অপর তোরণদ্বয়ের পার্শ্বে দুইটি শার্দ্দূল দুইটি হস্তীর উপর আক্রমণ করিবার ভঙ্গিমায় নির্ম্মিত রহিয়াছে।

মন্দিরের গাত্রে কারুকার্য্যের অন্ত নাই। পোস্তায় শ্রেণীবদ্ধ গজেন্দ্রের সারিবদ্ধ ভাবে মিছিলে গমন করিবার ভঙ্গি অতি চিত্তাকর্ষক। মন্দির-গাত্রে যে শত শত নারীমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে, সেইগুলি যেমন সুশ্রী তেমনই প্রীতিকর। বীণাহস্তা, মৃদঙ্গবাদ্যরতা ও নৃত্যশীলা রমণীমূর্ত্তিগুলির ভঙ্গী অত্যন্ত মনোহর, কমনীয় ও সুঠাম। ডাঃ কুমারস্বামী তাঁহার "আর্ট্স্ এণ্ড ক্রাফ্ট্স্ অব ইণ্ডিয়া এণ্ড সিলোন" গ্রন্থের ৭৫ পৃঃ তে লিখিয়াছেন, কোনারকের মন্দিরের গাত্রে নারী-মূর্ত্তিগুলি দেখিলে স্পষ্টই মনে হয় প্রেমিক ব্যতীত অপর কোন শিল্পী এরূপ রমণীর মূর্ত্তি গঠন করিতে সমর্থ হইবে না।

মন্দিরের গাত্রে আলম্বনের (frieze) উপর আলিঙ্গনবদ্ধ নাগ-নাগিনীগণের যুগলমূর্ত্তি বড়ই মনোহর। দেহের নিম্নভাগে সর্পাকৃতি পুচ্ছের লীলায়িত আবর্ত্তনে শিল্পীর সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও তাহার ভাবপ্রকাশের কৃতিত্ব বিশদভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

রিরংসা-দ্যোতক মিথুনমূর্ত্তি

অবশ্য মন্দিরগাত্রে বহু অশ্লীল মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার স্বপক্ষে বলিবার কিছু না থাকিলেও এইগুলি শিল্পীর নব নব পরিকল্পনার ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় প্রদান করে।

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"চির-যৌবনের হাট বসিয়াছে, চির-পুরাতন অথচ চির-নূতন কেলি-কদম্বতলে নিখিলের রঙ্গলীলা চলিয়াছে * * * এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্ব্বর নাই। পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান্ অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্ব্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যামসুন্দরের আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধনে চতুর্দ্দিক বেড়িয়া।" (পথে বিপথে, ১১৫ পৃঃ)।

গৃহ-নির্ম্মাণ-সময়ে অসৎ জনের কুদৃষ্টি হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য ভাড়ার বাঁশে ঝাঁটা ও ছেঁড়া জুতা কারিগরেরা ঝুলাইয়া রাখে—স্বর্গীয় মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন—সেইরূপ উড়িয়া শিল্পীরা প্রেতযোনির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় এইরূপ রিরংসা-ব্যঞ্জক মিথুন-চিত্র মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত করিত। (উড়িষ্যা এণ্ড হার রিমেন্স—২২৮ পৃঃ) ভিন্সেণ্ট স্মিথও তাঁহার ভারতীয় ললিত কলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, দুষ্ট প্রেতযোনি প্রভৃতি যাহাতে দেউলের সন্নিধানে

না আসিতে পারে, সেইজন্য এইরূপ মৈথুনচিত্র-তক্ষণের ব্যবস্থা। জার্ম্মান লেখক ক্রাফ্‌ট্ এবিবং লিখিয়াছেন—নৈতিকতত্ত্ব, ধর্ম্ম-জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধ সমস্তই আদিম মৈথুন-প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত। (Psychopathia Sexualis, p. 2.) হ্যাভেল সাহেবও তাঁহার 'আইডিয়্যাল অব্ ইণ্ডিয়ান আর্ট' গ্রন্থে ১৩৯ পৃষ্ঠায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন—মন্দির-ভাস্কর্য্যের এ অশ্লীলতা যে জাতীয় অধঃপতনের বা কুরুচির পরিচায়ক তাহা নহে। ব্লক সাহেব বলিয়াছেন, উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত চিত্রগুলি যতই অশ্লীল হউক না কেন, তাহার দ্বারা দেশবাসীদের দুর্নীতি-পরায়ণ বলিয়া নিন্দা করিলে বিশেষ অবিচার করা হইবে। (J.R.A.S., 1907).

স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনারকের অশ্লীল চিত্র দেখিয়া লিখিয়াছেন—"কবিহৃদয় মন্দির দেখিয়া মনে করে বিশ্ব-সংসারের বহিঃপ্রাচীরে আমরা এইরূপ ভাস্কর্য্যের মতন আপন জীবন-যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্ব-পাষাণে মুদ্রিত হইতেছি, কিন্তু বিশ্বের অন্তরের মধ্যে যে মহান্ দেবতা জাগিয়া বসিয়া আছেন এ মায়াবুদ্বুদ তাঁহার চরণে পহুছে না" (বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৫৬৬)।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩১০ সালের 'বঙ্গদর্শনে' এবং 'বিচিত্রপ্রসঙ্গে' ৭১ পৃষ্ঠায় মৈথুন-মূর্ত্তির সার্থকতার বিষয়ে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ের আলোচনান্তে 'রূপম্' পত্রিকায় শেষ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন।

23—1304B.

শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার তাঁহার 'মন্দিরের কথা' গ্রন্থের কোনারক পর্ব্বের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"ললিতকলার সহিত ধর্ম্মান্ধতা বা রুচি-বায়ু-গ্রস্ততার কোন সম্পর্ক নাই, তাই আধুনিক ইয়ুরোপীয় সমালোচকগণও এই 'ব্লাক প্যাগোডা'র যথেষ্ট স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন।"

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কোনারকে ২৮টি ছোট ছোট মন্দির মূল মন্দির বেষ্টন করিয়া ছিল। মূল মন্দিরের আয়তন তখন দৈর্ঘ্যে ৮৮৫ ফুট ও প্রস্থে ৫৩৫ ফুট ছিল। মন্দিরের সন্নিকটে সরকারী সংগ্রহালয়ে এই সব মন্দিরের বহু ভগ্ন মূর্ত্তি সংগৃহীত রহিয়াছে। স্যর জন মার্শেল সাহেব তাঁহার অনুসন্ধান-কার্য্য করিবার সময়ে মনোরম একটি 'বালকৃষ্ণ'মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেটিও সংগ্রহালয়ে আছে। মূর্ত্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তর হইতে ক্ষোদিত দোলায় উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি. নিম্নে নতজানু পঞ্চ উপাসিকা বসিয়া আছে, পার্শ্বে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। পাথর কাটিয়া একটি দোলায়মান দোলা, তাহার সহিত কয়েকটি শৃঙ্খল সংযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত।

সংগ্রহালয়ে আর একটি মনোরম বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুর চারি হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভিত। দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে মহেশ্বর, ঊর্দ্ধে নভোমণ্ডলে দেব-যক্ষ-অপ্সরা ও নিম্নে লতাপুষ্প-বেষ্টিত কয়েকটি ব্রহ্মচারিণী-মূর্ত্তি খোদাই করা রহিয়াছে।

এখানে আর একটি সুন্দর মূর্ত্তি রহিয়াছে, কেহ কেহ এই মূর্ত্তিটিকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। মূর্ত্তিটির মাথার উপর সর্পরাজি ফণা বিস্তার করিয়া আছে, দুই পার্শ্বে

সূর্য্য-মন্দিরের জগমোহন—কোনারক

দুইটি নারীমূর্ত্তি, একটির হস্তে অন্নপাত্র আছে। তাহা দেখিয়া পণ্ডিত বিষাণস্বরূপ বলেন—ইহা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, যখন তপঃক্লিষ্ট বুদ্ধদেব অত্যন্ত কাতর, তখন শ্রেষ্ঠিপত্নী সুজাতা তাঁহার দাসী পুন্নাকে সঙ্গে করিয়া 'পরমান্ন' পাত্রে লইয়া বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হন; আর তখন সর্পরাজ মুচলিন্দ ফণা বিস্তার করিয়া ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র-তাপ হইতে বুদ্ধকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, কোনারকে কোন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় স্থাপত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

সংগ্রহালয়ে নবগ্রহমূর্ত্তি-ক্ষোদিত অপূর্ব্ব সর্দ্দালের প্রকাণ্ড প্রস্তরটি রক্ষিত আছে। পাথরটির আয়তন ১৯′ × ৪½′ × ৩½′ এবং ওজন ২৪ টন ৩ কোয়ার্টার ২১ পাউণ্ড। এখানকার বিখ্যাত অরুণস্তম্ভটি এক মহারাষ্ট্র নরপতি পুরীর জগন্নাথের দেউলের প্রধান তোরণের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন। জগন্নাথের মন্দিরেও কোনারকের একটি সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রচলিত প্রবাদ মন্দিরের চূড়ায় একখণ্ড বৃহৎ চুম্বক পাথর বসান ছিল। এই চুম্বক সমুদ্রগামী অর্ণবপোতের লৌহ অংশ আকর্ষণ করিয়া জলযানগুলিকে বিপদে ফেলিত। এই চুম্বক পাথরকে উড়িষ্যাবাসীরা 'কুম্ভ-পাথর' বলে। কারণ পূর্ব্বে এইরূপ পাথর মন্দিরের কলসরূপে ব্যবহৃত হইত। পূর্ত্তবিদ্ বিষাণস্বরূপ বলেন—উড়িয়া শিল্পীরা মন্দিরের মাথায় চুম্বক বসাইয়া শিখরের প্রস্তরগুলি যথাস্থানে আকর্ষণ করিয়া রাখিত। মাদলা পঞ্জী মতে এই চুম্বকটি ১২॥০ কাঠি অর্থাৎ ২১ ফুট ১০½ ইঞ্চি (এক কাঠির মাপ ১′ ৯″ ইঞ্চি)

পরিমাণের ছিল। এই শিলা অপসারিত হওয়াতে মন্দিরের চূড়ার সমস্ত প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল।

ভারতের শিল্পী ও স্থপতিগণ যে কেবল বাহিরের সৌষ্ঠব ও সূক্ষ্মকারুকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিত তাহা নয়, তাহারা স্থাপত্য-বিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্রে বিশদ জ্ঞান অর্জ্জন করিত। কোনারকের মন্দিরের প্রধান স্থপতি ও শিল্পী ছিলেন শিবাই সাউতুয়া। আমাদের দেশ যখন স্বাধীন ছিল তখন স্থপতি ও শিল্পিগণ সমাজে আদর ও শ্রদ্ধা পাইত। পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শিল্পীদের শ্রদ্ধা ও পূজা করিতে ভুলিয়াছি, সেই নিমিত্ত এখন শিল্পীরা সমাজের নিম্ন-শ্রেণীভুক্ত হইয়া অর্থক্লিষ্ট, তাহাদের সৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'দি হিষ্ট্রী অব্ পুরী' গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"স্থপতিপ্রবর শিবাই সাউতুয়ার অকালমৃত্যুর জন্য কোনারকের মন্দির অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে অন্যরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে।

কোনারকের মন্দির না দেখিলে ভারতের শিল্পৈশ্বর্য্যের জ্ঞান অপূর্ণ থাকিবে। সেই সৈকত বেলাভূমির উপর সমুদ্র-তটে এখনও কোনারকের মন্দির কত শত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিতেছে। ধন্য ভারত, ধন্য ভারতের শিল্পিগণ।

পুরী সমুদ্রকূলে বি. এন. রেলওয়ের একটি ষ্টেশন ও পুণ্যধাম। কোনারক পুরী হইতে ১৯ মাইল দূরে সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। চন্দ্রভাগা নদী যেখানে সাগরসঙ্গম লাভ করিয়াছে, সেখানে প্রাচীন যুগের 'চিত্রোৎপলা' নামে এক সমৃদ্ধ মহানগরী ও বন্দর

পথ

ছিল। সেই নগরপ্রান্তেই কোনারকের সূর্য্যমন্দির। এখনও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমে মাঘ মাসে বিরাট্ মেলা হয়। কোনারকে যাইবার উত্তম সময় অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত। পুরী হইতে সন্ধ্যায় গোযানে বাহির হইলে প্রাতে মন্দিরের পাদতলে উপনীত হওয়া যায়, ভাড়া যাতায়াত পাঁচ টাকা। আজকাল কখন কখন মোটরকার বা বাস পাওয়া যায়—তবে একটু ঘুরিয়া এক মাইল দূরে অবতীর্ণ হইতে হয়।

কান্তজীর মন্দির—কান্তনগর; দিনাজপুর

ভারতে হিন্দুর মন্দির-স্থাপত্য ফার্গুসানের মতে তিনটি প্রধান ধারায় বিভক্ত—আর্য্য, চালুক্য ও দ্রাবিড়। আধুনিক মতে—দ্রাবিড়, বেসর ও নাগর (Bullt. Mad. Govt. Museum, Architect)। হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ পর্য্যন্ত আর্য্য (ইণ্ডো-এরিয়্যান) পদ্ধতিতে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এই ইণ্ডো-এরিয়্যান পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য—মন্দির-চূড়া শিখর-বিশিষ্ট। এই ধারার আবার ভিন্ন প্রদেশে নানা বিশিষ্ট পদ্ধতিও পরিলক্ষিত হয়, যেমন উড়িষ্যার একচূড়ার মোটা মোটা গোল ও উচ্চ মন্দির, আর বাঙ্গলার খড়ের চালার আকারে চারিটি চালাযুক্ত মন্দির। অবশ্য পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত মথুরাপুরের দেউল এবং বাঁকুড়ার মন্দিরের গঠন-পদ্ধতি নূতন ধরনের। বাঙ্গলায়, বিশেষতঃ পশ্চিম, উত্তর ও নিম্ন বাঙ্গলায়, অসংখ্য শিবমন্দির দেখা যায়, সেগুলি সমস্তই বাঙ্গলার খড়ের ঘরের অনুরূপ এবং বিষ্ণুমন্দিরগুলি নব- ও পঞ্চ-শিখরবিশিষ্ট। এই দুই পরিকল্পনার মন্দির বাঙ্গলার নিজস্ব স্থাপত্যধারা। বাঙ্গলায় প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন অতি বিরল, নাই বলিলেই হয়; তবে বিগত তিন শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য ও কারুকার্য্যে মণ্ডিত বহু মন্দির বঙ্গ-পল্লীর শ্যামলচ্ছায়ায় বিরাজ করিতেছে।

বাঙ্গলার একটি অতি উৎকৃষ্ট মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় দিনাজপুর জিলার কান্তনগরে। এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য

১৭০৪ সালে আরম্ভ এবং ১৭২২ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল (Buchanan Hamilton এর "Eastern India" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত আছে)। এই মন্দিরটি নবরত্ন এবং বিশাল আকারের বিষ্ণুমন্দির। ইহার পরিকল্পনা বাঙ্গলার নিজস্ব; তবে কাঠের রথেরই অনুকরণে এই প্রকার পঞ্চ ও নবচূড়া-সম্বলিত মন্দিরনির্ম্মাণ বাঙ্গালী শিল্পিগণ করিয়া থাকিতেন। দ্রাবিড় দেশে (যেমন মহাবলিপুরমের পঞ্চপাণ্ডব রথ) এবং উড়িষ্যায় (যেমন কোনারক ও সামাচলের সূর্য্যমন্দির) কাষ্ঠরথের পরিকল্পনায় মন্দির-গঠনের প্রণালী বহু স্থানে দেখা যায়। বাঙ্গলায় এই আকারের মন্দিরগুলি দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের ন্যায় তিন চার তলায় বিভক্ত হইয়া থাকে, তথাপি বাঙ্গালী শিল্পিগণ এই নবরত্ন- বা পঞ্চরত্ন-শিখরের মন্দির-গঠনে তাঁহাদের এক স্বাধীন ও অভিনব কল্পনারই পরিচয় দিয়াছেন। ইহার তুলনা সমগ্র ভারতে বিরল।

কান্তনগরের মন্দিরটির কারুকার্য্য যেমন সূক্ষ্ম তেমনই নয়নানন্দদায়ক। প্রতি ইঞ্চি স্থান সুশ্রী লতাপাতা, ফলফুল, ও নানা পরিকল্পনার মূর্ত্তিদ্বারা শোভিত। মূর্ত্তিগুলি কেবল দেব-দেবীর লীলাব্যঞ্জক নহে, বাঙ্গলার গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি শিল্পিগণ নিখুঁত ও সুশ্রী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গলায় পাথরের উপর কার্য্য বিরল, কিন্তু পোড়ামাটীর কাজ (টেরাকোটা) এমনই সুশ্রী ও প্রাণবান্ হইত যে, তাহার তুলনা জগতে বড় দেখা যায় না। এই মন্দিরের অত্যুচ্চ নয়টি শিখরই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঊর্দ্ধে থাকে থাকে উঠিয়া যেন পরম পুরুষের চরণে অর্ঘ্য দিতে যাইতেছে। মূল মন্দিরের নিম্ন

তিনটি তলা চতুষ্কোণ, কিন্তু শিখর নয়টি অষ্টকোণবিশিষ্ট, ক্রমান্বয়ে সরু হইয়া উঠিয়াছে। শিরোদেশে অষ্টধাতুর বিষ্ণুচক্র অবস্থিত। ইহার কার্নিস্ বাঙ্গলার খড়ের চালা-ঘরের ন্যায়, মধ্যভাগ বৃত্তাকার এবং দুই প্রান্ত ক্রমশঃ নত হইয়া গিয়াছে, দূর হইতে খড়ের ঘরের ন্যায়ই দেখায়।

কান্তনগরের মন্দির-সম্বন্ধে ফার্গুসান সাহেব প্রশংসা করিয়াই লিখিয়াছেন—"It is a nine-towered temple of considerable dimensions, and of a pleasingly picturesque design. The centre pavilion is square, and but for its pointed form, shows clearly enough its descent from the Orissan prototypes." (I.E.A., Vol. II, p. 161)

দিনাজপুরের সন্নিকটে গোপালগঞ্জে এইরূপ একটি বিষ্ণু-মন্দির দেখা যায়, তাহারও কারুকার্য্য অত্যধিক এবং সূক্ষ্ম কিন্তু কুরুচিপূর্ণ। এই মন্দিরের শিখরগুলি কান্তনগরের মন্দিরের ন্যায়। Griffin's 'Famous Monuments' গ্রন্থের চিত্রে এই মন্দিরের শিখরের সহিত বৃন্দাবনের যুগলকিশোরের মন্দিরের তুলনা দেখান হইয়াছে। ফার্গুসান লিখিয়াছেন যে, বহুকোণ বা চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট ক্রমান্বয়ে সরু হইয়া উচ্চে উত্থিত এই প্রকার মন্দিরের শিখর, মধ্যপ্রদেশের দামো জিলার কান্দলপুরের জৈন-মন্দিরের এবং সোনাগড় ও খাজুরাহোর মন্দিরের শিখরের পরিকল্পনায় গঠিত।

হুগলী জিলার বংশবাটীস্থ (বাঁশবেড়িয়ার) হংসেশ্বরী মন্দিরটি আবার ত্রয়োদশটি শিখরে গঠিত। ইহার মধ্যের
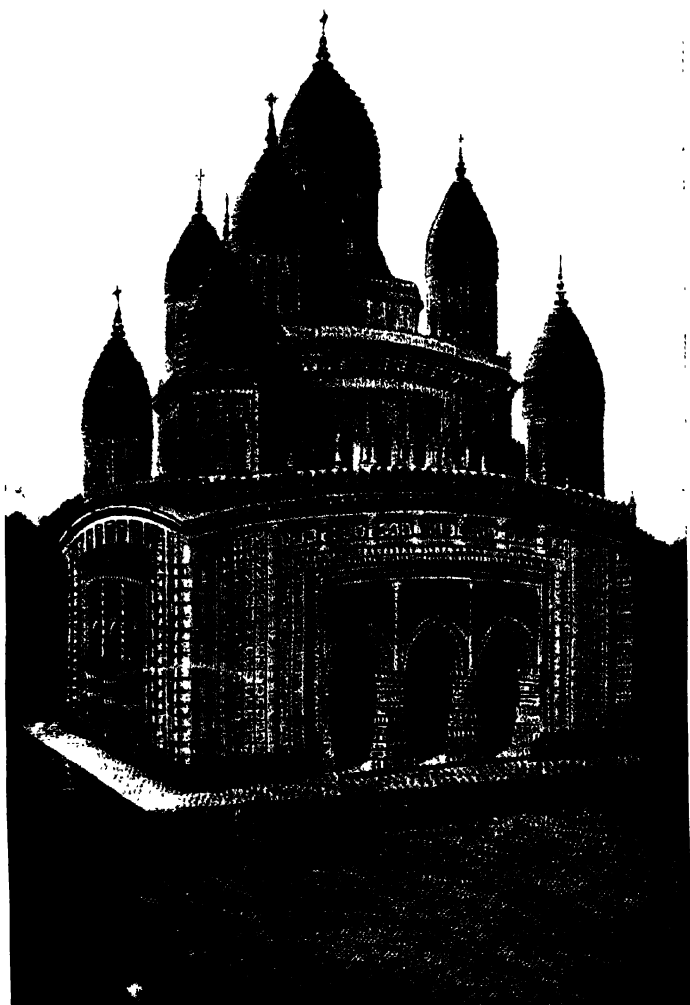
কান্তজীর মন্দির—কান্তনগর, দিনাজপুর

মূল চূড়াটি পাথরের। বাঙ্গলার মন্দির-স্থাপত্যের ইহাও একটি বিশিষ্ট পরিকল্পনা। মন্দিরটি দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বের।

কলিকাতার কালী-মন্দির ও উপকণ্ঠের বৃহৎ আয়তনের শিব-মন্দিরের পরিকল্পনায় সমগ্র বাঙ্গলায় বহু শত সহস্র শিব-মন্দির গত দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গলার সমস্ত মন্দিরই ইটের, সেই নিমিত্ত প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীরা ঘরে ঘরে দেবতা প্রতিষ্ঠা করে, সেইজন্য শিব-মন্দিরের এমনই প্রাচুর্য্য। বর্দ্ধমানের রাজা-রাণীরা এক আধটি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ১০৮ শিব-মন্দির-মালা স্থাপিত করিয়া তাঁহারা যেমন দেব-দ্বিজে ভক্তি দেখাইয়াছেন তেমনই দ্বিজ ও দরিদ্রের সেবা ও পালনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অমর হইয়াছেন। এমন কি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর পরাধান বাঙ্গালীরা কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার দুই পার্শ্বে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত শত শত শিবালয়, বিষ্ণুমন্দির ও মাতৃমন্দির স্থাপিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের চিত্তে ভগবৎপ্রেম উদ্দীপিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

গন্ধেশ্বর-মন্দির—সীন্নার

ইণ্ডো-এরিয়্যান বা উত্তরভারতীয় মন্দিরের গঠন-পদ্ধতি এবং পরিকল্পনা এত ভিন্ন ভিন্ন ধারায় নির্ম্মিত যে দুএকটি উদাহরণ দিলে তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় না। কোন মন্দিরই অন্যটির ঠিক অনুকরণ নহে, খ্যাতনামা প্রত্যেক মন্দিরেই কোন না কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। একটি বিশিষ্ট আকারের মন্দির বর্ত্তমান নাসিক হইতে ১২ মাইল দূরে সীন্নার গ্রামে অবস্থিত, এই মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গঠিত হইয়াছিল।

একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান নাসিক জিলায় যাদব-রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন ('ইণ্ডিয়ান এন্টিকুইটী', ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১১৯-২৯)। এই গন্ধেশ্বরের মন্দির যাদব-রাজবংশের এক রাজা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। নাসিক তাঁহাদের তখনকার রাজধানী ছিল। মন্দিরটি সহরতলীর এক উন্মুক্ত স্থানে প্রস্তরের প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে অবস্থিত। প্রাঙ্গণটি উত্তর-দক্ষিণে ২৮৪′ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩১৪′, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে প্রাচীরমধ্যে প্রবেশের দুইটিমাত্র দ্বার আছে। মূল মন্দির ১২৪′ X ৯৪′ আয়তনের উচ্চ চত্বরের উপর স্থাপিত। মূল মন্দিরের সম্মুখে নন্দী-মণ্ডপ এবং চারিকোণে ৪টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির বিরাজিত। নন্দী-মণ্ডপের গঠন-পদ্ধতি এক অভিনব পরিকল্পনায়; ২২ ফুট চতুষ্কোণ এই মণ্ডপ, ইহার ছাদ ৪টি অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-মণ্ডিত স্তম্ভের উপর বিন্যস্ত, কতকগুলি

গোণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দির—সীনার, নাসিক
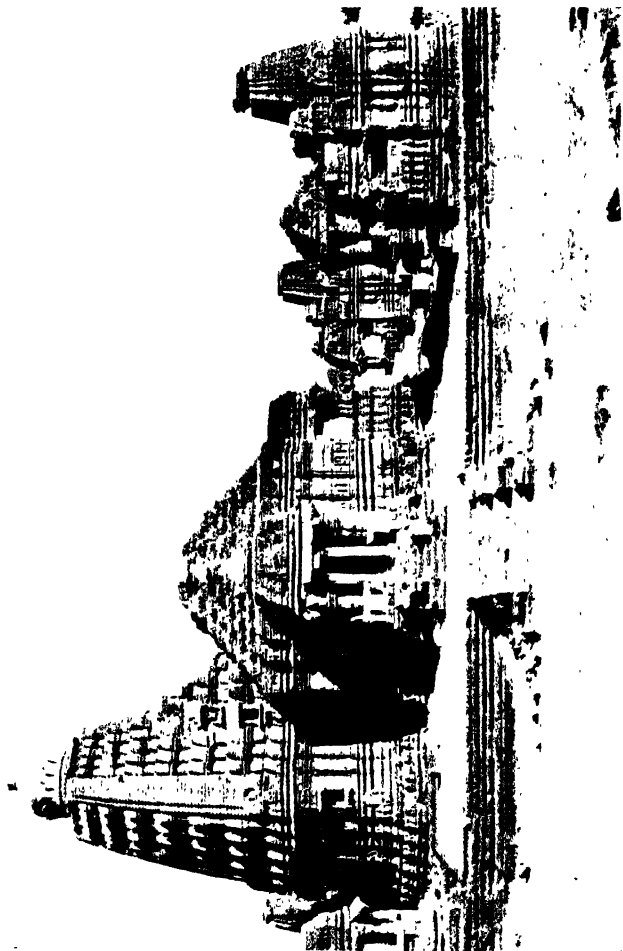
ছোট ছোট থাম মণ্ডপটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। মধ্যের শিখর বা 'ডুম'ও সুচারু-শিল্পৈশ্বর্য্য-মণ্ডিত।

মধ্যে যে শিখর সোজা হইয়া উঠিয়াছে তাহার গাত্র যেমন নানা প্রকার ভাস্কর্য্যে সজ্জিত হইয়াছে, তেমনই নানা ভাঁজ ও কোণ ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার কারুকার্য্য ও গঠন-পদ্ধতিতে প্রাচীন চালুক্য শিল্প-রীতির ছাপ দেখা যায়, ইহার গঠনরীতি অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যময়।

অমরনাথ-মন্দির—কল্যাণ

দশম শতাব্দীর একটি মন্দির বোম্বাইয়ের সন্নিকটে কল্যাণে অবস্থিত আছে। এই মন্দিরটির মধ্যের এক শিলা-লিপির তারিখ ৯৮২ শকাব্দ বা ১০৬০ খৃষ্টাব্দ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই শিলা-লিপি হইতে অনুমান হয় এই যুগেই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দির লম্বায় ৮৪ ফুট ও প্রস্থে ৬১ ফুট এবং ২৩ ফুট সমচতুষ্কোণ এক মণ্ডপ সম্মুখে নির্ম্মিত রহিয়াছে। মণ্ডপের ছাদের অবলম্বন চারিটি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-মণ্ডিত স্তম্ভ, এবং গন্ধেশ্বর-মন্দিরের শিখরের ন্যায় ইহার উচ্চ ও মোটা চূড়া ছিল। তিন পার্শ্বে প্রবেশদ্বার. সম্মুখে যে বারণ্ডা দেখা যায় তাহার এবং মন্দির-গাত্রের কারুকার্য্য যেমন সূক্ষ্ম তেমনই বিস্ময়কর। সাধারণতঃ শিব-মন্দিরগুলির শিবলিঙ্গ-স্থাপনের স্থান মন্দিরের পোস্তা হইতে নিম্নে হয়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই এবং সেই স্থানে নামিবার জন্য ১৩' প্রশস্ত সিঁড়ি নির্ম্মিত রহিয়াছে। এই মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এমনই মনোহর যে, বোম্বাই সরকার ইহার প্রতিরূপ ছাঁচ করিয়া বিশ্বের শিল্প-রসিকদিগকে শিল্পচর্চ্চার সুবিধা ও আনন্দ দিবার নিমিত্ত তাহা সাউথ ক্যানশিংটন মিউজিয়ামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।
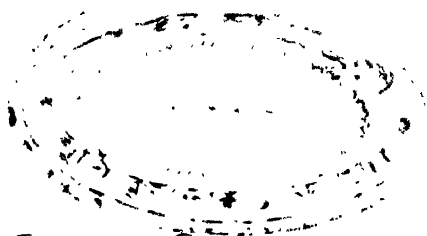
বিশ্বনাথ-মন্দির—কাশী

উত্তর-ভারতের বা হিন্দুর মন্দির-স্থাপত্যের আলোচনা আদৌ সমীচীন হইবে না যদি কাশীর মন্দিরের কথা পর্য্যালোচিত না হয়। ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বপ্রসিদ্ধ হিন্দু-তীর্থ এই বারাণসী গঙ্গা-বরুণা-অসি-সঙ্গমে স্থাপিত। কত যুগ-যুগান্তর হইতে কত কোটী সাধু, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও গুণিজনের সাধনক্ষেত্র এই কাশীধাম। বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে কোন স্থানই কাশীর মতন একধারায় একই ধর্ম্মের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বক্ষে লইয়া কোটী কোটী নর-নারীর চিত্তের উপর এত প্রাচীন কাল হইতে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় এমন একটি প্রাচীন স্থানে পুরাণ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন একরূপ দেখা যায় না বলিলেই হয়। কালের ও মানবের নির্ম্মম পীড়নের প্রভাবে কাশী বহুবার বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সোনার কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত এবং কাশীতে ভূমিকম্প হয় না— এই সব সত্য কাহিনী এখন প্রবাদে পরিণত হইয়াছে মাত্র। তথাপি কাশীর স্থান-মাহাত্ম্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শতাব্দীর পর শতাব্দী দেব-দেউল-নির্ম্মাণের অনুপ্রেরণা দিতেছে।

কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীর দ্বারা ১১৯৪ খৃঃ পরাজিত হইবার পর কাশীর সৌভাগ্য ও স্বাধীনতা-রশ্মি অস্তাচলে গমন করে; তখনকার মুসলমান শাসনকর্ত্তা মইজুদ্দিন ঘোরীর আদেশে কাশীর সমস্ত দেবমন্দির ও বিগ্রহ বিধ্বস্ত হয়,

এখানে যাহা কিছু প্রাচীন স্থাপত্য ছিল তাহা এই সময় হইতে ৩৫০ বৎসর মধ্যে পুনঃ পুনঃ বিধর্ম্মীদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়া নির্ম্মূল হইয়া যায়, তার পর ১৫৫৬-১৬০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আকবর ও জাহাঙ্গীর বাদসাহের অনুগ্রহে বারাণসীধামে হিন্দু দেব-দেউল গঠিত হয় এবং বারাণসীর পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও প্রতিষ্ঠা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে। কিন্তু ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতাবশতঃই কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। This he (Aurangzeb) did in 1659 in order that he might erect on the most venerated spot of the Hindus his mosque, whose tall minarets still rear their heads in insult over all the Hindu buildings of the city. (H.I.E.A., Vol. II, p. 152)

এই মন্দিরের যে অংশ এখনও মসজিদের সংলগ্ন হইয়া আছে তাহার ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য হইতে বিশ্বনাথের পুরাণ মন্দিরটির শিল্পৈশ্বর্য্য উপলব্ধি করা যায়। ইহা ব্যতীত কাশীর পুরাণ স্থাপত্যের (যদিও ইহাও মাত্র চারি শত বর্ষের পুরাতন) কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য সারনাথের 'ধামক' স্তূপটি দুই হাজার দুই শত বৎসরের পূর্ব্বের বৌদ্ধ-স্থাপত্যের নিদর্শন, এখনও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

যদিও বর্ত্তমানের বিশ্বনাথ মন্দিরটি মাত্র দুই শত বৎসরের পুরাণ তথাপি ইহার স্থাপত্য-পদ্ধতি উত্তর-ভারতের মন্দির-গঠনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। বর্ত্তমান মন্দিরের স্থাপত্য দুইটি ধারায় নির্ম্মিত। মূল মন্দিরটি বহু শিখর-সম্বলিত হইয়া ৫১ ফুট উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এবং

সম্মুখে সংলগ্ন নন্দী-মণ্ডপটি গোলাকৃতি গম্বুজ-সম্বলিত; গম্বুজটি মোগল স্থাপত্যের অনুকরণে নির্ম্মিত। যদিও এই
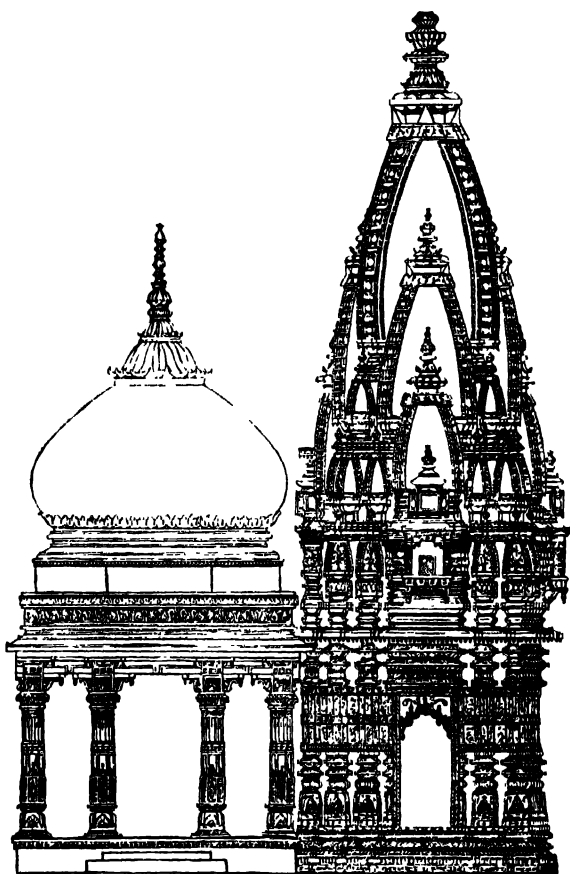
বিশ্বনাথের বর্ত্তমান মন্দির—কাশী

গম্বুজ বেশ সুদৃশ্য কিন্তু পারিপার্শ্বিক স্থাপত্যের সহিত একেবারেই মিল খাইতেছে না। শিখরের বিশিষ্টতা—

ছোট-বড় শিখর একটির গাত্রের উপর অপরটি অবস্থিত, মধ্যের প্রধান শিখরটি অবলম্বন করিয়া সবগুলি ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। ইহাই আধুনিক কালের উত্তর-ভারতের মন্দির-গঠনের চলিত পদ্ধতি হইয়াছে। গম্বুজ ও শিখর সোনার পাতের দ্বারা মণ্ডিত হওয়াতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে কিন্তু গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি পায় নাই বা ভাস্কর্য্যের উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। মন্দিরের গাত্রের কারুকার্য্য অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ শিল্প-দক্ষতার পরিচয়-স্বরূপ। "The details too are all elegant, and sharply and cleanly cut, and without any evidence of vulgarity or bad taste." (H.I.E.A., Vol II, p. 153)

বর্ত্তমানেও যে কাশী প্রদেশের শিল্পীরা উৎকৃষ্ট সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিতে পারে তাহার প্রমাণ কাশীস্থ মিছরীপুকুরে শিল্প-রসিক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাটীর সিংহ-দরজার নির্ম্মাণের সময়ে পাইয়াছিলাম। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের যাভার 'বারভুয়ার' শিবমন্দিরের সিংহদ্বারের সঠিক অনুকরণে কাশীর শিল্পী গোবিন উহা খোদাই করিয়া তাহার অঙ্গুলী-চালনের দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল। এখনও আমরা আগ্রহ করিলে পূর্ব্বের ন্যায় শিল্পৈশ্বর্য্যের সৃষ্টি দেখিতে পাইব। তবে সেইরূপ চিত্ত ও বিত্ত থাকা চাই।

বিরূপাক্ষ-মন্দির—পট্টদকল

হিন্দুদের দেব-দেউলে জনসমাগম হইবার পর একসঙ্গে পূজা বা প্রার্থনা করিবার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না, প্রথম যুগের মন্দির কেবল দেবতার অধিষ্ঠানের উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইত। তৎপরে নৃত্যগীত, ভোগ-আরতির জন্য মন্দিরের সম্মুখে মণ্ডপ-নির্ম্মাণের প্রচলন হয়। মধ্যযুগে মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে বৃহদায়তনের দালান নির্ম্মিত হইত। বোধ হয় বৌদ্ধদের বিহার বা চৈত্য হলের অনুকরণে পার্ব্বণ ও উৎসবের সময়ে যাগ-যজ্ঞ ও আরতি-দর্শনের এবং স্তবস্তুতি-পাঠের জন্য বহু জনসমাগমের উপযোগী বড় বড় দালান প্রস্তুত হইত। কিন্তু বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমানেরা এক স্থানে এক সময়ে বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া প্রার্থনা করেন; সেই নিমিত্ত তাঁহারা বড় বড় দালানযুক্ত বিহার, গির্জ্জা ও মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

সেই রকম একটি বৃহদায়তনের মন্দির পট্টদকলে দেখিতে পাই, তাহাই বিরূপাক্ষ শিবের মন্দির। এই মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত এক শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের লোকমহাদেবী নাম্নী রাণীর দ্বারা এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ৭৩৩ হইতে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলা যায়। (Archæological Survey of

25—1304 B.
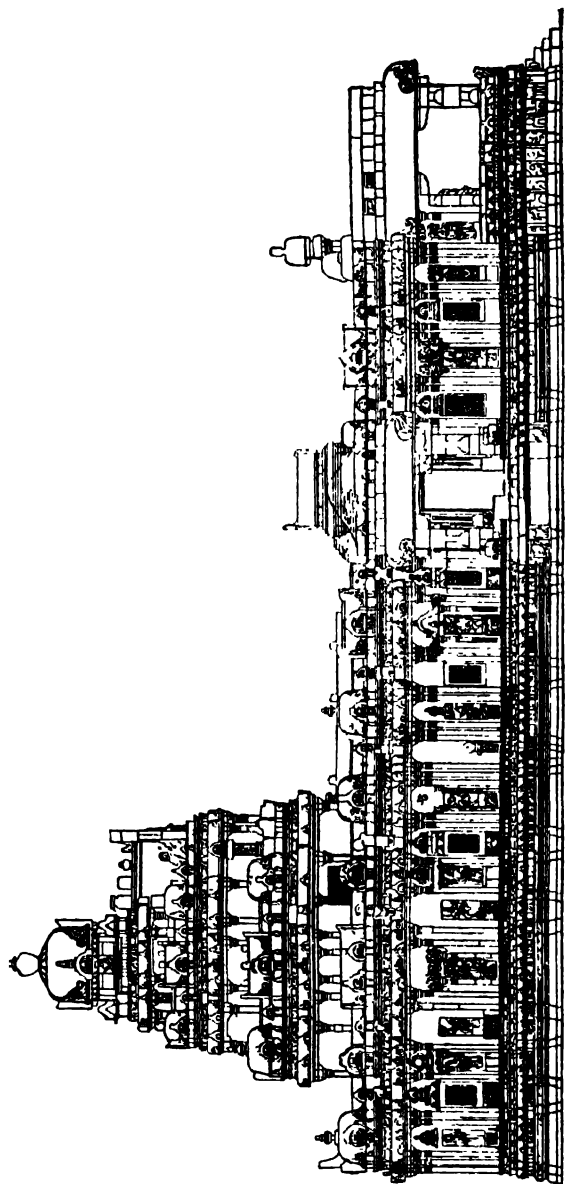
বিরূপাক্ষ-মন্দিরের রেখা পরিকল্পনা—পট্টদকল

Western India, Vol. I, 1874, p. 31.) এই মন্দিরটির পরিকল্পনা অনেকটা ইলোরার কৈলাস-মন্দিরের মতনই দ্রাবিড়-স্থাপত্য-ধারা অবলম্বনে করা হইয়াছে। কেনাড়া প্রদেশের মধ্যে এই মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রখ্যাত। মন্দিরের শিখর চারকোণা ও গম্বুজের আকারে গঠিত এবং কয়েকটি তলায় বিভক্ত হইয়া মন্দিরটি উচ্চে উঠিয়াছে। ফার্গুসান সাহেব ইহার গঠন-পদ্ধতি-বিষয়ে বলেন "Their ornamentation is coarser or more archaic than that of the later Chalukyan style, and the domical termination of the spires is less graceful. (H.I.E.A., Vol. I, p. 353.)

পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২২৪ ফুট লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে ১০৫' প্রস্থের এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ-মধ্যে বিরূপাক্ষ-মন্দির অবস্থিত। প্রাঙ্গণের প্রাচীরের সংলগ্ন অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠরি দেখা যায়, তাহাতে সাধকগণ বাস করিতেন। মন্দিরের এলাকার সংলগ্ন উত্তর-দক্ষিণে ৫০ ফুট এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪৫ ফুট আয়তনের একটি দালান আছে। এই মণ্ডপের যে যোলটি স্তম্ভের উপর মণ্ডপের ছাদ বিরাজ করিতেছে তাহার কারুকার্য্য অতি মনোরম। মধ্যের ছাদের তলে কুণ্ডলীকৃত পঞ্চ-ফণা-যুক্ত নাগরাজ, এবং তিনটি ফণা-বিশিষ্ট পরস্পর আলিঙ্গন-বদ্ধ দুইটি নাগিনামূর্ত্তি সুন্দরভাবে ক্ষোদিত রহিয়াছে। মণ্ডপটির তিন দিকে দ্বাদশটি সূক্ষ্ম পাথরের জালি পর্দ্দা বসান আছে, তাহার মধ্য দিয়া আলোক প্রবেশ করে, তাহাতেই মণ্ডপটি আলোকিত হয়। মধ্যে যে স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ-পথ।

বড় বড় পাথর কাটিয়া-ছাঁটিয়া মশলা ব্যবহার না করিয়া ইহা এমনই সুকৌশলে স্থাপিত হইয়াছে যে, দূর হইতে মনে হয় যেন একখানি পাহাড় হইতে মন্দিরটি প্রস্তুত হইয়াছে। মন্দিরের পোস্তায় প্রচুর খোদাই দেখা যায়। দেওয়ালে শিবের নানা বিভূতি ও বিভিন্ন দেব-দেবীর লীলা ক্ষোদিত রহিয়াছে। বৌদ্ধ-বিহারের ন্যায় অশ্বক্ষুরাকৃতির খিলান এই মন্দির-স্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। মন্দিরের কারুকার্য্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য স্বচক্ষে না দেখিলে তাহাদের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করা যায় না।

মার্ত্তণ্ড-মন্দির—কাশ্মীর

উত্তর-ভারতে বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে (পেশোয়ার, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশে) খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এবং খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে গান্ধার-স্থাপত্য ও শিল্প ভারতীয় কলার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই গান্ধার-স্থাপত্য গ্রীক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের প্রভাবেই মূর্ত্ত হইয়া ভারতে এক পরম সুন্দর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-ধারা প্রচলন করিয়াছিল। তাহার নিদর্শন তক্ষশিলা ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে ও সংগ্রহালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থাপত্য-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত থামগুলির 'মাতলা' ডরিক্, আইয়োনীয়ান বা কোরিন্থিয়ান পরিকল্পনায় গঠিত হইত।

কিন্তু কাশ্মীরের উপত্যকায় এমন অনেক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে গ্রীক স্থাপত্যধারার প্রভাব নাই। কাশ্মীর প্রদেশের নিজস্ব শিল্প-পদ্ধতির বিকাশ অনেকগুলি মন্দিরে লক্ষিত হয়। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী ইসলামবাদের ৫ মাইল পূর্ব্বে এক উচ্চ উপত্যকার উপর মার্ত্তণ্ড-দেবের মন্দির তাহার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ফার্গুসান সাহেব সেইজন্য বলিয়াছেন—By far the finest and most typical examples of the Kashmiri style is the temple of Martand. . . . It is the architectural lion of Kashmir, tourists think it necessary to go into raptures about its beauty and magni-

ficence, comparing it to Palmyra or Thebes, or other wonderful groups of ruins of the old world. (H.I.E.A., Vol. I, p. 259.)

মূল মন্দিরটি আকারে ক্ষুদ্র—মাত্র ৬০ ফুট লম্বা ও ৩৬ ফুট প্রস্থ, কিন্তু ইহার ভাস্কর্য্য ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য শত শত শিল্পানুরাগীকে এই ধ্বংসস্তূপ দেখিবার জন্য আকর্ষণ করে। এই মন্দিরের ছাদ এমনই ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, ইহার পরিকল্পনার ছবি পর্য্যন্ত কল্পনা করা যায় না। জেনারেল কানিংহাম কিন্তু প্রচলিত কাশ্মীরী ছাদের অনুকরণে মন্দিরের শিখরের ছবি প্রস্তুত করিয়াছিলেন (Journal of A.S.B., Vol. XVII, 1048, Sept., p. 267.)

মন্দিরের ধ্বংস হইতে ছাদের অবলম্বনের মতন কোন স্তম্ভ বা দেওয়ালের চিহ্ন পাওয়া যায় না। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন এই মন্দিরের পাকা ছাদ ছিল না, পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রচলিত প্রথায় কাষ্ঠের ছাদ শোভা পাইত।

মন্দিরের অপেক্ষা ইহার প্রাকার অধিকতর শিল্পৈশ্বর্য্য-মণ্ডিত ছিল। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ ২২০′×১৪২′ ছিল। প্রাকারের ভিতর দিক্ উন্মুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরিতে বিভক্ত, এবং সম্মুখের বারণ্ডা কারুকার্য্য-মণ্ডিত স্তম্ভশ্রেণী-শোভিত ছিল। থামগুলি ১৫′ উচ্চ এবং সর্ব্বসমেত ইহার ছাদ বোধ হয় ত্রিশ ফুট উচ্চ হইবে।

জেনারেল কানিংহাম অনুমান করিয়াছেন যে, এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকের প্রাঙ্গণ সদা-সর্ব্বদা জলে পরিপূর্ণ থাকিত, তাহার কারণ, মন্দির ও প্রাকারের সংলগ্ন কুঠরিশ্রেণীর পোস্তা প্রাঙ্গণ

অপেক্ষা অনেক উচ্চ। এমন ভাবে জল-প্লাবিত রাখিবার প্রথা পন্দ্রেথন (The Pandrethan) এবং বারামূলা (Baramula) মন্দির-প্রাঙ্গণেও আছে। গ্রীষ্মাধিক্যের সময়ে সুশীতল রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রাঙ্গণটি সর্ব্বদা জলপ্লাবিত রাখা হইত না, 'নাগ'দেবতাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই এই কৌশল গ্রহণ করা হইয়াছিল—এইরূপ মত ষ্টেন সাহেব লিখিয়াছেন। (Stein, in 'Vienna Oriental Journal', Vol. V, p. 347.)

মার্ত্তণ্ড-মন্দির এবং তাহার মোটা পাথরের প্রাকার রাজা ললিতাদিত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ললিতাদিত্য ৭২৫ হইতে ৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। (রাজতরঙ্গিণী—৪র্থ-৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯২) রাজা জয়সিংহ এই সুদৃঢ় প্রাঙ্গণ এক সময়ে দুর্গরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। জয়সিংহ ১১২৮-১১৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সেকেন্দর সাহ্ ভূতিসী খাঁ তাঁহার শাসনকালের (১৩৯৩-১৪১৬ খৃঃ) মধ্যে এই মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেকেন্দর সাহ্ কাশ্মীরের যাবতীয় হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতেই পূর্ব্ব যুগের শিল্প ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন বিরল হইয়া যায়। এই সেকেন্দর সাহ্ গর্ব্ব করিয়া 'ভূতিসী খাঁ' পদবী (অর্থাৎ মন্দির ও মূর্ত্তি-ধ্বংসকারী বীর নাম) গ্রহণ করেন। এক হিন্দু মন্দিরের ভিত্তির উপর তাঁহার বেগমের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—এই কথা লেফ্‌টেনাণ্ট কোল লিখিয়া গিয়াছেন (কলিকাতা রিভিউ, ১৮৭২, পৃঃ ২৭)।
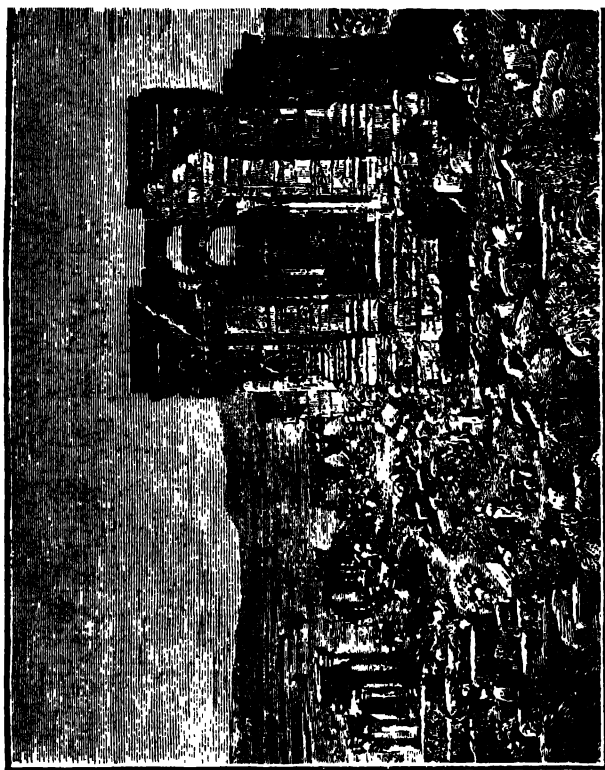
মার্ত্তণ্ড-মন্দির ধ্বংসাবশেষ)—কাশ্মীর

এই মন্দির যেমন প্রাচীন তেমনই ১৪০০ বৎসরের পূর্ব্বের শিল্পৈশ্বর্য্যের বিকাশ মন্দিরটিতে দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে কুলঙ্গীতে রক্ষিত মার্ত্তণ্ড-দেবের মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও সে যুগের শিল্পীর দক্ষতা প্রকাশ করিতেছে। সে যুগে ভারতে যে সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই মার্ত্তণ্ড-মন্দির; অন্য উৎকৃষ্ট সূর্য্যমন্দির কোনারক। এই মার্ত্তণ্ড-মূর্ত্তি কাশ্মীর-প্রদেশে সূর্য্যনারায়ণ-বিগ্রহরূপে পূজিত হয়। এই চতুর্ভুজ দেবের মস্তকে সর্পের বিস্তৃত ফণা রহিয়াছে।

সূর্য্যপূজা হিন্দুদের মত ২০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের পর হইতে বাবীরুষবাসিগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল—এই মত বালগঙ্গাধর তিলক লিখিয়াছেন (Chaldaen and Indian Vedas—Bhandarkar Com. Vol., p. 30)

মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের স্তম্ভশ্রেণী এখনও বিদ্যমান. তাহাদের মাতলা 'ডোরিক্' স্থাপত্য-প্রণালীর মতন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। (ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ ব্যানার্জির 'Hellenism in Ancient India', p. 49)

ইহার ত্রি-পত্র খিলানই (trefoil arch) বঙ্গদেশের, কোনারকের ও মানভূমের মন্দিরের ত্রি-পত্র খিলানের আদর্শ। (দয়ারাম সাহানী—A.S.A.R., 1915-16, p. 51)

26—1304B.

দক্ষিণ-ভারতের মন্দির

পূর্ব্বঘাটের শৈলশিখরমালা-সমাচ্ছন্ন, অনন্ত অসীম ভারত-মহাসাগরের ফেনিল ঊর্ম্মিমালা-ধৌত, মলয়ানিল-সেবিত-তটভূমি দক্ষিণ-ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন মনোরম, ইহার ভাস্কর্য্য, মন্দির-স্থাপত্য ও শিল্পৈশ্বর্য্য তেমনই মহান্ ও গরীয়ান্। উত্তর-ভারতের হিমাচলের হিম-সাগরের শুভ্র ঢেউ যেমন মনোহর, দক্ষিণ-ভারতের অনন্ত অসীম নীলাম্বু-সাগরের ঊর্ম্মিমালার নর্ত্তন তেমনই প্রাণ-মাতান। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যে গরীয়ান্ দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উপকূল ওয়াল্টেয়ার হইতে রামেশ্বর ও কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ভূখণ্ড অন্ধ্র এবং তামিলদেশ নামে পরিচিত। এই তামিল জাতি ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে অতি প্রাচীন জাতি, ইহা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে একটি বিশিষ্ট ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী। আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতা উত্তর-ভারতে ক্রমশঃ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিলে, ভারতের প্রাচীনতম অনার্য্য জাতি তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি লইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্ত্তী কালে দক্ষিণ-দেশের তামিল জাতি আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা গ্রহণ করিয়া আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার মিলনে এক অপূর্ব্ব কৃষ্টির সৃষ্টি করেন।

উত্তর-ভারতে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও সাধনার যে সমস্ত রূপ ও পদ্ধতি বহু শতাব্দী পূর্ব্বে লোপ পাইয়াছিল,

দক্ষিণ ভারতের তামিল জাতি আজও সেই রূপ ও পদ্ধতিগুলি জীবন্ত ও প্রচলিত রাখিয়াছে। শ্রীরঙ্গম্, চিদাম্বরম্, কুম্ভকোণম্, অরুণাচলম্, মহাবলিপুরম্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, রামেশ্বরম্ ও মাদুরার মাইলব্যাপী বিপুলায়তন দেব-দেউল, পর্ব্বত শিখর-সদৃশ গগনচুম্বী গোপুরম্, স্বচ্ছনীরপূর্ণ প্রস্তরমণ্ডিত বৃহদায়তনের টেপাকুলম্ দক্ষিণ-ভারতের শিল্পৈশ্বর্য্য ও সংস্কৃতির পরিচয় আজও প্রদান করিতেছে। হিন্দু দেবদেবীর দেউলের এমন সুবিশাল ও সুমহান্ দৃষ্টান্ত ভারতে কোনও প্রদেশে দেখা যায় না। মুসলমানগণ অনেক পরে দক্ষিণ-ভারতে গমন করায় এবং নির্দ্দয়ভাবে কোন ধ্বংসলীলা সাধন না করিতে পারায় দক্ষিণ-ভারতের দেবমন্দিরগুলি অটুট রহিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতের স্বাধীন পহ্লব, চোল, পাণ্ড্য, নায়ক রাজবংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী অসংখ্য মন্দির ও দেউল গড়িয়া, অপরিমিত অর্থব্যয়ে শিল্পীর নিপুণ হস্তে তাহা সজ্জিত করাইয়া, প্রভূত ধনরত্ন ও ভূমি প্রদান করিয়া তাহা জীবন্ত ও মূর্ত্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

পহ্লব রাজাদের গঠিত মন্দির ও ভাস্কর্য্য ভারতের ভাস্কর্য্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, চোল রাজাদের সময়ের অসংখ্য পঞ্চ-লৌহের (ব্রোঞ্জের) প্রতিমা ও মূর্ত্তি প্রতিমা-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চিদাম্বরমের নটরাজ-মূর্ত্তি বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্পদ্, তাহা দেশ-বিদেশের রূপ-রসিকদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। পাণ্ড্য ও নায়ক রাজাদের নির্ম্মিত মাদুরা, তিনিভেল্লী ও রামেশ্বরের মন্দিরগুলি ভারতের স্থাপত্য ও শিল্পের বিখ্যাত কীর্ত্তি। বিরাট্ দেবমন্দিরগুলি য়ুরোপ ও

মার্কিন দেশ হইতে দলে দলে আগত দর্শক ও যাত্রীদের মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতের মন্দির ও প্রতিমা-ভাস্কর্য্যের পরিচয় অবগত না হইলে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিরাট্ ও বিশাল অধ্যায় অনধীত ও অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। দক্ষিণ ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির বিরাট্ অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত "দক্ষিণ ভারত পথে" গ্রন্থটি মৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে।

ভারতের দেব-দেউলের পরিচয় অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে যদি দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের বিবরণ প্রদত্ত না হয়। এখানে দুই একটি মন্দিরের অল্প পরিচয় প্রদত্ত হইল। যদিও দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ মন্দিরই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত তথাপি দ্রাবিড়-স্থাপত্য-ধারা নূতন নয়। দ্রাবিড়-ভাস্কর্য্যের ক্রমবিকাশ প্রায় সপ্তম শতাব্দী হইতে দেখা যায়। চালুক্য-স্থাপত্যের মতন ইহার বিকাশ হঠাৎ হয় নাই।

মহাবলিপুরম্

দক্ষিণ-ভারতের শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম স্থাপত্যের নিদর্শন মহাবলিপুরমের পঞ্চপাণ্ডবের রথ ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী 'সপ্ত প্যাগোডা'র মন্দির। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের পরম বিকাশ হয় পর্ব্বতে, সাগরে, শ্যামল ক্ষেত্রে। এই তিনেরই সমাবেশ হইয়াছে মহাবলিপুরমের প্রান্তে। ভারতের সাধকগণ প্রকৃতি-রাণীর এমনই সৌন্দর্য্যময় ক্রোড়ে সাধন-ভজন-স্থান নির্ব্বাচন করিতেন। সৌন্দর্য্য চিত্তে যোগায় আনন্দ, আনন্দই দেয় সত্যের সন্ধান। সত্যের মহিমা প্রকাশ পায় দেবলীলায়, লীলার স্থানই পরিণত হয় তীর্থে। ভক্তরা তাহাদের যাহা শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় তাহা প্রদান করে দেব-দেউল নির্ম্মাণের জন্য। শিল্পীরা যত্নে ও সাধনায় মন, প্রাণ, শক্তি, বুদ্ধি ঢালিয়া দেয় সাজাইতে দেব-দেউল। শিল্পীর সৃষ্টির সহিত কবির কল্পনা মিলিত হইয়া রচিত হয় বিচিত্র কাহিনী, টানিয়া আনে শত সহস্র ভক্ত নর-নারীকে দিতে অর্ঘ।

মহাবলিপুরমের শিল্পৈশ্বর্য্য মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল এক বৈজ্ঞানিকেরও চিত্ত। বিজ্ঞানের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত স্যর সি. ভি. রমন লিখিয়াছেন—"At a lonely spot on the seacoast south of Madras, the surf beats upon the ruins of an ancient south Indian Temple. Sitting on its gate-stone and gazing out on the never-ending turmoil of waters, one may fitly ruminate on India's great past and her present state.

Dotting the country around and defying the ravages of time stand the magnificent monolithic temples and imitable rock carvings of Mohabali-puram. The dullest mind cannot fail to be stirred by the sight of such ancient architectural and artistic remains. (Modern Indian Architecture Brochure, by S. C. Chatterjee, p. 4).

মহাবলিপুরম্ এর বিষয়ে এক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশদরূপে আলোচনা আরম্ভ করেন। স্থাদের 'curse of kehama' (কার্স অব্ কেহামা) গ্রন্থে মহাবলিপুরম্ লেখা আছে। ডাঃ ব্যবিংটন একটি শিলালিপির বলে এই স্থানের নাম মহামালয়পুর রাখেন। রেভাঃ টেলার তাহার পরিবর্ত্তে 'মামলাপুরম্' ব্যবহার করেন। স্থানীয় সাহিত্যে 'মহাবলিভারম্' বা 'মহাবল্লীপুর' নাম প্রচলিত আছে।

এই অঞ্চলের সর্ব্বপ্রাচান স্থাপত্য-নিদর্শন মহাবলিপুরমের পঞ্চপাণ্ডবের রথগুলি। নিরেট একখানি পর্ব্বত কাটিয়া-চাঁটিয়া পাঁচখানি রথ বা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

দ্রৌপদীর রথ

ইহার মধ্যে দ্রৌপদীর রথ উত্তরাংশে অবস্থিত। ইহা আয়তনে ১১ ফুট সমচতুষ্কোণ এবং ১৮ ফুট উচ্চ, চার ঢালে খড়ের ঘরের ছাদের পরিকল্পনায় এক খণ্ড পাহাড় হইতে চাঁটিয়া গঠিত হইয়াছে। ছাদের পরিকল্পনা বাঙ্গলা দেশের খড়ের চালের ঘরের মতন। অভ্যন্তরের ঘরের মেঝের মাপ ৬′ ৬″ × ৪′ ৬″। পিছনের দেওয়ালে হস্তচতুষ্টয়-যুক্ত এক দেবীমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। তাহার চারি পার্শ্বে কয়েকটি সহচরীর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। দ্বারের দুই দিকে

দ্বারপালের মূর্ত্তি। ভিতরের দেবীমূর্ত্তি কাহারও মতে 'লক্ষ্মী'র, কোন কোন সুধী ইহাই 'দ্রৌপদী'র মূর্ত্তি বলেন। মন্দিরের চত্বরে একটি অতিকায় হস্তী একই পাহাড়ের অংশ হইতে ক্ষোদিত হইয়াছে।

ইহারই পার্শ্বে একই পোস্তার উপর অর্জ্জুনের রথ, ইহাও একখণ্ড পাহাড় কাটিয়া-ছাঁটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে; ১৬ ফুট লম্বা ১১'৬" প্রস্থ এবং ২০ ফুট উচ্চ এই রথ বা মন্দিরটি ধর্ম্মরাজ-রথের আকৃতির ন্যায়। ইহারও অভ্যন্তরে একটি ৪'৬" × ৫' ঘর ক্ষোদিত রহিয়াছে। দ্রাবিড়-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের মতন এই মন্দির দুইটি তলায় কাটান ধাপ দিয়া নির্ম্মিত, চূড়াও দ্রাবিড়-শিল্পধারায় আট পলে। বাহির্গাত্রের মূর্ত্তিগুলি সরস ও প্রাণবান্।

অর্জ্জুনের রথ

ভীমের রথটি এক বিশিষ্ট ধারায় পিপের আকারে (barrel shape) একটি পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে; এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৪৮ ফুট, প্রস্থে ২৫ ফুট এবং উর্দ্ধেও ২৭ ফুট; কোন দৈবঘটনায় মন্দিরটি সম্পূর্ণ হয় নাই। বাহিরের কার্য্য শেষ করিয়া যেন শিল্পী ভিতরের দালান কাটাই-ছাঁটাই করিতে করিতে যন্ত্র গুটাইয়া রাখিয়াছে। দালানটি ত্রিশ ফুট লম্বা ও দশ ফুট চওড়া, দুই পার্শ্বে ৮টি এবং হলের মধ্যে দুইটি কারুকার্য্য-মণ্ডিত থাম ছাদের অবলম্বন-স্বরূপ কাটিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। দালানের দুই পার্শ্ব খোলা এবং দুই ধার বন্ধ। থামের নিম্নের সিংহমূর্ত্তি যেমন তেজস্বী তেমনই সুস্পষ্ট। ভীমের রথটি বৌদ্ধ বিহারের মতন দেখিতে।

ভীমের রথ

ধর্ম্মরাজের রথটিই এই পঞ্চ রথের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সূক্ষ্মকারুকার্য্যমণ্ডিত। ধাপে ধাপে কাটান হইয়া চারিটি তলায় নির্ম্মিত, লম্বায় ২৬′ ৯″ প্রস্থে ২৮′ ৮″ এবং উচ্চে ৩৫′ ফুট ; এই মন্দিরটিও একটি কাল গ্রেনাইট পাহাড় কাটিয়া-চাঁটিয়া গঠিত হইয়াছে। এই রথ শক্ত গ্রেনাইট পাথরে গঠিত বলিয়া জলবায়ুর প্রতাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। রথের চূড়া অষ্টপলবিশিষ্ট, মাথাটি অর্দ্ধগোলাকার। ইলোরার কৈলাস-মন্দিরের মাথাও ঠিক এই পরিকল্পনায় এমনই আদত পাহাড় কাটিয়া গঠিত। তিনটি তলার বাহিরের ও অভ্যন্তরের দেওয়াল সূক্ষ্মকারুকার্য্যমণ্ডিত ও নানামূর্ত্তিসম্বলিত। রথটি কয়েকটি কুঠরিতে বিভক্ত, ইহার জানালার ফোকরগুলি বৌদ্ধ-বিহারের গবাক্ষের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে, মাথাগুলি অর্দ্ধগোলাকার, প্রত্যেকটি জানালার মাথায় ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় মানব-মস্তক ক্ষোদিত রহিয়াছে। তিনতলার কুঠরিটি ৫ ফুট পর্য্যন্ত ভিতরে ক্ষোদিত করিয়া শিল্পী কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই রকম দ্বিতলের দালানও মাত্র ৪ ফুট অভ্যন্তরে ক্ষোদিত হইয়াছিল, ত্রিতলের যে ছয়টি স্তম্ভ দেখা যায় তাহা হইতে অনুমান হয় যে, শিল্পী ৩৬টি স্তম্ভ দ্বারা ছাদটি রক্ষা করার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কাষ্ঠের রথেরই অনুকরণে ইহা ক্ষোদিত হইয়াছিল। আরও কতকগুলি থাম বাহিরে ও ভিতরে আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি যেন সমগ্র মন্দিরের অবলম্বনস্বরূপ, অবশিষ্টগুলি কেবল সুসজ্জিত করিবার জন্য খোদাই করা হইয়াছিল।
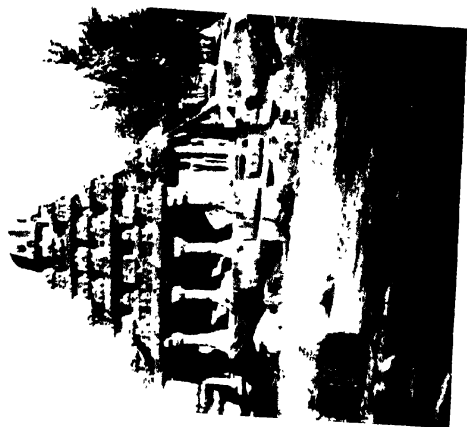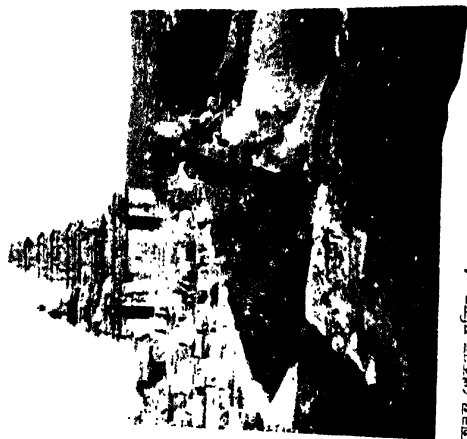
ধর্ম্মরাজের রথ

যদিও এই হর্ম্যটি কাষ্ঠের রথের আকারের এবং এই দেশের প্রচলিত নাম 'ধর্ম্মরাজের রথ', তথাপি ইহার গঠন ভঙ্গিমা বৌদ্ধ-চৈত্যের স্থাপত্যের অনুরূপ। ভারুটের ভাস্কর্য্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঠিক এইরূপ পরিকল্পনার রথ দেখা যায়, তাহাতে অনুমান করা অসম্ভব নহে যে এমনি আকারের মন্দির বা মঠ উত্তর-ভারতে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেও নির্ম্মিত হইত। মহাবলিপুরমের এই পাঁচটি রথ ভারতীয় স্থাপত্যের এক অপূর্ব্ব ও অভিনব পরিকল্পনা।

ফার্গুসান সাহেব লিখিয়াছেন—"The interest of this *rath* lies in the fact that it represented, on a small scale, the exterior of one of those Chaitya halls. * * * * But this *rath* being in several storeys, and the whole so conventionalised by the different uses, to which they are applied for the purposes of a different religion, that we must not stretch analogies too far. (H.I.E.A., Vol. I, page 336).

দ্বিতল ও ত্রিতলের ছাদের উপর চারিদিক্ দুই হাত প্রস্থ প্রদক্ষিণ করিবার পথের পর মোটা আলিসা, তাহার মধ্যে জলনিকাসের নল রহিয়াছে, নলের মুখগুলি বিভিন্ন পশুর মুখের আকারে খোদাই করা হইয়াছে। এই ছাদের উপর দণ্ডায়মান হইলে অনন্ত নীলাম্বুরাশির দৃশ্য বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়; সম্মুখের পাহাড়ের গাত্র সমুদ্রের তরঙ্গের আঘাত ও ভাঙ্গন হইতে এই স্থানটিকে রক্ষা করিয়াছে। রথের গঠন-ভঙ্গিমা ও

27—1304B.

স্থাপত্য যেমন বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে তেমনই এই স্থানটি চিত্তে অপূর্ব্ব শান্তি প্রদান করিয়া থাকে।

এই মণ্ডলীভুক্ত পঞ্চম সৌধটি 'সহদেবের রথ' বলিয়া খ্যাত, ইহাও বৌদ্ধ চৈত্য-সৌধেরই অনুকরণে এক খণ্ড পাহাড় হইতে কাটিয়া-ছাঁটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। যদিও এই রথটি আকারে ক্ষুদ্র, তথাপি ইহার গঠন-ভঙ্গিমা ও কারুকার্য্য অতি মনোরম এবং ইহা নিপুণ শিল্পীর দক্ষতার পরিচয়। হর্ম্ম্যটি উত্তর-দক্ষিণে ১৮ ফুট মাত্র, ১১ ফুট প্রস্থ এবং ১৬ ফুট উচ্চ, তিনটি তলায় বিভক্ত। এই মন্দিরটি উত্তরাভিমুখী এবং সম্মুখে একটু বারাণ্ডা মূল রথ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার ছাদ দুইটি মোটা থামের উপর বিন্যস্ত। অভ্যন্তরে একটি ছোট শূন্য ঘর। এই রথটির পশ্চাদ্ভাগ বন্ধ এবং অসম্পূর্ণ। এই স্থানের হর্ম্ম্যগুলির অসম্পূর্ণতার কারণ রহস্যাবৃত। এখানে একখণ্ড পাহাড় হইতে নির্ম্মিত একটি বৃষ বসান আছে।

সহদেবের রথ

পঞ্চপাণ্ডবের রথের মত না হইলেও আর একটি হর্ম্ম্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইটি গণেশের রথ নামে পরিচিত, এবং ইহা পঞ্চপাণ্ডবের রথমণ্ডল হইতে প্রায় ¼ মাইল দূরে অবশিষ্ট। পরম আশ্চর্য্যের বিষয়, এই রথটি সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই মন্দিরটি পরিদর্শন করিলে পঞ্চপাণ্ডবের রথের পূর্ণ আকার ও পরিকল্পনার ধারণা হইতে পারে। লম্বায় ১৯ ফুট, প্রস্থে ১২ ফুট এবং উচ্চতায় ২৮ ফুট—এই মন্দিরটি এক বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতখণ্ড হইতে ক্ষোদিত হইয়াছে। রথটি তিনতলা এবং ইহার কারুকার্য্য অতি মনোরম। দ্রাবিড়-মন্দির-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য

যে গোপুরম্ আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ভারতের ভাস্কর্য্যের গৌরব, তাহা এই গণেশের রথের অনুকরণেই নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। এই রথের শিরোভাগ সরলভাবে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। শীর্ষদেশে নয়টি ছোট কলস ও ত্রিশূল শোভা পাইতেছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়, কিন্তু ঘরের মধ্যে আলো-বাতাস-প্রবেশের কোন পথের জন্য খোদাই করিবার কোন প্রয়াস হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

মন্দিরটির পশ্চাতের দেওয়ালে যে সব অক্ষর অতি সুন্দর-ভাবে ক্ষোদিত রহিয়াছে তাহাই মন্দিরটির নির্ম্মাণের সময় স্থির করিবার প্রধান সহায়। সেই লিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় এই মন্দির রাজা অত্যন্তকাম রণযজ্ঞ-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, যাঁহাকে ঐতিহাসিকরা সপ্তম শতাব্দীর রাজসিংহ পল্লব বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এই মন্দির শিবপূজার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। (Hultzsch's 'South Indian Inscriptions', Vol. I, p. 5)

এই মন্দির বা রথই যে দ্রাবিড়-স্থাপত্যের পরিকল্পনার মূল-সূত্র তাহা ফার্গুসান সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন—What interests us most here, however, is that the square *raths* are the originals from which all the Vimans in southern India were copied, and continued to be copied nearly unchanged to a very late period, * * * * On the otherhand, the oblong *raths* were halls or porticos with the Buddhists, and became the gateways or Gopurams which are frequently indeed, generally more important parts of later Dravidian temples than the Vimans themselves.

পঞ্চপাণ্ডবের রথগুলির অনতিদূরে কয়েকটা গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে উন্মুক্ত পর্ব্বতগাত্রে একটি বৃহৎ ফলকচিত্র 'ব্যাস রিলিফ' রহিয়াছে। ৯৬ ফুট দীর্ঘ ও ৪৩ ফুট উচ্চ এক পর্ব্বত-গাত্রে অর্জ্জুনের তপস্যার চিত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

অর্জ্জুনের তপস্যা গুহা

এ প্রকার বৃহৎ আকারের সুস্পষ্ট ফলকচিত্র ভারতে এমন কি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ইহার শিল্পীর দক্ষতা বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়াছে। দুইটি পাহাড়ের সংযোগস্থলে এমনই কৌশলে শিল্পী কারুকার্য্য করিয়াছেন, যেন দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন হইতেছে। চিত্রে অর্জ্জুনের তপস্যার বিভিন্ন স্তর কৌশলে ক্ষোদিত হইয়াছে। চিত্রের অন্তর্গত একপদে দণ্ডায়মান ঊর্দ্ধবাহু কঙ্কালসার অর্জ্জুনের মূর্ত্তি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ত্রিদিববাসী ও হস্তীর দল এমনই মনোরম, এমনই সুস্পষ্ট, এমনই সুন্দর যে, মনে হয় যেন সব মোমের পুতুল। প্রধান হস্তীটির আকার ১৭′ × ১৪′ ফুট।

এই গুহাটির নির্ম্মাণ-কৌশল বা কারুকার্য্য অজন্তা বা ইলোরার গুহার খোদাই অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়, বরং কতক অংশ আরও অধিক চিত্তাকর্ষক। গুহাটি পনর ফুট পর্ব্বতের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত ক্ষোদিত হইয়া ভিতরে গিয়াছে। তিনদিকে পর্ব্বতগাত্র প্রাচীর-স্বরূপ, সম্মুখভাগ উন্মুক্ত, উপরের পাহাড়ের অংশই ইহার ছাদ, ছাদের ছয়টি স্তম্ভ নীচে আছে। ডানদিকের দেওয়ালে মহিষাসুরের ও দশভুজার যুদ্ধ-রত অবস্থার বিরাট্ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ, ভাবে ও গঠনের ভঙ্গিমায় মূর্ত্তিটি পৃথিবীর শিল্পসম্ভারের

মহিষমর্দ্দিনী গুহা

'অর্জুনের তপস্যা' চিত্রের-প্রস্তরফলক—মহাবলিপুরম্

মধ্যে অতুলনীয়। দুর্গার চক্ষুর জ্যোতিঃ, গঠনের ভঙ্গিমা ও দশভুজের প্রসার অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করিতেছে। শরীরের গঠন-প্রণালীতে যে দৃঢ়তা অন্তরের কঠোর ভাব প্রকাশ করিতেছে, উহাই দেবীর মাহাত্ম্যের প্রতীক। দেবী মহিষমুখ—অসুরকে পদদলিত করিয়া দশ হাতে নানা আয়ুধ ধারণ করিয়া উহাকে নিধন করিতে উদ্যত। এমন করিয়াই রিপুদমন করিতে হয়। দেবীর এই শক্তি-প্রকাশক মূর্ত্তি ভীতি উৎপাদন করে বলিয়া তিনি একটি হস্তে মানবকে অভয় প্রদান করিতেছেন। দুর্গার মূর্ত্তিটি তেজোদীপ্ত হইলেও নেত্রদ্বয় স্নেহ ও করুণা-বিমণ্ডিত। অসুরের গর্ব্বমণ্ডিত উদ্বেগপূর্ণ মূর্ত্তিটিও অপূর্ব্ব।

গুহার বাম প্রাচীরে বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় শায়িত বিরাট্ মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। তাঁহার মস্তকোপরি অনন্তনাগ বহু ফণা বিস্তার করিয়া আছে। বিষ্ণুর দেহের গঠন যেমন রমণীয়, নেত্র দুইটিও তেমনই কমনীয়।

মধ্যের প্রাচীরে হরের ক্রোড়ে পার্ব্বতী বসিয়া অনন্ত সাগরের প্রতি চাহিয়া অনন্ত লীলার ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। ভোলানাথের মূর্ত্তি যেমন মহান্, পার্ব্বতীর বক্ষঃ তেমনই উদার। কি সাধন-বলেই পাথর কাটিয়া শিল্পী জীবের রহস্য-কাহিনী মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিল! সে শিল্পী আজ কোথায়! শিল্পীর সে সৃষ্টিশক্তি আজ লুপ্ত, শিল্পীর তেমন শক্তি আর কি কখনও মূর্ত্ত হইবে না?

কৃষ্ণলালা, পঞ্চপাণ্ডব, বরাহস্বামী গুহাগুলির কারুকার্য্য পরম রমণীয়। গণেশের রথটি ও এই গুহাগুলি প্রায়

দেড়হাজার বৎসরের প্রাচীন, ৫৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা অনন্তকাম-দ্বারা নির্ম্মিত।

"Ananta Kama (about 550 A.D.) was the founder of the Ganesa Temple, Dharmaraj Mandap and Ramanuja Mandap at Mamallapuram (I.M.P., Vol. I, pp. 327-32).

উইলিয়াম চেম্বারস্ সাহেব ১৭৮৮ খৃঃ অব্দের "এসিয়াটিক রিসার্চ্চ" গ্রন্থের প্রথমভাগে মহাবলিপুরমের সপ্ত-প্যাগোডার ইতিবৃত্ত প্রথম প্রকাশ করেন। সমুদ্রের গর্ভ হইতে উত্থিত প্রস্তরের উচ্চ মন্দির, তাহার কারুকার্য্য, অভ্যন্তরের 'স্থল-শয়ন পেরুমল' বা অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং সমুদ্রতীরের সৌন্দর্য্য যে কোন পাষাণহৃদয় বা নাস্তিক-প্রকৃতির মানবকে ভগবানের মহিমায় অভিভূত করিয়া ফেলে। এক সময়ে এখানে সমুদ্রতীরে সাতটি মন্দির ছিল, দেবরোষে তাহা সমুদ্রের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। এখনও সমুদ্রগর্ভে অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত ছয়টি পর্ব্বতাংশ জলমগ্ন রহিয়াছে, পাণ্ডারা উহা ছয়টি মন্দিরের ভগ্নাবশেষরূপে দর্শকদিগকে দেখাইয়া থাকে।

সপ্ত-প্যাগোডা

মন্দিরের মধ্যে ষোলটি মুখবিশিষ্ট কাল গ্রেনাইট পাথরের প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ বিরাজিত, দেওয়ালে হরপার্ব্বতী ও সুব্রহ্মণিয়ার (কার্ত্তিকের) সুশ্রী মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। এই মন্দির শৈব ও বৈষ্ণবের মিলন-ক্ষেত্র—বৈষ্ণব তিরুমঙ্গল আলোবার তাহারই প্রমাণ দিয়াছেন। ইহার প্রাঙ্গণের প্রাচীরের উপর চারিদিকে উপবিষ্ট বৃষমূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে

প্রাচীরের প্রস্তরের সহিত একসঙ্গে ক্ষোদিত করা রহিয়াছে। বৃষগুলি প্রাচীরের মাথারূপে নির্ম্মিত। তাহা হইতে এইটি শৈবমন্দির বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অথচ এখানে বিষ্ণুমূর্ত্তিও স্থান পাইয়াছে।

মীনাক্ষী দেবীর মন্দির—মাদুরা

ভারতবর্ষ মন্দিরের দেশ। মন্দির-স্থাপত্য এদেশের প্রধান শিল্প-সম্পদ্। উত্তর- ও মধ্য-ভারতের এবং উড়িষ্যার শিল্পিগণের ন্যায় দক্ষিণ-ভারতের ভাস্করগণ প্রাচীন ভারতের সাধনার রূপ স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতে বিভিন্ন পরিকল্পনায় যে সকল বিশাল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার পরিকল্পনার ও পূর্ত্ত-কৌশলের প্রশংসা বিশ্বের শিল্পানুরাগিমাত্রই করিয়া থাকেন। যে সব মন্দিরের বিশাল আয়তন, অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য, সুকৌশল স্থাপত্য বিশ্ববাসীর চিত্ত বিস্ময়ে ও পুলকে পূর্ণ করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির অন্যতম।

মন্দিরটি সুরক্ষিত, যেন সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত একটি নগর। চারিদিকে চারিটি উচ্চ গোপুরম্ দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। গোপুরম্ (উচ্চ তোরণ) টেপাকুলম্ (জলমধ্যে বিহারস্থান-সমেত সরোবর) ও ধ্বজস্তম্ভ দক্ষিণ-দেশের দেউলের বৈশিষ্ট্যের এই সব চিহ্নগুলি মাদুরার এই মন্দিরে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে।

গোপুরম্‌গুলি দ্রাবিড়-স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন, দক্ষিণ-ভারতের শিল্পের চরম বিকাশ, তামিল-সভ্যতার পরম পরিণতি এবং প্রাচীন ভারতের কৃষ্টির অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্ব দিকের গোপুরম্‌টি পর্ব্বতশিখরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অল্পপরিসর
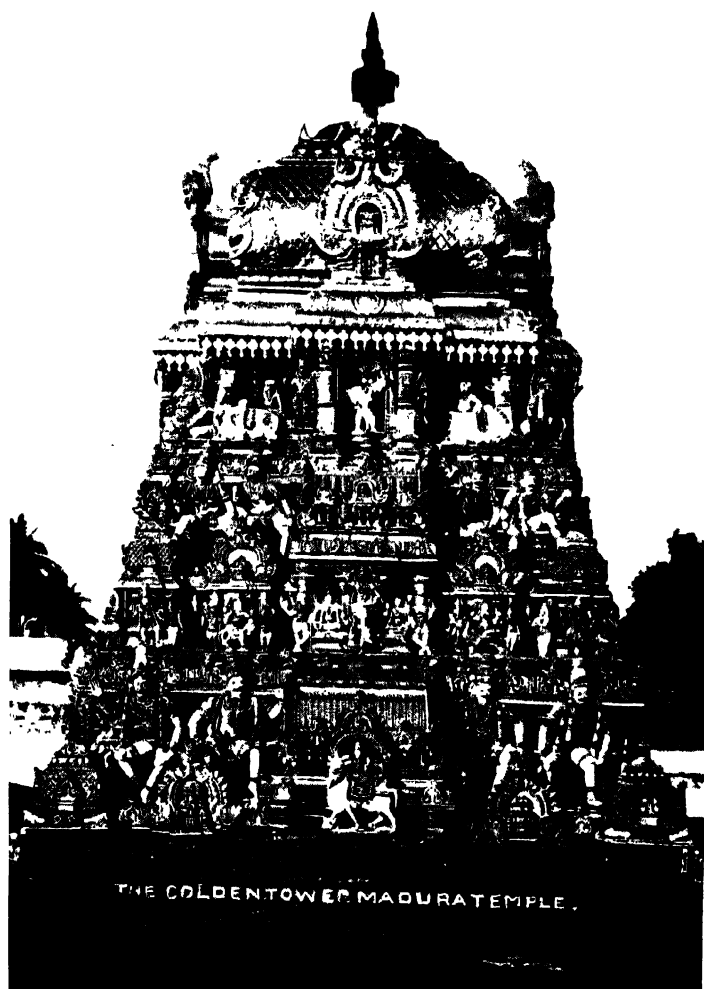
মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের বিমান—মাদুরা

হইয়া স্তরে স্তরে বিশ তলায় বিভক্ত হইয়া ১৫২ ফুট উচ্চে উঠিয়াছে। গোপুরমের প্রবেশ-পথের মধ্যের ফোকর চল্লিশ ফুট উচ্চ এবং পনর ফুট প্রস্থ। ভূমি হইতে ৭০ ফুট উঁচু পর্য্যন্ত ধূসর প্রস্তরে (গ্রেনাইট পাথরে) নির্ম্মিত। তাহার উপরিভাগ ইষ্টক ও প্রস্তরে প্রস্তুত এবং দৃঢ় পলস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত। সমগ্র গাত্রে প্রস্তর ও পলস্তারার উপর ছোট-বড় এমন কি পূর্ণ মানুষের আয়তনের দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষ ও দানবের মূর্ত্তি এবং লীলাব্যঞ্জক দৃশ্যাবলী, পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট-রূপে ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহা ভুবনেশ্বর ও খাজুরাহোর ভাস্কর্য্যের মতন সূক্ষ্ম ও মনোরম না হইলেও প্রাণবন্ত। তোরণের শীর্ষ হইতে দ্বারের ফোকর পর্য্যন্ত পিতলের ঘণ্টার মালা বিলম্বিত। দীপমালা সাজাইবার সুব্যবস্থা আছে। দূর হইতে চারিটি গোপুরম্ এক একটি পর্ব্বতশিখর বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার শীর্ষস্থান প্রায় ত্রিশ ফুট বিস্তৃত এবং উপরে দ্বাদশটি অষ্টধাতুর কলস স্থাপিত। সমগ্র দেবালয়টি উত্তর-দক্ষিণে ৮৩৪ ও ৮৫২ ফুট এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৭২০ ও ৭২৯ ফুট। এমন সুশ্রী বিশালায়তনের মন্দির ভারতে ত নাইই, এমন কি, জগতেও দেখা যায় না। পাশ্চাত্ত্য দেশে অনেক সৌধের স্থাপত্য-কৌশল সুদৃশ্য ও মহান্; কিন্তু তাহা দক্ষিণ-ভারতের মাদুরা, শ্রীরঙ্গম্, তাঞ্জোর, কুম্ভকোণম্ ও রামেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় এত সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত এবং বিশাল নহে।

পূর্ব্ব-গোপুরম্‌টি অতিক্রম করিলে প্রথমেই সিদ্ধিদাতা গণেশের বিশাল বপুর দর্শন পাওয়া যায়। শিল্পী কত

28—1304B.

সাধনা-বলে একখণ্ড প্রস্তর হইতে বাটালির ঘায়ে এক অপূর্ব্ব সুন্দর গজেন্দ্রবদন গণপতি-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তারপরই এক লম্বা অলিন্দ মীনাক্ষী দেবীর ও সুন্দরেশ্বরের দেউলের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। দুই সারি কারুকার্য্যমণ্ডিত, লতা-পাতা-পুষ্প-মূর্ত্তি-ক্ষোদিত স্তম্ভের উপর বারণ্ডার ছাদ ন্যস্ত রহিয়াছে। ছাদের তলে ও দেওয়ালে অতি নিপুণতার সহিত সুদক্ষ শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত নানা দেবলীলাব্যঞ্জক বহুবর্ণের চিত্র অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে।

উত্তর-গোপুরম্ হইতে এইরূপ স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত আর একটি অলিন্দ মীনাক্ষী দেবীর প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত গিয়াছে। মন্দির-দ্বারটি দ্রাবিড়-শিল্পীরা সুন্দর পিতলের-দীপাধার-দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। তদুপরি অসংখ্য প্রজ্বলিত দীপশিখা মৃদুবায়ু-প্রকম্পিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে।

এই দুইটি বারণ্ডার মধ্যে একটি প্রস্তর-সোপান-মণ্ডিত সুগভীর সরোবর অবস্থিত। কুণ্ডের অপর দুই তীরেও বহু-স্তম্ভযুক্ত বারণ্ডা গঠিত রহিয়াছে। তাহার গাত্রে, স্তম্ভে, ছাদের তলে নানা কারুকার্য্য শোভা পাইতেছে। দক্ষিণ-দেশীয় রমণীগণ যখন তাঁহাদের পীত ও লোহিত, লাল ও নীল প্রভৃতি নানা রংএর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সরোবরে স্নানের জন্য অবতরণ করেন তখন পুষ্করিণী পরম বিচিত্র শোভা ধারণ করে। তাহা দেখিয়া বিদেশীয় পর্য্যাটকেরা এই কুণ্ডের নাম "লিলি ট্যাঙ্ক" রাখিয়াছেন।

মীনাক্ষী দেবীর ৪½ ফুট উচ্চ মনোহর বিগ্রহ এক নীলাভ শতদলের উপর দণ্ডায়মান। দেবীর নেত্রদ্বয় অতি

জ্যোতিষ্মান্—মৎস্য-চক্ষুর মতনই উজ্জ্বল। মুর্ত্তিটি ভাস্কর্য্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পর পর সাতটি প্রকোষ্ঠ ভেদ করিয়া দেবীর পীঠস্থানে উপস্থিত হইতে হয়। প্রতি প্রকোষ্ঠে মধ্যস্থলে পিতল বা রজত-পাতদ্বারা মণ্ডিত বেদী রহিয়াছে। তাহারই উপর দর্শক ও ভক্তবৃন্দ অর্ঘ্য স্থাপন করে।

পূর্ব্ব-গোপুরম্ হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলে একটি প্রবেশদ্বার পাওয়া যায়; তথা হইতে বহুস্তম্ভযুক্ত ছাদ-সম্বলিত যাতায়াতের শত শত ফুট পথ অবস্থিত। ইহারই পার্শ্বে বসন্ত-মণ্ডপ—৩৩৩ ফুট লম্বা ও ১০৫ ফুট প্রস্থ। মণ্ডপের মধ্যে অতি সুনিপুণ পূর্ত্ত-কৌশলে নির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল প্রবাহিত করা হয়। নিদারুণ নিদাঘেও মণ্ডপটি সুশীতল থাকে। এই মণ্ডপ রাজা তিরুমল নায়ক সুন্দরেশ্বর মহাদেবের গ্রীষ্মকালের বিহারের স্থানস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

সুন্দরেশ্বরের মন্দির

মন্দিরের বহির্গাত্রে কয়েকটি বড় বড় হস্তী ক্ষোদিত রহিয়াছে। হস্তীগুলির গঠনভঙ্গিমা সুদক্ষ শিল্পীরই পরিচয় প্রদান করে। মন্দিরের প্রধান তোরণের সম্মুখে একটি মণ্ডপতলে সুদৃশ্য প্রস্তরের বৃষমূর্ত্তি প্রভুর চরণধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। মণ্ডপটির স্তম্ভ এবং তাহার মধ্যস্থিত হরপার্ব্বতী, লক্ষ্মী-সরস্বতী, বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি দ্রাবিড়-শিল্পীর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও প্রস্তরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। মনোরম দেবীমূর্ত্তির তিলফুলের মত নাসিকা, হরিণের মত চক্ষু, দাড়িম্বের ন্যায় কুচযুগল, মৃণালের ন্যায় বাহু ও রম্ভার ন্যায় উরু দর্শন করিলে চিত্ত বিমোহিত হয়।

এক একটি মূর্ত্তি প্রকৃত মানবাকৃতির মতন। তাহাদের মাংসপেশী, শিরা, অবয়বের গঠন ঠিক জীবন্ত মানবের মতনই দেখা যায়।

নটরাজ

মণ্ডপের তোরণের দুই পার্শ্বে নটরাজ ও পার্ব্বতীর নৃত্য-ভঙ্গিমায় দুইটি মূর্ত্তি অতি মনোরম। প্রত্যেক মূর্ত্তি বার ফুট উচ্চ, নটরাজের ও পার্ব্বতীর নৃত্য-ভঙ্গিমা শিল্পীর যেমন দক্ষতা প্রকাশ করে তেমনই নৃত্যের অপূর্ব্ব কৌশল শিক্ষা দেয় ও নৃত্যকলায় অনুপ্রেরণা প্রদান করে।

হিন্দু দেব-দেবীর নৃত্য ভারতের শিল্পীদের অপূর্ব্ব অবদান। দক্ষিণ ভারতে শঙ্করাচার্য্য, আপ্পাস্বামী, সুন্দরমূর্ত্তি, তরুজ্ঞান সম্বন্ধ, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি শৈব-সাধকগণ শিবের নানাপ্রকার বিভূতির ও ধ্যানের বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহারই অনুকরণে ও অনুপ্রেরণায় দ্রাবিড়-শিল্পিগণ নটরাজের ন্যায় মূর্ত্তি গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাই প্রসিদ্ধ দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রোঞ্জ-ধাতুর মূর্ত্তি-গঠনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার কারণ। চিদাম্বরমের নটরাজ-মূর্ত্তি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্পদ্। অধ্যাপক উলিয়াম রদেনষ্টাইন বলিয়াছেন—"No artist has reached greater perfection of poise and form, than Nataraja Bronzes, or the elastic figures of Sundara-Murti-Swami"

সহস্র-মণ্ডপ

মন্দিরের আর একটি প্রাঙ্গণমধ্যে সহস্র-স্তম্ভ-সম্বলিত এক বিরাট্ মণ্ডপ অবস্থিত। ইহা দ্রাবিড়-শিল্পের ও স্থাপত্যের দক্ষতার চরম নিদর্শন। শ্রেণীবদ্ধভাবে সমদূরে অবস্থিত, সাকার, সমায়তন

মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের গোপুরম্—মাদুরা

সূক্ষ্মকারুকার্য্যমণ্ডিত সহস্র স্তম্ভ এই মণ্ডপটির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র, বাণাহস্তে সরস্বতী, পদ্মোপরি লক্ষ্মী, ঐরাবতোপরি ইন্দ্র, তাণ্ডব-নৃত্য-ভঙ্গিমায় মহাদেব ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তিগুলি এমনই সুনিপুণভাবে কঠিন প্রস্তরস্তম্ভে ক্ষোদিত হইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় যেন সজীব। মূর্ত্তি-গুলির মাংসপেশী, শিরা, নাসিকা, চক্ষুর পল্লব, কর্ণের গহ্বর প্রভৃতি অতি স্পষ্ট রেখায় উৎকীর্ণ হইয়াছে, ঠিক যেন বাস্তব শরীরতত্ত্বের এক একটি জীবন্ত আদর্শ (মডেল); শরীর-গঠন-শাস্ত্রে (অ্যানাটমীতে) অনভিজ্ঞ কোন শিল্পী এমন সজীব প্রকৃত মানব-মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে না।

মাদুরায় অন্যান্য শিল্পৈশ্বর্য্যের মধ্যে তিরুমল নায়কের রাজপ্রাসাদের স্থাপত্য অপূর্ব্ব। ইহার সবিশেষ বিবরণ মাদুরার অন্যান্য স্থাপত্যের সহিত মৎপ্রণীত ‘দক্ষিণ-ভারত পথে’ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরঙ্গম্

ত্রিচিনপল্লীর উত্তরে কাবেরী-নদীবেষ্টিত একটি দ্বীপমধ্যে শ্রীরঙ্গম্ অবস্থিত। শ্রীরঙ্গমের মন্দির একটি সুরক্ষিত নগর-বিশেষ, এই মন্দিরের আয়তন পৃথিবীর দেব-দেউলগুলির মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ। পর পর প্রস্তরের সাতটি বেষ্টনী, পরিক্রমা-পথ, গোপুরম্, মণ্ডপ ও অঙ্গন ভেদ করিয়া গর্ভমন্দিরে পৌঁছাইতে হয়। প্রস্তরের কারুকার্য্যযুক্ত স্তম্ভশ্রেণী, মন্দিরগাত্রে দেব-দেবীর মোহন মূর্ত্তি, অনন্তশায়ী শ্রীরঙ্গনাথের বিশাল বিগ্রহ দ্রাবিড়-সভ্যতার ও সংস্কৃতিরই বিকাশ, শিল্প-সম্পদের নিদর্শন।

উত্তর ভারতের কোন প্রসিদ্ধ তীর্থে বা মন্দিরে নারায়ণের অনন্তশয্যার বিগ্রহ বড় দেখা যায় না। কেবল ভিলসার উদয়গিরির এক গুহাতে অনন্তশয্যায় শায়িত নারায়ণের বিরাট্ বারহাত মূর্ত্তি দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে বিষ্ণুমন্দিরে বাঙ্গলা দেশের বা বৃন্দাবন অঞ্চলের দ্বিভুজ ত্রিভঙ্গ মুরলীধর কৃষ্ণমূর্ত্তি বা গুজরাট অঞ্চলের চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অনন্তশায়ী নারায়ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্দিরের আভ্যন্তরিক শিল্পচাতুর্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। শতস্তম্ভ মণ্ডপের প্রত্যেক স্তম্ভে অশ্বারোহি-যোদ্ধৃগণ উন্মুক্তকৃপাণে সজ্জিত হইয়া বৃহৎ অশ্বোপরি উপবিষ্ট, দৃঢ়হস্তে অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া যেন অশ্বের বেগ সংযত করিতেছেন। এই সব স্তম্ভগুলি এক একটি পাথর খোদাই করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সব স্তম্ভের উপর যে ছাদ

রহিয়াছে তাহার সিলিংএর কারুকার্য্য অতি সূক্ষ্ম ও সুষমা-মণ্ডিত। ধন্য শিল্পী, ধন্য সেই ধনী যাঁহার ধর্ম্মানুরাগে ও উদারতায় এই বিরাট্ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীরঙ্গমের মন্দির এত বৃহৎ যে ভাল করিয়া দেখিতে হইলে একমাস কাটিয়া যায়। বিশালতাই দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভারতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও প্রেমিক রামানুজাচার্য্য। তাঁহার জন্ম ১০১৭ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। তাঁহারই প্রধান লীলাক্ষেত্র এই শ্রীরঙ্গম্। :২০ বৎসর বয়সে এই শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে তাঁহার মোক্ষলাভ হয়। সেই স্থানে তাঁহারই জীবদ্দশায় স্থাপিত এক প্রস্তরমূর্ত্তি এখনও বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করেন।

শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের গোপুরম্, টেপাকুলম্, বিমান, প্রাকার, মণ্ডপ, ধ্বজস্তম্ভ সবই বৃহদায়তনের। দক্ষিণ-ভারতের প্রধান প্রধান দেবস্থানের মন্দিরগুলি শ্রীরঙ্গম্ ও মাদুরার দেউলের পরিকল্পনায় নির্ম্মিত। কুম্ভকোণম্, চিদাম্বরম্, কাঞ্জিবরম্, তিরুবন্নমলয়, তিন্নিভেল্লী, সুচীন্দ্রম্, রামেশ্বরম্ প্রভৃতি মন্দির-গুলি প্রায় একই আদর্শে নির্ম্মিত। অবশ্য প্রত্যেক মন্দিরের শিল্পিগণ তাঁহাদের স্বাধীন পরিকল্পনায় দক্ষতা ও সৃষ্টিশক্তিতে কিছু-না-কিছু নূতনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঞ্জোর

দ্রাবিড় কলা ও কৃষ্টির প্রধান এবং প্রাচীন সাধনক্ষেত্র তাঞ্জোর। অতীতের মহিমান্বিত সাধনার নিদর্শন তাঞ্জোরের বিপুল বৃহদীশ্বরের মন্দিরে, বিরাট্ নন্দীর মূর্ত্তিতে, অপূর্ব্ব পুথি ও গ্রন্থ-সংগ্রহশালায় প্রত্যক্ষ হয়। দেশ-বিদেশের কলাবিদ্‌গণ তামিল সাহিত্য ও সঙ্গীত এবং নৃত্যকলায় আকৃষ্ট হইয়া তাঞ্জোর গমন করেন। তাঞ্জোরের ধাতুশিল্প বিশ্বের লোককে যেমন বিস্মিত করে তেমনই ইহার খ্যাতি দেশ-বিদেশে প্রসারিত।

বৃহদীশ্বর-মন্দির

মন্দিরটি একটি সুদৃঢ় দুর্গমধ্যে অবস্থিত, ইহা প্রস্তরের উচ্চ প্রাকারবেষ্টিত, চতুর্দ্দিকে গড়-দ্বারা সুরক্ষিত। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য-কৌশলের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন এই তাঞ্জোরের মন্দির। দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ মন্দিরের গোপুরম্‌গুলিই উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট শিল্প-কার্য্যমণ্ডিত হইয়া থাকে, মূল মন্দির গোপুরম্‌গুলির তুলনায় ছোট হয়। কিন্তু বৃহদীশ্বরের মন্দিরে গোপুরমের প্রাচুর্য্য নাই, ইহার মূল মন্দিরটিই অতি উচ্চ; বহু তলায় বিভক্ত এবং সূক্ষ্মকারুকার্য্য-মণ্ডিত একটি বিমান ভূমি হইতে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়াছে। ইহার আকার কাষ্ঠরথের মতন এবং শিরোদেশের পরিকল্পনা মহাবলিপুরমের রথ ও ইলোরার কৈলাস-মন্দিরের ছাঁচে গঠিত।

বৃহদীশ্বর-মন্দির — তাঞ্জোর

শতস্তম্ভ মন্দিরের কারুকার্য্য — শ্রীরঙ্গম
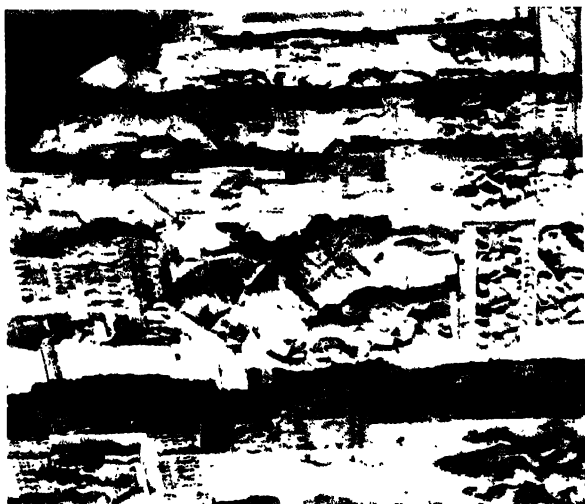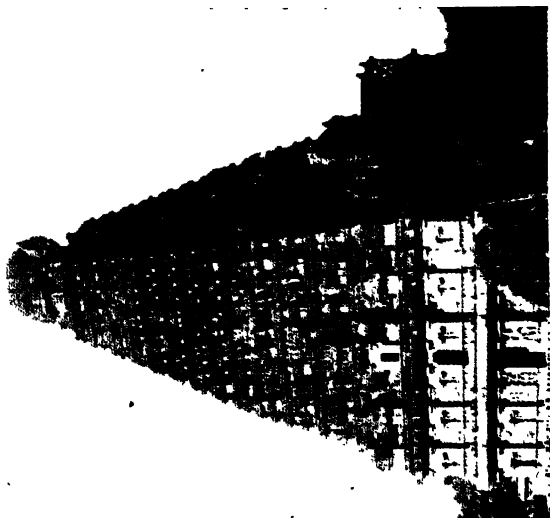
গড়ের উপর প্রস্তরের সেতু পার হইলে গোপুরম্ পাওয়া যাইবে, প্রথম গোপুরম্‌টি ৯০ ফুট উচ্চ এবং দ্বিতীয় গোপুরম্‌টি মাত্র ৬০ ফুট উচ্চ। দ্বারের পার্শ্বে বৃহদাকার ১৮ ফুট উচ্চ দুইটি দ্বারপালের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। তাহাদের নেত্রদ্বয় শিল্পীর যন্ত্রের আঁচড়ে যেন সজীব ও ভীতিজনক হইয়া উঠিয়াছে। বীরোচিত অবয়ব, সুতীক্ষ্ণ নয়ন, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখ দেখিলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় গোপুরমের মধ্যের প্রাঙ্গণের দৈর্ঘ্য ১৭০ ফুট এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ৮০০ ফুট এবং প্রস্থে ৪১৫ ফুট, সমস্তটাই প্রস্তরমণ্ডিত। সমস্ত প্রাচীরে সংলগ্নভাবে বহু কুঠরি নির্ম্মিত রহিয়াছে। বৌদ্ধ মঠেরই মত এই কুঠরিগুলি হয়ত সাধু-সন্ন্যাসী বিদ্যার্থীদের আবাস ছিল। প্রাচীনকালে দেব-দেউলকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি তীর্থে ছোট-বড় বিদ্যাভবন গড়িয়া উঠিত। মূল মন্দিরটি বিশাল আয়তনের, প্রায় ১৮০ ফুট উচ্চ।

বিরাট্ বৃষ

মূল মন্দিরের সম্মুখে এক বিরাট্ প্রস্তরের মণ্ডপমধ্যে উচ্চ প্রস্তরের বেদীর উপর প্রকাণ্ড বৃষভদেব উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বৃষটির বিশাল কায়া দৈর্ঘ্যে আঠার এবং উচ্চে বার ফুট, একখণ্ড প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত হইয়াছে। ইহার ওজন পঁচিশ টন বা প্রায় সাত শত মণ। ইহার বিশালতাই যে কেবল বিস্ময়কর তাহা নহে, ইহার গঠন-ভঙ্গিমা, গঠন-রীতি ও চক্ষুর রেখাপাত পাথরের বৃষটিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। বৃষটির চারিদিকে ৮টি স্তম্ভ আছে, তাহাদের উপরই মণ্ডপের ছাদ অবস্থিত। রামেশ্বর ও মহীশূরের চামুণ্ডী-পর্ব্বতোপরি বৃষমূর্ত্তিও বিরাট্;

29—1304B

কিন্তু তাঞ্জোরের নন্দী-মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহার শিল্পচাতুর্য্যও অদ্ভুত।

বৃহদীশ্বরের মন্দির বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণ রায় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের বিলোপের সহিত এই দেবায়তন হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। কাঞ্জিবরমের সোমবর্ণ-নামক ভাস্কর এই বিশাল দেউল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ বিরাট্ শিবলিঙ্গ একখণ্ড গ্রেনাইট প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ এই লিঙ্গ, পরিধি পঞ্চাশ ফুট, গ্যালারীর মতন দ্বিতল বারণ্ডা দিয়া প্রদক্ষিণ-পথ, সেখানে সিঁড়ির সাহায্যে উঠিয়া লিঙ্গের মস্তকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

মূল মন্দিরের উপর তলার উত্তর ও পশ্চিম দেওয়ালে যে লিপিমালা উৎকীর্ণ আছে, তাহা পাঠে জানা যায় যে, এই মন্দির রাজা রাজদেবের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া 'রাজরাজেশ্বর' মহাদেবের মন্দির নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। 'সাউথ ইণ্ডিয়ান ইন্স্ক্রিপ্শন্স্', ২য় খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়ে এই তথ্য মুদ্রিত আছে। ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'রাজরাজেশ্বর নাটকে'ও এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কাহিনী বিবৃত আছে।

রামেশ্বর

প্রকৃতির মনোরম লীলাক্ষেত্র দেবারাধনার উপযুক্ত স্থান। মানব সৌন্দর্য্যের উপাসক, সেই জন্য ভারতের প্রান্তদেশে অনন্তনীলাম্বুরাশি-বিধৌত বিশাল তটে ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে রামেশ্বর-শিব-দেউল বিদ্যমান। রামেশ্বরের মন্দিরটির আয়তন যেমন বিপুল, কারুকার্য্য ও স্থাপত্য-কৌশল তেমনই মনোরম। মন্দিরটি অতি প্রাচীন, তবে ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে ইহার আমূল সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। কোন মুসলমান বীরের দ্বারা এই মন্দির বিধ্বস্ত বা লুণ্ঠিত হয় নাই। মন্দিরটি একটি দুর্গ-বিশেষ। পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে (সাগরকূলে) দুইটি তোরণের উপর একশত কুড়ি ফুট উচ্চ পর্ব্বতশিখরসদৃশ গোপুরম্ বিরাজিত। দক্ষিণ-ভারতের মন্দির অপেক্ষা তাহার গোপুরম্গুলি বৃহৎ ও সুদৃশ্য এবং বহুল-কারুকার্য্য-মণ্ডিত। রাজবাটীর দৌবারিক বা আমলার পরিচ্ছদের জাঁকজমক যেমন রাজার সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়, তেমনই গোপুরম্গুলির বিশালতা দেবতার মহিমা প্রকাশ করে। স্তরে স্তরে ক্রমসূক্ষ্ম হইয়া চতুষ্কোণাকৃতি বারটি তলায় বিভক্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। শীর্ষোপরি সাতটি ঊর্দ্ধমুখ স্বর্ণকলস শোভা পাইতেছে। গাত্রে অসংখ্য হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি নানা ভঙ্গিমায় ক্ষোদিত।

রামেশ্বর-মন্দিরের প্রধান বিশেষত্ব ইহার বিশাল পরিক্রমা-পথ। গোপুরমের মধ্য দিয়া দেবালয়ে যাইবার প্রথমেই এক প্রশস্ত আচ্ছাদিত পথ, তার দুইদিকে পাঁচ ফুট উচ্চ পোস্তার

উপর কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভ-শ্রেণী, স্তম্ভের সম্মুখে সাধকদের যুক্তকর প্রণামরত মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে বিশটি ১৮' উচ্চ ২' ফুট মোটা এক এক খণ্ড প্রস্তরের কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভের উপর পাথরের ছাদ স্থাপিত। এই পথের পর মন্দিরসমূহ বেষ্টন করিয়া চারিধারে পরিক্রমার জন্য আচ্ছাদিত পথ। পথের দুই পার্শ্বেও পাঁচ ফুট উচ্চ পোস্তার উপর ছয় ফুট অন্তর কারুকার্য্যমণ্ডিত প্রস্তরস্তম্ভ, তাহার উপর বিশাল ছাদ রক্ষিত। স্তম্ভগুলির গাত্রে ত্রিমুখ অশ্ব ও ত্রিমস্তক হস্তী ক্ষোদিত রহিয়াছে। উত্তর-দক্ষিণের পথে ৪৪টি এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমের পথে ৪০টি করিয়া স্তম্ভ আছে। প্রতি স্তম্ভ ১২' উচ্চ, ৪' প্রস্থ ও ১৮" মোটা। উত্তর ও দক্ষিণদিকের আচ্ছাদিত পথ দুইটি ৬৭১' ফুট লম্বা। সমস্ত পথ প্রায় ৪০০০ ফুট লম্বা, ১৭ হইতে ২১ ফুট প্রস্থ এবং ৩০ ফুট উচ্চ।

শ্রেণীবদ্ধ-স্তম্ভশোভিত ছাদবিশিষ্ট আচ্ছাদিত এত বড় পথ পৃথিবীর কোন মন্দিরে, মসজিদে বা গির্জ্জায় নাই। বিদেশীয় শিল্পরসিকগণ এই বিরাট্ পথটিকে Long Colonnade বা The Great Corridors বলেন। ফার্গুসান সাহেব তাঁহার H.I.E.A. গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"The glory of this temple resides in its corridors. These extend to nearly 4000 feet in length. The breadth varies from 17 to 21 feet free floor space, and their height is apparently about 30 feet from the floor to centre of the roof. Each pillar or pier is compound, 12' in height, standing on a platform 5' from the
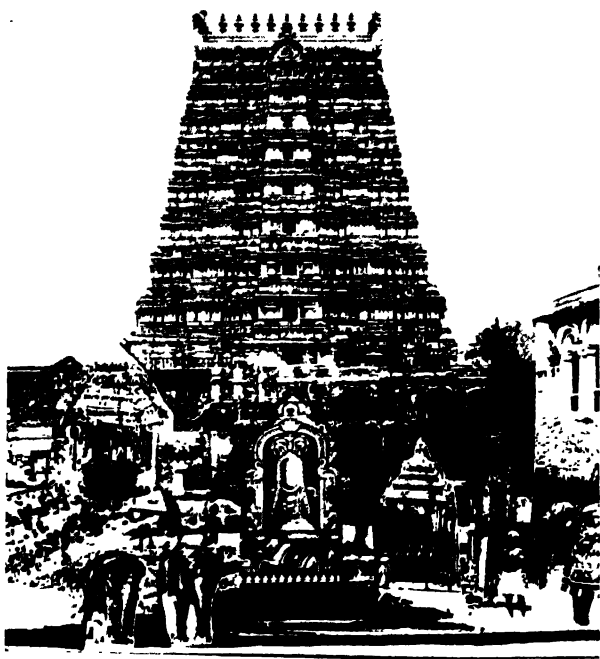
মন্দিরের পশ্চিম গোপুরম্‌—রামেশ্বর

floor, and richer and more elaborate in design than those of Parvati Porch at Chidambaram."

মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ মণ্ডপের মধ্যে উপবিষ্ট বিরাট্ বৃষ বা নন্দীর প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। বৃষটি ১৬ ফুট×১২ ফুট একখণ্ড প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। তাঞ্জোরের বৃষ অপেক্ষা ছোট। ইহার প্রদীপ্ত নেত্রদ্বয় দেখিলে জীবন্ত বৃষ বলিয়া ভ্রম হয়।

পরিক্রমাপথ অতিক্রম করিলে নাটমণ্ডপ ও মূল মন্দিরে উপনীত হওয়া যায়। এখানে ধ্বজস্তম্ভ ও নিকটেই টেপাকুলম্ বিদ্যমান। রামেশ্বর-মন্দিরের সংলগ্নই হনুমানের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বেশ্বরের মন্দির। রামেশ্বরের শিবলিঙ্গ ছোট হইলেও ইহা স্বয়ম্ভূ। Report of the Madras Epigraphical Department, 1910, গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, রামেশ্বর-মন্দিরে উৎকীর্ণ কয়েকটি শিলালিপিতে ১৬৩৫ শকে রামেশ্বর-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়।

মন্দিরের পূর্ব্বকথা

বিশ্বের মানব যখন চিন্তা করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে তখন হইতেই বিশ্বনিয়ন্তার অস্তিত্ব তাহার মন অধিকার করিয়া আছে। মানুষের কল্পনায় প্রকৃতির যাবতীয় শক্তি একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন বিভূতি-মাত্র। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু সবই সেই সৃষ্টিকর্ত্তার রহস্যলীলা। মানবের মন এই অনাদি, অনন্ত. সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বস্থানব্যাপী বিধাতৃ-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধায় সর্ব্বদা ভরপূর, তাহার সকল চিন্তা ও কার্য্যের লক্ষ্য বিধাতার তুষ্টি-সম্পাদন। বাহুবলে বা চিন্তা-শক্তিতে মানব যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর অর্জ্জন করে, সবই তাঁহারই চরণে অর্ঘ্য দিবার জন্য সে লালায়িত। ভগবানের তুষ্টির নিমিত্ত ও তাঁহার রোষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, পালিত প্রিয় পশু-পক্ষী এমন কি আত্মজ স্নেহের পুত্তলিকে বলি দিতেও সে দ্বিধা বা দুঃখ বোধ করে না।

সকল ধর্ম্মের নরনারী প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়াই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সৃষ্টিকর্ত্তার চরণ স্মরণ করে। হিন্দুরা প্রাতেই "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া থাকে, নিজের শক্তির উপর ভরসা রাখে না। 'জনানাং হিতসুখায়' তাহারা তাহাদের চিত্ত ও বিত্ত দেব-দেউল-নির্ম্মাণে অর্পণ করে।

পৃথিবীর আদিমকালে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার আরাধনা ও অর্ঘ্যদান সকল জাতির লোকই বেদীর উপর বা সম্মুখে করিত। ভারতে

বৈদিক যুগ হইতে ক্রিয়াকাণ্ড বেদীর উপরই সম্পাদিত হইতেছে। বাঁধান বৃক্ষমূল, গ্রাম্য দেব-দেবীর পীঠস্থান ও বেদী পথপার্শ্বে এখনও অজস্র দেখা যায়। পল্লীবাসীকে এই সব বেদীর চারিপার্শ্বে সমবেত হইয়া আরাধ্য দেব-দেবীর আরাধনা করিতে দেখা যায়।

মানবের চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশের ও উন্নতির সহিত তাহার সরল চিন্তার মাধুর্য্য নিবিড়ভাবে উপলব্ধি ও রূপায়িত করিবার জন্য মানব উদ্যত হয়। মাটি, কাঠ, ধাতু ও পাথরে তাহার কল্পনাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য মানুষ শিল্প সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল, এমন কি এই মানব-চক্ষে যাহা দৃষ্ট হয় সে যে কেবল তাহারই রূপ দিতে প্রয়াস পাইল তাহা নয়, যাহা মানব কল্পনা করিতে বা অন্তর্দৃষ্টিতে ধ্যান করিতে পারে না তাহারও রূপ সে জড়ের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা চলিল। তখনই মানব তাহার শ্রেষ্ঠ চিন্তার সাহায্যে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার রূপ কল্পনা করিতে, এবং তাঁহারই নানা বিভূতি ব্যক্ত করিবার জন্য দেবমূর্ত্তি গঠন করিতে আরম্ভ করিল।

যখন দেবমূর্ত্তি গঠিত হইল তখন তাহাকে রাখিবার জন্য গৃহ আবশ্যক। প্রিয় ও শ্রদ্ধার জিনিষ সযত্নে ও সুশ্রী স্থানে স্থাপন করাই মানবের প্রকৃতি। সেই জন্য দেব-দেউলগুলিকে সুন্দর ও সুদৃঢ় করিবার জন্য সকল দেশের ও সমাজের ব্যক্তিবর্গ নানা কারুকার্য্য ও শিল্প-সৃষ্টিতে তাহাদের শক্তি নিয়োগ করিল। জগতে মন্দির-গঠনের প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইল। জাতির সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রূপ গ্রহণ করিল।

ভারতে কখন্ হইতে যে মন্দির-গঠন-প্রথা প্রচলিত হইল তাহার কোন সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। মোহেন্-জো-দড়ো-র প্রাচীন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত কয়েকটি শিল-মোহরের উপর দেব-দেউলের চিত্র ক্ষোদিত আছে দেখা যায়। বৌদ্ধযুগেই মন্দিরের কথা প্রথম শুনা যায়। ভিলসার বাসুদেব-মন্দিরের হিলিয়োডরাসের গরুড়স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দেও হিন্দুমন্দির নির্ম্মিত হইত।

বৌদ্ধদের মধ্যে মন্দিরে পূজা করিবার কোন বিধি বা পদ্ধতি না থাকিলেও বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই মন্দিরের পরিকল্পনা আরম্ভ হয়। বুদ্ধদেব যখন সারনাথে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অবস্থিতি করিতেন, তখন বহু ভক্ত তাঁহার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য সুগন্ধ পুষ্প ও অর্ঘ্য লইয়া আসিতেন। যখন বুদ্ধ আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন করিতেন তখন ভক্তেরা একটি কুঠরির মধ্যে পুষ্প ও অর্ঘ্য রাখিয়া দিতেন, সেই কুঠরিটি 'গন্ধকুটী' নামে আখ্যাত হয়, পরে সেই সৌধটি 'মূলগন্ধকুটী' আখ্যা পায়।

নবনির্ম্মিত মূলগন্ধকুটী—সারনাথ।

"Incessant streams of devotee would come every day with offerings of flowers and fragrance to render tributes to the Buddha, when he happened to be away the presents had to be left in a room, which came to be known as 'Gandha-Kuti,' and later re-built as 'Mulgandha-Kuti' at the old monastery of Sarnath (Annual Report, A.S.I., 1906-07, pp. 97-98.) It was probably, originally, a structure of masonry; rebuilt afterward into a stone shrine (শিলা গন্ধকুটী) by King Mahîpāla in 1083 Samvat."

এক পালি গ্রন্থে দেখা যায় অবরোজ-নামক এক গৃহস্থ বিপাশী বুদ্ধের যুগে বুদ্ধদেবের জন্য একটি "গন্ধকুটী" নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেইরূপ বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় বন্ধুমতী নগরীর অপরাজিত-নামক এক ভক্ত একটি গন্ধকুটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। (Dhamma-Padāttha-Kathā, III, p. 364 f.n.) আর একটি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে শারিপুত্রের ভ্রাতা রেবতের নির্ম্মিত গন্ধকুটীতে বুদ্ধদেব স্বয়ং পদার্পণ করিয়াছিলেন।

এই সব গন্ধকুটী বৌদ্ধ বিহার বা দেব-দেউলের প্রথম সৃষ্টির নিদর্শন। "Anyhow these Gandhakutîs must have been the nucleus of future Buddha-shrines or Temples (Pūjanîya-ṭṭhāna) and provided indirect aids to personal adoration and were the seeds of personal worship." (The Antiquity of the Buddha-Image by O. C. Gangooly.) ইহাই বৌদ্ধ দেব-দেউলের

80—1804 B.

সূচনা। বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে বহু যক্ষ-মন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে।

হিন্দু মন্দিরের কথা মনুর গ্রন্থে প্রথম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মনুর অনুশাসনই হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণিক নীতি-গ্রন্থ, ইহা প্রায় ২৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে লিখিত হইয়াছে বলিয়া কোন কোন অনুসন্ধানী পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন। রবার্ট আর্নেষ্ট হিউম তাঁহার 'The World's Living Religions' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Temples and temple priests are first mentioned in the sacred scripture of Hinduism in this document. (Manu's work). Idols are first clearly referred to in Manu along with some other vaguer but probable allusions."

মনুর যুগে মন্দির বোধ হয় ক্ষণস্থায়ী মালমশলার (অর্থাৎ কাঠ, খড় ও বাঁশ) দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তন্নিমিত্ত তাহাদের কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। অশোক (২৮৫-২২৮ খৃঃ পূঃ) ইষ্টক ও প্রস্তরের পূজার স্থান—স্তূপ, চৈত্য ও বিহার নির্ম্মাণ করেন। তাহাদেরই নিদর্শন লইয়া আজকাল বর্ত্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ ভারত-স্থাপত্যের আলোচনা করিতেছেন।

ভারতের দেব-দেউল-নির্ম্মাণের ইতিহাসে হিন্দুর কৃতিত্ব সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ পায় নাই। বৌদ্ধেরাই ইষ্টক ও প্রস্তরের দেব-দেউল-নির্ম্মাণের প্রবর্ত্তক। হিন্দুদের মধ্যে এক স্থানে বহু লোক সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিবার পদ্ধতি পূর্ব্বে ছিল না।

হিন্দুর দেবারাধনার চারিটি বিশেষ ধারা পর পর চারিটি যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রথম বৈদিক যুগে হিন্দুরা প্রকৃতির পূজায় ও নানা প্রকার যজ্ঞ-ক্রিয়াতে তাঁহাদের সাধনা নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ-যুগে হিন্দুগণ নানাবিধ ত্যাগ ও পশুবলির প্রথা প্রচলিত করিয়া তাঁহাদের সাধনার ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর উপনিষদের হিন্দুগণ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের ও ব্রহ্ম-সাক্ষাতের চিন্তায় তাঁহাদের সাধনা নিবদ্ধ রাখিতেন। নিভৃত স্থানসমূহই সে যুগে সাধন-ভজনের প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়াতে হিন্দুধর্ম্মের উপর প্রবল আলোড়ন বহিয়া যায়। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিপত্তি সর্ব্বাধিক হইয়াছিল। তাহারই পর মনু হিন্দুধর্ম্মকে নানা অনুশাসনে, রীতি, নীতি ও পদ্ধতিতে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ২৫০ খৃঃ পূঃ অব্দের পর হইতে হিন্দুধর্ম্মের এক নবরূপ প্রচলিত হয়, তখনই মূর্ত্তি-পূজা ও হিন্দু দেবদেবীর মন্দির-স্থাপন ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। ভিতরগাঁও ও শিরপুরের ইটের মন্দির ৪র্থ ও ৭ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়।

নানা স্বাধীন রাজবংশের উত্থান ও পতনের সঙ্গে দেব-দেউলের ধ্বংসের ইতিহাস বিজড়িত। তাহাদের কাহিনী অফুরন্ত! রাজ-অনুগ্রহ ও রাজ-ধর্ম্মের প্রভাব না থাকিলে কোন ধর্ম্মের প্রসার হয় না। সেই জন্য ভারতের চালুক্য, পাণ্ড্য, কেশরী, চোল, গুপ্ত, হূণ, পাল, সেন, মগধ, মালব, রাজপুত, পাঠান, মোগল, শিখ আদি রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে

বহু মন্দির, গুহা, বিহার, চৈত্য, মসজিদ ও গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়া ভারতের শিল্প ও ভাস্কর্য্যের গৌরব প্রকাশ করিয়াছিল।

ভারতে যত ধর্ম্ম ও মত প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অন্য কোন দেশে আর তত হয় নাই। সেই জন্য ভারতের দেবস্থান ও দেব-দেউলের সংখ্যা অগণিত।

পৃথিবীতে বর্ত্তমান যুগে দশটি প্রচলিত ধর্ম্ম আছে। তাহার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মই সর্ব্বপ্রাচীন। নিম্নের তালিকায় তাহাদের নাম এবং উৎপত্তি-সময় ও -স্থান প্রদত্ত হইল :—

ধর্ম্ম	উৎপত্তি-কাল	দেশ	ধর্ম্মোপদেষ্টা
১। বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম	২০০০ খৃঃ পূঃ	ভারতবর্ষ	
২। ইহুদী ধর্ম্ম	১৫০০ „	আরব	মোশেহ্
৩। জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম্ম	১০০০ „	পারস্য	জরথুশ্ত্র
৪। 'শিন্তো' ধর্ম্ম	৬০০ „	জাপান	
৫। তাও-বাদ	৫৬০ „	চীন	Lao-tze—জন্ম ৬০৪ খৃঃ পূঃ
৬। জৈনধর্ম্ম	৫৬০ „	ভারতবর্ষ	মহাবীর—জন্ম ৫৯৯ খৃঃ পূঃ
৭। বৌদ্ধধর্ম্ম	৫২০ „	„	বুদ্ধ—জন্ম ৫৬০ খৃঃ পূঃ
৮। কন্‌ফুশীয় মতবাদ	৫১০ „	চীন	কনফিউসিয়াস্ জন্ম ৫৫১ খৃঃ পূঃ
৯। খৃষ্টানধর্ম্ম	২১ খৃষ্টাব্দ	প্যালেষ্টাইন	যিশুখৃষ্ট—জন্ম ৪ খৃঃ পূঃ
১০। মোহম্মদীয় ধর্ম্ম	৬১০ „	আরব	মহম্মদ—জন্ম ৫৭০ খৃঃ

পৃথিবীর এই প্রধান দশটি চলিত ধর্ম্মের মধ্যে তিনটির উৎপত্তি ভারতবর্ষে। আবার ইহাও প্রতীয়মান হয় পার্শীদের (জরথুশ্ত্রীয়দের) সংখ্যা ভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে কোন মুসলমান দেশ অপেক্ষা ভারতেই মুসলমান অধিক। খৃষ্টানের সংখ্যা ভারতে ৪,৭৫৪,০০০। অতএব দশটির মধ্যে ছয়টি ধর্ম্মের অধিবাসীর আবাসভূমি ভারতবর্ষ বলিলে অন্যায় হয় না।

সেই জন্যই ভারতে দেব-দেউলের ইতিহাস অতি জটিল, ইহার তুলনা-মূলক ও প্রকৃত ইতিহাস লেখা স্বল্প জ্ঞানের সাহায্যে বিশেষতঃ অল্প স্থান ও অল্প কাল-মধ্যে সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মের সম্বন্ধে অনেক পুস্তক আছে, কিন্তু দেব-দেউল (মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ)-সম্বন্ধে বাঙ্গলায় পুস্তক অতি বিরল। এখন বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। দেব-দেউল যে সকল জাতিরই শ্রদ্ধার স্থান, শান্তির আবাস, তাহাই ভারতের বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে। তাহা হইলেই পরস্পরের মত-বিরোধ ও ধর্ম্মান্ধতার অবসান হইবে। অপরের ধর্ম্মস্থানকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিবার অভ্যাস করিলে, পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিলে বিশ্বে অপার শান্তি বিরাজ করিবে।

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী চিরকালই পরধর্ম্মসহিষ্ণু, এবং পরধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান তাহাদের দেশের বিশিষ্ট সাধনা। সেই জন্যই আমরা অত্যুচ্চ মন্দিরের শিখর, গির্জ্জার চূড়া ও মসজিদের মীনার অনেক স্থলে পাশাপাশি দেখিতে

পাই। ইয়াকুব হোসেন তাঁহার 'Temples Churches and Mosques' গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"India is the only country where you see Hindu, Jain, Buddhist, Sikh and Zoroastrian temples, Jewish synagogues, Roman Catholic and Protestant Churches (English, German, Dutch, French, Portuguese, Italian, Greek, American, Armenian and Syrian) and Sunni and Shia Mosques clustered together. If the deeply cultivated and firmly rooted feeling of common nationality predominates, and different religious interests are subordinated to that sentiment, a perfect harmony and concord prevails among all people. India can yet teach a lesson to the whole world in tolerance—religious, communal and national. * * * The combination of the Sikhar, Steeple and Minaret will then present a spectacle in India that will put to shame the Tower of Babel."

এই গ্রন্থের অল্প পরিসরের মধ্যে ভারতের দেব-দেউলের অফুরন্ত কাহিনী বলা সম্ভবপর হইল না। কেবলমাত্র সূচনা—তাহাও কয়েকটি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র। ভারতের শিল্পৈশ্বর্য্য দেখিবার জন্য বাঙ্গালী নরনারীর চোখ বাল্যকাল হইতেই প্রস্তুত হওয়া দরকার। এই অতুলনীয় শিল্পৈশ্বর্য্যের খনির সন্ধান দিবার জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। ভারতের সাধনা যাহা শিল্পীদের দক্ষতায় মূর্ত্ত হইয়া আছে, তাহা পরিবেশনের নিমিত্তই এই আয়োজন।

ভারতের দেব দেউলের কথা আদৌ সম্পূর্ণ হইবে না যদি ভারতের মসজিদ ও গির্জ্জার কথা বলা না হয়। বহু মসজিদ ও গির্জ্জার কথা সংগৃহীত আছে—ভারতের দেব-দেউলের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সুবিধা ও সুযোগ হইলেই তাহা প্রকাশিত হইবে। বিধাতার চরণে তাহাই প্রার্থনা।

সমাপ্ত

যে সমস্ত পুস্তক ও মনীষিগণের মত গৃহীত ও ত হইয়াছে তাহার তালিকা

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	(১) রূপম্, ১৯২০
	(২) The Antiquities of Buddha Images.
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পথে ও বিপথে
আর্নট (M. H. Arnot)	Preface to the Temples of Bhuvaneswar.
উইলিয়াম রদানষ্টাইন্	—
উইলিয়াম চেম্বার	এসিয়াটিক রিসার্চ্চ, ১৭৮৮
ইয়াকুব হোসেন	Temples, Churches and Mosques.
	ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়ে ম্যাগাজিন (I.S.R.M.)
	ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়ে প্যাম্ফলেট (I.S.R.P.)
কানিংহাম (Cunninghum)	(১) আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট (কাঃ আঃ সাঃ, ৬ষ্ঠ খণ্ড)
	(২) মহাবোধি (Mahabodhi)
	(৩) আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্ট, ১ম খণ্ড
	(৪) A.S.R., Vol. II.
	(৫) A.S.I., Vol. IX.
	(৬) Journal of A.S.B., Vol. XVII, Sept. 1848.
	(৭) Bharut

31- ,04B

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
কালিকারঞ্জন কানুনগো, ডাঃ	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৫, ৪র্থ
কুমারস্বামী, ডাঃ	আর্ট্‌স এণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স অব ইণ্ডিয়া এণ্ড সিলোন
কোল (Lt. Kole)	Calcutta Review, 1872
গুরুদাস সরকার	(১) Tagore's Personality, অনুবাদ
	(২) মন্দির-কথা, ২য় ও ৩য় খণ্ড
গুরুসদয় দত্ত	(১) Modern Review, 1934, April.
	(২) বঙ্গলক্ষ্মী, ১৩৪০, চৈত্র
গ্রীফিন্‌ (Griffin)	Famous Monuments of Bengal.
গ্রাউস (Growse)	Mathura, 2nd Edition.
গ্লাডুইন্‌স (Gladwins)	আইনী-আকবরী (Vol. II)
ওদেদ্‌ ক্রল ও সিলভাঁ লেভী	ইণ্ডিয়ান টেম্পল্‌স
দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ	(১) বৃহৎ বঙ্গ, ১ম
	(২) ক্যালকাটা রিভিউ, ১৯৩৪
মনোমোহন গাঙ্গুলী	উড়িষ্যা এণ্ড হার রিমেন্স
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	(১) মন্দির কথা, বঙ্গদর্শন, ১৩১০, পৌষ
	(২) কল ও কারখানা, বিচিত্রা, ১৩৩৯
রেনল (Major Rennel)	(১) List of Ancient Monuments, Bengal.
	(২) Memoirs, A.S.B., Vol. VIII.
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঙ্গলার ইতিহাস (২য় খণ্ড)
ফার্গুসান	(১) History of Indian and Eastern Architecture, Vols. I & II (H.I.E.A., Vols. I & II) (হিঃ ইঃ ইঃ আঃ, ১ম ও ২য় খণ্ড)
ফ্লীট্‌	Early Gupta Inscriptions.

গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-তালিকা

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী
বেণীমাধব বড়ুয়া	Gaya and Buddhagaya.
বুলার (Prof. Bühler)	Epigraphia Indica.
বারনেট (Dr. L. D. Barnett)	Antiquities of India.
বীল (Beal)	Buddhist Record, Vol. II.
বুকানন হ্যামিল্টন	Eastern India.
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবঠাকুরের ঠিকুজী, প্রবাসী, ১৩২৭, কার্ত্তিক
সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রূপম্, ১৯২০
ওয়াসিলিউ (Wassilieu)	ডক্‌ট্রিন্ এণ্ড হিষ্ট্রী অব্ বুদ্ধিজম্
ব্লক (Block)	(১) J.R.A.S., 1907 (২) Journal, A.S.B.
ব্রজকিশোর ঘোষ	History of Puri
জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	(১) দক্ষিণ-ভারত পথে (২) স্মৃতিকণা
স্যর জন মার্শেল	(১) Sanchi (I.S.R.P.) (২) Khajuraho (I.S.R.P.)
রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ	Budha Gaya
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	বিচিত্র প্রসঙ্গ
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়	বুদ্ধগয়া
হ্যাভেল (Havell)	(১) Ancient and Mediæval Architecture of India. (A.M.A.)
হিউ এন্ সাং	Beal's Life of Hiuen Tsiang.
হিউম, আর. এ.	The World's Living Religions.
পুলিনবিহারী দত্ত	মাথুর কথা (মাঃ কথা)
নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	ব্রজপরিক্রমা (ব্রঃ পঃ)

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
Wiener	Zeitschrift furdie Kunde des Morgenlandes, Vol. I
জেরেট (Zarette)	আইনী আকবরী
রীজ ডেভিড্‌স	...
টড্‌ (Todd)	রাজস্থান
ভিন্সেণ্ট স্মিথ	History of Indian Arts.